জন্মেছি এই দেশে

উপন্যাস

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—চার টাকা—

[এই গ্রন্থের রচনাকাল
১৯৫২—১৯৫৬]

প্রচ্ছদপট :—

অঙ্কন—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীপ্রফুল্ল বসু কর্তৃক প্রকাশিত ও কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৮, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীমান সবিতেন্দ্রনাথ রায়

কল্যাণীয়েষু

এই লেখকের

রাত্রির তপস্যা
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম
মনে ছিল আশা
নববধূ
পুরুষ ও রমণী
রজনীগন্ধা
স্বর্ণমুকুর
কেতকীবন
মিলনান্ত
নবযৌবন
জ্যোতিষী
কলকাতার কাছেই
প্রভাতসূর্য
রাতমোহানা
কমা ও সেমিকোলন
কাছে আছে যারা
কোলাহল
সমারোহ
দুর্ঘটনা
প্রেরণা
মালাচন্দন
শ্রেষ্ঠ গল্প
আবছায়া
সাবালক
সীমান্তরেখা
স্মরণীয় দিন
চতুর্দোলা
ভাড়াটে বাড়ী
নারী ও নিয়তি
ছুটি

জন্মেছি এই দেশে

১

আড়াই শ' গজের মধ্যে তিনটে ইস্কুল। একটা মেয়েদের—সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে দশটা একবার, এগারোটা থেকে চারটে আর একবার,—এই ডবল্ শিফ্‌টে চলে লেখা-পড়ার পালা। সন্ধ্যেবেলা একটা কলেজও বসছে আজকাল, যদিও রেকগ্‌নিশন্ পায় নি। ছেলেদের ইস্কুলেও দু বার কাজ হয়—সন্ধ্যেটা কি কাজে লাগানো যায় কর্তৃপক্ষ ভাবতে শুরু করেছেন। কেবল ইন্দুমতী গদাধর হাই স্কুলে সকালটা মেয়েরা পড়ে, দুপুরে বসে ছেলেদের ইস্কুল।···কিন্তু সে যাই হোক এই তিনটে ইস্কুলই ভর্তি থাকে ছেলেমেয়েতে। নতুন কাউকে ভর্তি করাতে গেলে শুনতে হয়, 'এ বছর তো উপায় দেখছি না। আজ-কাল আবার ইন্‌স্পেক্টর এসে মাথা গুনে নেয়।···সামনের ডিসেম্বরে নিয়ে আসবেন, চেষ্টা ক'রে দেখব।···অবশ্য খুব অসুবিধা হয় তো পাঠাতে পারেন। বসবে, ইস্কুল করবে ঠিকই—খাতায় নামটা কেবল তুলতে পারব না।···মাইনে? হ্যাঁ তাও দেবেন, ওটা আমরা টিচার্স বেনিফিট্‌ ফাণ্ডে ডোনেশন ব'লে জমা ক'রে নেব।'

এধারে যখন এই অবস্থা—তখনও এম. ই. স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বাড়ে না কেন? এ নিয়ে বলাইবাবু রীতিমত দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

অথচ এইটেই ওঁর ট্রাম্প্‌-কার্ড! অর্থাৎ কিনা রঙের গোলাম।

অনেক তদ্বিরে, অনেক ষড়যন্ত্রে এই সেক্রেটারীর পদটি তিনি পেয়েছেন। অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে পাত্তা পান নি, জনগণেশের পূজারী হওয়া (অবৈতনিক) যে এত কঠিন তা কে জানত! যদি বা দৈববলে এই চাকরীটি পেয়েছেন, সেটার একটা মূল্য স্বীকৃত না হ'লে চলবে কেন? আগামী মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে দাঁড়াতেই হবে। তখন পরিচয় দেবার মত যে আর কিছুই নেই। 'দাসপাড়া এম. ই. স্কুলের সেক্রেটারী—আপনাদের বিশ্বস্ত সেবক শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক আপনাদের ভোট প্রার্থনা করেন।' এই পোস্টার চোখ বুজলেই কল্পনানেত্রে দেখতে পান বলাইবাবু। কিন্তু যদি কেউ একথা

বলে যে, 'দাসপাড়া এম. ই. ইস্কুল? সেটা আবার কি? আছে নাকি এ নামেব কোন ইস্কুল?' তখন কি বলবেন তিনি? মোটে সাতষট্টিটি ছাত্র, সে আবার ইস্কুল, তার আবার সেক্রেটারী! বিশেষ ক'বে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ (সে যে কে কে দাঁড়াবে তাও মানস-চক্ষে দেখতে পাচ্ছেন বৈ কি!) তো একথা আগেই বলে বেড়াবে। টিট্‌কিবি দেওযাব এ সুযোগ কি ছেড়ে দেবে তাবা?

এদিকে, এই মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে না দাঁড়াতে পাবলে, ওব নাম কি পৌব-নির্বাচনে জনগণেব সেবকরূপে চিহ্নিত হ'তে না পাবলে—ভবিষ্যতে য্যাসেমব্লী ইলেক্-শনেই বা দাঁড়াবেন কি ক'বে?

সুতবাং যেমন ক'বেই হোক এটায দাঁড়াতে হবে। আব তা হ'লে পবে ইস্কুলটাকেও দাঁড় কবাতে হবে।

অথচ উপাযই বা কি? কোনও পথই তো দেখতে পান না বলাইবাবু? ক্যান্‌ভাসাব নিযুক্ত করবেন? কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন? কিন্তু তাতে কি কোন ফল হবে? ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রশ্ন যেখানে সেখানে কি আব বিজ্ঞাপন দেখে লোকে ভুলবে? ঐ প'ড়ো টিনেব চালায পুবোনো ইস্কুল, ভাঙ্গা বেঞ্চি এবং নডবড়ে চেযাব—দেখলেই লোকের অভক্তি হয। তা ছাড়া লোকেব কেমন একটা ধাবণা হযে গেছে যে ওসব সেকেলে ইস্কুলে পড়তে দিযে মিছিমিছি সময নষ্ট ক'বে কোন লাভ নেই। একেবারে হাই স্কুলে দেওযাই ভাল।

অনেক ভাবছেন বলাইবাবু—ইদানীং একবকম দিনবাতই ভাবছেন—কোথাও কোন কূলকিনাবা দেখতে পাচ্ছেন না, এমন সময একদিন সত্যেন এসে বললে, 'বলাইদা, আমাদের পূর্ণ মাষ্টার মশাইয়েব কিছু একটা করুন। তাঁব এ দুর্দশা তো আর চোখে দেখা যায় না। অর্ধেক দিন ঠায় উপোস ক'রে কাটছে!'

'কেন, তাঁর তো একটা পেন্‌সন ঠিক ক'রে দিয়েছি।'

'সাত টাকা পেন্‌সন দেন মাসে। তাতে কি হয বলুন তো? আপনার দৈনিক বাজার খরচই তো তার চেযে বেশি।'

'না—তা ঠিক নয়—' গলা ঝেড়ে সাফ ক'রে নেন বলাইবাবু, কণ্ঠস্বরে বেশ জোরও পান, কারণ আজই বাজার করতে যে দশটাকার নোট দিয়েছিলেন ছেলেকে, তা থেকে তিনটাকা ছ পয়সা ফিরে এসেছে—'সে যাকগে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কোথা থেকে

দিই বলো তো! ঐ তো ইস্কুলের অবস্থা! নেহাৎ সরকারী গ্র্যান্টটা আছে তাই।'

'সে তো জানি। অন্য একটা কিছু করতে হবে। আগে আগে তবু টিউশনি করতেন দু তিনটে, তাতে চলত। এখন আর ঘু'রে ঘু'রে টিউশনিও করতে পারেন না। কখনও কখনও দু একটা ছাত্র জোটে, বাড়ীতে এসে পড়ে। তা, তারা আর কতই বা দেবে বলুন? চার পাঁচ টাকার বেশি তো নয়। দুটো প্রাণী—এই বাজার, শুধু নুন-ভাত খেতে কত লাগে বলুন তো!'

অকস্মাৎ যেন নিকষ কালো আঁধারে জ্যোতির বিচ্ছুরণ হ'ল। মজ্জমান ব্যক্তি তৃণ নয়—একটা নৌকাই দেখতে পেলেন। বলাইবাবু বলে উঠলেন, 'থামো থামো। হয়েছে—আচ্ছা পূর্ণ মাষ্টার মশাইয়ের বয়স কত হ'ল বলো তো।'

'বয়স? ঠিক ষাটে রিটায়ার করেছেন, আর সেও তো আজ দশ বছর হ'ল। পুরো সত্তর ধরুন।'

'ঠিক হয়েছে। ইয়া—মার দিয়া কেল্লা! সেপ্টুয়াজেনারী করা যাক্ পূর্ণ মাষ্টার মশায়ের। কি বলো?'

'অর্থাৎ—?' সত্যেন কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে থাকে।

'আরে, এটা বুঝলে না? জয়ন্তী, জয়ন্তী—মাষ্টার মশাইয়ের সত্তর বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে এক বিরাট জয়ন্তী সভার আয়োজন করা যাক। সেই সভায় ওঁকে এক অভিনন্দন পত্র, গরদের ধুতি-চাদর এবং একটা টাকার পার্স দেওয়া হবে। এমনি দুঃস্থ মাষ্টারের জন্য দু-এক টাকা চাঁদা চাইতে গেলে কেউ দেবে না ভাই, কিন্তু জয়ন্তী বললে লোকে বুঝবে—দেবেও।'

'দেবে কি?' সংশয়ের সুর বাজে সত্যেনের কণ্ঠে।

'আলবৎ দেবে। দেওয়াতে হবে। বেশ বড় ক'রে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এক য়্যাপীল বার করতে হবে, দেখাতে হবে যে এত বড় মহাপ্রাণ ব্যক্তি এদিকে আর জন্মায় নি। তবে দেবে। দাদা, সবাই বড়কে দিতে চায়—সেই আলোয় নিজেকেও আলোকিত করবে ব'লে। কেষ্ট বিষ্টু একজনের অভিনন্দন সভায় চাঁদা দিলে হয় তো নাম বেরোবে, জানাজানি হবে—এমনি প্রাইভেট ভিক্ষে দিয়ে লাভ কি?···না না, সে ঠিক হয়ে যাবে—ছাখো না, এয়সা মুস্লবিদে করব একখানা য়্যাপীল!'

উৎসাহে বলাইবাবুর চোখ জ্বলতে থাকে!

২

কলকাতার উপকণ্ঠে গ্রাম—এখন প্রায় শহরই হয়ে উঠেছে। বাড়ী ভাড়ার রেট ও জিনিসপত্রের দাম কলকাতাকে ছাড়িয়ে গেছে। শুধু নাগরিক জীবন-যাপনের কতকগুলো স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা এখনও হয় নি। খোলা নর্দমার দুর্গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হয়ে থাকে, মশার উৎপাতে সন্ধ্যা থেকে বসা যায় না।

তা হোক, লোক কম নেই এখানে। টাকা কি আর উঠবে না? খুব উঠবে!

বলাইবাবু নিজেকে আশ্বাস দিয়ে য্যাপীল লিখতে বসেন।

লেখবার আছেও ঢের। যখন জায়গাটা শহর হয় নি, সেই প্রায় নব্বুই বছর আগে, ১৮৬২ সালে, প্রথম ইংরেজী পড়বার ব্যবস্থা হয় এই ইস্কুলের পত্তনে। সেই ইস্কুলের হেড মাষ্টার পূর্ণবাবু বিয়াল্লিশ বছর হেডমাষ্টারি করার পর অবসর নিয়েছেন। কর্মক্লান্ত জীবনে তবু দেশবাসীর সেবা বন্ধ করেন নি, এখনও যতটা পারছেন বিদ্যা বিতরণ ক'রে যাচ্ছেন। এখানকার অনেক বিখ্যাত এবং প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিই তাঁর ছাত্র। তাঁরা সবাই জানেন, কি যত্নের সঙ্গে, কি ঐকান্তিকতার সঙ্গে পূর্ণবাবু ছাত্রদের পড়াতেন। অধ্যাপনা ছিল তাঁর তপস্যা, ছাত্ররা ছিল তাঁর ইষ্ট।

সংক্ষেপে এই।

আর যা ইতিহাস তা এতে লেখবার নয়। তাতে সুর কেটে যাবে। সমস্ত সত্য ইতিহাস বিবৃত করতে গেলে বলতে হয় যে আঠার বছর বয়সে কুড়ি টাকা মাইনেতে ঢুকে ছিলেন, রিটায়ার করেছেন পঁয়ত্রিশ টাকাতে—বিয়াল্লিশ বছর চাকরী করার পরও। বলা চলত যে এই সেবার পরও ওঁরা তাঁকে সাত টাকার বেশি পেন্সন দিতে পারেন নি। বলা চলত যে মাটির একখানি ঘর ভরসা—তারও গোলপাতা পচে গলে গেছে, বর্ষায় ভেজা ছাড়া উপায় থাকে না। সে ঘরও হেলে পড়েছে গোড়ার মাটি ধুয়ে গিয়ে—পাশে ভাগ্নের প্রাসাদে ঠেকে না থাকলে পড়েই যেত। বলা যেত যে ওঁর সে ভাগ্নে ওঁর কাছেই ছেলেবেলা লেখাপড়া শিখে বড় চাকরী পেয়ে এই প্রাসাদ তৈরী করেছে কিন্তু তার একখানা ঘর মামাকে ছেড়ে দিতে পারে নি—তবে মাসিক পাঁচ টাকা ক'রে সাহায্য করে।

কিন্তু এসব বললে চলবে না।

আর যা বলা উচিত ছিল—সেটার গুরুত্ব বলাইবাবু জানেন না। বলা চলত যে পূর্ণ মাষ্টার মশাই যখন পড়াতেন প্রতিটি ছাত্রের দায়িত্ব বহন করতেন নিজে। কোন একটি ছাত্রকে কি একটা ভুল অর্থ ব'লে দিয়ে একটি পুরো রাত ঘুমোতে পারেন নি তিনি; পরের দিন ভোরে উঠে আড়াই মাইল পথ হেঁটে গিয়ে ভুলটা সংশোধন ক'রে এসেছিলেন। বলা চলত যে প্রত্যেকটি বই পড়ে দেখে তবে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করতেন। ইদানীং কর্তৃপক্ষের চাপে সব সময় নিজের পছন্দমত বই পাঠ্য করতে পারতেন না। কিন্তু ভুল আছে কি না দেখে সংশোধন ক'রে তবে ছাড়তেন। একবার জিতেন্দ্রলালের নামে প্রচলিত একটি ইংরেজী বইতে in the sun-এর জায়গায় under the sun দেখে তিনদিন তিনরাত্রি নিদ্রা ছিল না তাঁর। একদিকে লেখকের প্রচণ্ড খ্যাতি আর একদিকে নিজের জ্ঞান—এই দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে একদিন প্রকাশকের কাছে ঠিকানা জোগাড় ক'রে সত্যি-সত্যিই কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট জিতেন্দ্রলালের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর যখন জিতেন্দ্রলাল সে ভুল স্বীকার ক'রে নিলেন এবং অকপটে জানালেন যে বইটি তাঁর লেখা নয়—তিনি একবার অলস চোখ বুলিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু ওটা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে—তখন পূর্ণ মাষ্টার মশাই স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে ছিলেন, কথাটা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় নি এবং বেরিয়ে আসবার সময় যখন জিতেনবাবু ধন্যবাদ দিয়ে ওঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন তখন যে পূর্ণবাবুর চোখে জল এসেছিল তা ভাবাবেগে নয়, জিতেনবাবুর মত শিক্ষিত লোক সামান্য ক-টা টাকার জন্য পরের বইতে নিজের নাম দিয়েছেন এই ভেবে ক্ষোভে ও ধিক্কারেই তাঁর নিজের চোখে জল এসে গিয়েছিল। অর্থাৎ শিক্ষাকে ব্যবসা হিসাবে কখনও তিনি দেখতে পারেন নি। অন্য মর্যাদা ছিল তার—তাঁর কাছে।

বলাইবাবু হয় তো এত ইতিহাস জানতেন না, কিংবা জানলেও তার এত মূল্য বুঝতেন না। তিনি নিজে এ ইস্কুলের ছাত্র ছিলেন না কিন্তু শুনেছিলেন যে পূর্ণ মাষ্টার মশাই হাতের লেখা নিয়ে বড় খিট খিট করেন। আইয়ের মাথায় ফুট্‌কী না দিলে কিংবা ছোট টি-এর মাথা না কাটলে নম্বর কাটেন। সে জন্য তিনি আগে পাগল মনে করতেন ওঁকে, এখন করুণার চোখে দেখেন।

যাই হোক—য়্যাপীল লেখা হ'ল। তাতে 'পূর্ণচন্দ্র সংবর্ধনা সমিতি'র হয়ে বলাইবাবু

নিজেই সম্পাদক ব'লে সই করলেন। সমিতির সভ্য হিসাবে কয়েকটি নামও বলাইবাবু বসিয়ে দিলেন নীচে। সত্যেনকে চোখ টিপে বললেন, 'বেশ শাঁসালো দেখেই নাম দিয়েছি। সভ্যদের কাছ থেকে পাঁচ টাকার কম নিও না—বলবে সে কি স্যার, আপনি সংবর্ধনা সমিতির সভ্য, এর চেয়ে কম দিলে চলে কখনও?'

সত্যেন বললে, 'যদি কেউ বলে এ সমিতি কবে গঠিত হ'ল—কারা করলে, তখন কি বলব?'

'কেউ তা জিজ্ঞেস করবে না। আর যদিই করে তো বলবে, অমুক দিন বলাইদার ওখানে আমরা একদিন মীট্ করেছিলুম। আপনি স্যার সর্বসম্মতিক্রমে সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন। ব্যস—ওতেই গলে যাবে।'

পাড়ার পশুপতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর মালিককে ধরে য্যাপীলখানা বিনামূল্যে ছাপিয়ে নেওয়া হ'ল। কাগজও তিনিই দিলেন। এছাড়া বিল-বুকের দাবীটাও জানানো রইল। বলাইবাবু বললেন, 'তুই তো ওঁর ছাত্তর রে পশু। এ ছাড়াও তো চাঁদা আশা করি কিছু তোর কাছে। তাঁর জন্যই তো ক'রে খাচ্ছিস আজ।'

পশুপতি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'তা ঠিক। তবে কি জানিস্ কাগজ মেলে না, ছাপার কাজ তো একরকম বন্ধই। নেহাত খদ্দেরের কাছ থেকে স্পয়লেজ ব'লে কিছু কিছু সরিয়ে রাখি দু' চার শীট, তাই এখন দিতে পারলুম। নইলে এই কাগজ জোটানোই ভার হ'ত। তা না হ'লে দিতে কি আর অসাধ।'

য্যাপীলের একখানা কাগজ দৈবাৎ একদিন হাত-ফেরতা হয়ে পূর্ণ মাষ্টার মশাইয়ের হাতে এসে পড়ল। তিনি প্রায় ছুটতে ছুটতে এলেন বলাইবাবুর কাছে, 'ও বলাই, এ করেছ কি? ছি ছি এ বন্ধ করো। আমার মত সামান্য লোক—না না, ভারি লজ্জার কথা।'

'কি বলছেন মাষ্টার মশাই। আপনার দেশবাসী যদি আপনাকে সম্মান দেখানোর উপযুক্ত মনে করে—সে ক্ষেত্রে আপনার আপত্তি করবার কি আছে? আর আপত্তি করলেই বা শুনছে কে! ও আমরা সবাই মিলে স্থির করেছি স্যার!'

পূর্ণ মাষ্টার মশাই আকুল হয়ে উঠলেন, 'কিন্তু কে কি মনে করবে, সে একটা—না

না, য্যাপীল করেছ করেছ, ও নিয়ে আর নাড়া চাড়া ক'রো না। টাকা কড়ি তুলো না, লক্ষ্মী বাপ আমার।'

বলাই মাথা চুলকে বললেন, 'সে তো আর হয় না স্যার—টাকা কিছু কিছু যে উঠে গেছে। এধারেও সব অ্যারেঞ্জমেন্ট রেডি। আর সত্যি কথা বলতে কি, পাড়ার লোকের আগ্রহও খুব। আপনি কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পূর্ণ মাষ্টার মশাই আরও বার-দুই ক্ষীণ প্রতিবাদ ক'রে বিমর্ষ চিত্তে বাড়ী ফিরলেন। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হ'তে লাগল যে এরকম বিপন্ন জীবনে তিনি হন নি। কারুর সঙ্গে পথে ঘাটে দেখা হ'লে পাছে এ প্রসঙ্গ কেউ তোলে সেই ভয়ে প্রাণপণে সবাইকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

অবশেষে একদিন সত্যেন এসে তাঁকে প্রণাম ক'রে চরম দুঃসংবাদটি দিয়ে গেল—আগামী মাসের পাঁচ তারিখে যে রবিবার, সেইদিনই ওঁকে অভিনন্দন দেবার দিন স্থির হয়েছে। সভাপতিত্ব করবেন স্থানীয় এক অধ্যাপক। ওঁর পুরাতন স্কুল হলেই সভার অধিবেশন হবে।

খবরটা শুনে কিছুক্ষণ যেন স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন পূর্ণবাবু। হবে এটা ঠিক—কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে হবে তা তিনি ভাবেন নি। চাঁদা তোলা ব্যাপারটা সহজ নয়, এই ভেবে কিছুটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। এখন একেবারে নির্ঘাৎ তারিখটি পর্যন্ত যখন জানা হয়ে গেল তখন আর ক্ষীণ আশাও রাখতে পারলেন না। সত্যেনকে আশীর্বাদ করবার জন্য হাত তুললেন, ঠোঁট দুটোও নড়ল কিন্তু কণ্ঠ ভেদ ক'রে কোন স্বর বেরোল না।

৩

চাঁদা তোলা ব্যাপারটা সত্যিই সোজা নয়। তবু হয়তো আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে আরও কিছু টাকা উঠত, কিন্তু বলাইবাবুর আর সে সময় ছিল না। মিউনিসি-প্যাল নির্বাচন আসন্ন, আগামী মার্চেই বোধ হয় হবে। ভোটার তালিকা তৈরী হচ্ছে।

এখন থেকে ওদিকে মন না দিলে দাঁড়ানো যাবে না, এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এখনও কি থাকা সম্ভব ?

অগত্যা যা টাকা উঠেছে তাইতেই কাজ সারতে হবে। দেখা গেল, কাপড়-চাদর কিনে আর সত্তরটি টাকা থাকে। বলাইবাবু বললেন, 'বেশ, আমি ওতে পাঁচ টাকা দিয়ে পঁচাত্তর ক'রে দেব এখন। কি আর হবে। বরং না হয় য়্যানাউন্স্‌মেণ্টের সময় একশ' এক বললেই হবে।'

সত্যেনের আয় খুবই কম। তবু সে বললে, 'আচ্ছা দিন ঠিক করুন। দেখি যদি অফিস থেকে ধার পাই তো ওটা পুরো ক'রেই দেব আমি।'

সুতরাং দিন স্থির, সভাপতি নির্বাচন সব ঠিক হয়ে গেল। কিছু জলযোগের আয়োজন করতে হবে, সেটা ঐ ইস্কুল থেকেই চাঁদা তুলে হেডমাষ্টার মশাই ব্যবস্থা করবেন স্থির হ'ল। বলাইবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কাজে মন দিলেন। অর্থাৎ পাড়ায় পাড়ায় যারা ভোটের চাঁই তাদের কাছে কীর্তিটাকে যতটা সম্ভব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ব'লে বেড়াতে লাগলেন।

এদিকে নির্দিষ্টদিনের দিন দুই আগে থেকেই পূর্ণবাবুর আহার নিদ্রা ঘুচে গেল। বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলে কিশোরী মেয়েদের যে অবস্থা হয়, কতকটা সেই অবস্থাই হ'ল ওঁর। আগের দিন তো সমস্ত রাত ঘুমোতে পারলেন না!

গৃহিণীরও সেই ব্যাপার। ক্ষার সিদ্ধ ক'রে এক মাত্র ব্যবহার-যোগ্য কাপড় জামা পরিষ্কার ক'রে রেখেছিলেন, আগের দিন গিয়ে বোনপোর কাছ থেকে একটা মটকার চাদরও চেয়ে আনলেন। এমন দিন ওঁদের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে এতকালের মধ্যে কখনও আসে নি। সুতরাং উত্তেজনার কারণ আছে বৈকি!

কতকাল ইস্কুলে যান নি। বাড়ীটা চোখে দেখেন নি প্রায় ন বছর।

রিটায়ার করার পরও দিন কতক গিয়েছিলেন, নিজে থেকে কয়েকটা ক্লাসে পড়াতে গিয়েছিলেন, অযাচিত ভাবে উপদেশ দিতে গিয়েছিলেন নতুন হেডমাষ্টারকে, কিন্তু তারপর একদিন বুঝতে পারলেন যে সে ভদ্রলোক এতে বিরক্ত হন, এমন কি ওঁর নিঃস্বার্থ ভাবে পড়ানোটাও পছন্দ করেন না। ওসব নাকি সেকেলে, ব্যাক্‌ডেটেড্‌ পদ্ধতি—একালে আর ওসব চলে না।

সেই থেকে অভিমান করে আর যান নি ওদিকে। কোন কাজে ওদিকে যেতে হ'লে

মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে গেছেন, চোখ তুলে চেয়ে দেখেন নি।

এতকাল পরে আবার সেই বাড়ীতে পা দেবেন!

কথা ছিল, সত্যেন এসে নিয়ে যাবে ওঁকে। উনি সত্যেনকে ব'লে দিয়েছিলেন, 'একটু বরং আগেই আসিস্ বাবা। ইস্কুলটা ঘুরে দেখব।' সত্যেনও অবশ্য যতটা সম্ভব আগেই এসেছিল—ঠিক ক'রে বলতে গেলে, যখন আসা উচিত তার পুরো একটি ঘণ্টা আগে—কিন্তু তবু সে এসে দেখলে পূর্ণ মাষ্টার মশাই সেজেগুজে একেবারে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। পাছে বাতাসে চাদরটা উড়ে যায় সেজন্যে চাদরটা গলায় ঝুলিয়ে তার দুটো খুঁট এক ক'রে একটা হাতে ধরে আছেন, আর একটা হাতে প্রাচীন বাঁশের একটি লাঠি। পায়ে ছেঁড়া একটি মোজা—চটি জুতোর সঙ্গে মোজা পরা মানায় না—এমন কি মোজা পরার কোন প্রয়োজনও নেই, এসব কথা ভেবে দেখার মত পূর্ণ মাষ্টার মশাইয়ের অবস্থা নয়। সত্যেনও কিছু বলতে পারলে না, এগিয়ে হেঁট হয়ে প্রণাম করতে গিয়ে দেখলে ওঁর পা দুটো কাঁপছে থর থর ক'রে।

বলাইবাবু বলেছিলেন, একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু আজ যখন সত্যেন আসবার সময় সে কথাটা স্মরণ করাতে গেল তখন তিনি আকাশ থেকে পড়লেন, 'গাড়ী! তাইতো! গাড়ী কোথায় পাই! সত্যেন, তুমি ভাই লক্ষ্মীটি এক কাজ করো—একটা রিক্সা ক'রে ওঁকে নিয়ে এসো। এই তো এইটুকু—'

পূর্ণ মাষ্টার মশাই রিক্সা করার প্রস্তাবেও মৃদু আপত্তি করলেন, 'এই তো সামান্য পথ, কি আর হবে বাবা—মিছামিছি অন্ততঃ গণ্ডা-ছয়েক পয়সা খরচ—'

কিন্তু সত্যেন বেশ একটু দৃঢ়স্বরেই বললে, 'না—না, আজ আর আপনার ওসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আজ আমাদের ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন দিকি!'

সে একটা রিক্সা ডেকে সযত্নে ওঁর হাত ধরে তুলে বসিয়ে নিজেও পাশে বসল। ওঁর হাত ধরে তুলে বসাতে গিয়ে দেখলে, শুধু পা না—হাতও কাঁপছে থর থর ক'রে। স্নায়ুর ওপর আর কোন জোর নেই ওঁর।

গৃহিণী প্রিয়ম্বদা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে স্মরণ করলেন, 'দুর্গা দুর্গা!'

ইস্কুলে এসে পৌঁছে কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইলেন পূর্ণবাবু লাল সালুর ওপর তুলো দেওয়া ক-টা শব্দের দিকে: 'আচার্য পূর্ণচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী।'

কার কথা লিখেছে ওতে? এ কিসের উৎসব? সত্যি-সত্যিই কি ঐ লাল সালুর ওপর ওঁর নাম লিখে পয়সা খরচ করেছে ওরা?···নামটায় বানান ভুল আছে। তা থাক্—তবু এ যেন বিশ্বাসই হয় না।

পূর্ণ মাষ্টার মশাই নিজেকে মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করলেন বলাইয়ের কাছে, সত্যেনের কাছে। তাঁর জীবনেও যে এমন লগ্ন আসবে তা কে ভেবেছিল? ভাগিস বেঁচে ছিলেন এই ক বছর—নইলে এ দৃশ্য দেখবার তো অন্ততঃ সৌভাগ্য লাভ করতে পারতেন না। ঈশ্বরকেও ধন্যবাদ! এদিন তিনি ওঁর জন্য রেখেছিলেন নির্দিষ্ট ক'রে।···

অফিস ঘরে ঢুকে সেই ভাঙ্গা টেবিলটি এবং হেলে-পড়া আলমারীটার দিকে চেয়ে দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে গেল। মনে হ'ল যেন কতদিন পরে পুরোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল।

এ ইস্কুল থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে যাবার দিনও এমনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি, এমনি দু চোখ ঝাপ্‌সা ক'রে জল ভরে এসেছিল—এই আল্‌মারীগুলোর দিকে চেয়েই। ঐ যে দেওয়ালের বালি খসে পড়েছে লোনা ধরে—এ সবও ওঁর পরিচিত, উনি ঠিক ক'রে ব'লে দিতে পারেন—এই ক বছরে আর কতটা বালি খসেছে, তাঁর আমলে কতটুকু ছিল।

রিটায়ার করার পরও ছুটির দিনে দুপুর বেলা এসে বাইরে থেকে বাড়ীটাকে দেখে গেছেন—দেওয়ালগুলোয় হাত বুলিয়ে গেছেন সকলের অজ্ঞাতে। নেহাৎ যেদিন অপমান বোধ ক'রে চলে গিয়েছিলেন সেই দিন থেকেই না আর কখনও ফিরে তাকান নি এদিকে! আজ যেন সে অভিমানের জন্যও অনুতাপ বোধ করতে লাগলেন।

সত্যেন পিছন থেকে ডাকলে, 'মাষ্টার মশাই।'

'য়্যাঁ?' যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠেন। যেন স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি, অতীতের কোন্ অতলে তলিয়ে গিয়েছিল তাঁর মন। কেমন একটু বিকৃতকণ্ঠেই বললেন, 'তুমি যাও বাবা সত্যেন, আপনার কাজ করো গে—আমি, আমি একটু এখানেই বসি।'

সত্যেন তাঁর অবস্থা বুঝে 'আচ্ছা' ব'লে সরে গেল।

কান্নাতেই যে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে এটা সত্যেনের অজানা নেই।

কিন্তু মাষ্টার মশাই একা থেকে তাঁর বহু পরিচিত পুরাতন বন্ধুর মত এই অফিস-ঘরটির সান্নিধ্য অনুভব করবেন, বেশিক্ষণ সে সুযোগ হ'ল না। চারিদিক থেকে ছাত্ররা ভীড় ক'রে ঘিরে দাঁড়াল এসে। দু একজন মাষ্টার মশাই এলেন আলাপ করতে। অগত্যা তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে তাঁদের সঙ্গে কথা কইতে শুরু করলেন।...

যথা সময়ে সভার কাজ শুরু হ'ল। উদ্বোধন সঙ্গীত, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের বক্তৃতা, ছেলেদের আবৃত্তি, কবিতা-পাঠ ও মানপত্র-পাঠের পর স্বয়ং মাষ্টার মশাই উঠলেন অভিনন্দনের উত্তর দিতে। বয়সের জন্য কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ও কম্পিত, তবু প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি গলা পরিষ্কার ক'রে বলতে আরম্ভ করলেন, 'মাননীয় সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ এবং কল্যাণীয় ছাত্রগণ! আপনারা আজ আমাকে যে সম্মান দেবার জন্য আহ্বান ক'রে এনেছেন আমি যে তার যোগ্য নই তা আপনারাও জানেন। তবু আমি এসেছি, তার কারণ আপনাদের আহ্বানে আমার প্রতি যে স্নেহ প্রকাশ পেয়েছে তাকে উপেক্ষা করবার শক্তি আমার নেই। কিন্তু এ অনুষ্ঠান আমার পক্ষে যতই সম্মানজনক হোক, আজ আমি সুখী নই একথাটা আপনাদের কাছে স্বীকার না ক'রে পারলাম না।'

এই পর্যন্ত ব'লে তিনি একটু থামলেন। সভাস্থ সকলে বিস্মিত, একটা মৃদু গুঞ্জনও উঠল চারিদিকে; কিন্তু পূর্ণ মাষ্টার মশাই তখনই আবার শুরু করলেন, 'দেখুন—আমি আজ কয়েকটি কথা আপনাদের কাছে না ব'লে পারছি না। তাতে যে অপরাধ হবে তা আপনারা মার্জনা করবেন। আজ আমার সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হ'ল ব'লে আপনারা আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এত কাল আমার বেঁচে থাকা ঠিক হয় নি—বহু পূর্বেই মরে যাওয়া উচিত ছিল। কারণ তা হ'লে আজ যা দেখলাম তা আর আমাকে দেখতে হ'ত না। এই ইস্কুলে আমি বিয়াল্লিশ বৎসর কাজ করেছি, সাধ্যমত কখনও ফাঁকি দিই নি—যে ছাত্রদের ভার আমার উপর তুলে দেওয়া হয়েছিল তাদের যাতে মঙ্গল হয়, উন্নতি হয়, প্রাণপণে আমি সেই চেষ্টাই করেছি। কিন্তু আজ কি দেখলাম? সেই ইস্কুলের এ কি অবস্থা হয়েছে! যে নিমন্ত্রণপত্রটি ছাপা

হয়েছে তার রচনায় তিনটি ব্যাকরণগত এবং ছ'টি বানান ভুল। একে ঠিক ছাপার ভুল ব'লে মনে করা যায় না, এ রচনারই ভুল। ইস্কুলের প্রবেশ-পথে যে লাল সালুর ওপর তুলোর অক্ষর দেওয়া সংবর্ধনা-সূচক বস্ত্রখণ্ড টাঙ্গানো হয়েছে, তাতেও বানান ভুল। যে ছেলেগুলি আমার চার পাশে ভীড় ক'রে দাঁড়াল—গাড়ী থেকে নামতেই—তারা সবাই আমাকে চেনে দেখলাম, তারা সকলেই আমার বয়ঃকনিষ্ঠ এবং দু চারজন ছাড়া কেউই ব্রাহ্মণ নয়, তবু তারা কেউ আমাকে প্রণাম করা উচিত ব'লে মনে করলে না, কেউ কেউ হাতটা একবার ক'রে কপালে ঠেকালো মাত্র। এরা ভাল করে দাঁড়াতে শেখে নি; কথা কওয়া তো দূরের কথা। এখানে এসে দেখছি যে ছাত্রগণ শিক্ষকদের শ্রুতি-সীমার মধ্যেই প্রকাশ্যভাবে সিনেমা, ফিল্ম এবং নটীদের কথা আলোচনা করছে। তাদের যে সব বই বর্তমানে পাঠ্য আছে তার দু চার খানা ওলটাতে গিয়ে নজরে পড়ল, সব বই-ই তথ্যগত এবং ছাপার ভুলে পরিপূর্ণ। অঙ্কের বইতে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে গিয়ে ছাত্রদের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তাই করা হয় নি। ভূগোলে লেখকের অবিশ্বাস্য অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। ছাত্রদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখলাম যে তাদের জ্ঞান কম তো বটেই—আগ্রহ আরও কম। পড়া বোঝবার কেউ চেষ্টাই করে না, মুখস্থ করার মত কিছু পেলে সেইটুকু শুধু মুখস্থ করে। হাতের লেখা অপাঠ্য, ভুল বানানে কণ্টকাকীর্ণ। আমাকে বেঁচে থেকে যে শিক্ষার এই অবনতি দেখতে হ'ল, তার জন্য সত্যই আমার অনুতাপের শেষ নেই! বনেদের যদি এই ব্যবস্থা হয় তাহ'লে এর উপর যে ইমারত গড়ে উঠবে, তার কি হবে? অন্য শিক্ষায়তনের কি হচ্ছে জানি না—কিন্তু আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, এ শিক্ষায়তনটি তুলে দিন।'

এই ব'লে প্রায় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বক্তব্য শেষ করে কাঁপতে কাঁপতে মাষ্টার মশাই বসে পড়লেন এবং একটু পরেই কোনদিকে না চেয়ে লাঠি ধরে ধরে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন।

তাঁর প্রণামী ব'লে টাকার যে তোড়াটা দেওয়া হচ্ছিল, কোনমতেই সেটা তাঁকে নিতে রাজী করা গেল না।

বলাইবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'ভীমরতি!'

মনের আবেগে অনেক দূর হন হন ক'রে চলে এসেছিলেন বটে, কিন্তু দুর্বল শরীরে অতখানি উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া হতেও দেরি হ'ল না। আর যেমন সেটা বুঝতে পারলেন অমনি মনে হ'ল পা-দুটো যেন ভেঙ্গে আসছে, সোজা হয়ে দাঁড়ানোও আর সম্ভব নয়।

রাস্তাতেই বসে পড়ছিলেন, অনেক কষ্টে একটা বাড়ীর রকে গিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসলেন।...

অনেকক্ষণ ঐ অভিভূত ভাবে বসে থাকবার পর হঠাৎ ওঁর চমক ভাঙ্গ্‌ল এক অতি পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে, 'এই যে স্যার, আপনি এখানে বসে! আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান।'

'কে!'

চম্‌কে চোখ মেলে চান পূর্ণবাবু, 'বিমল? কোথা থেকে এলি বাবা! আয়, আয়!' সব দুঃখ দূরে গিয়ে খুশিতে যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন।

বিমল ওঁর ছাত্র। বরং বলা চলে বিমলই ওঁর একমাত্র গৌরব করবার মত ছাত্র। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জলপানি পায়। ম্যাট্রিকেও স্কলারশিপ পেয়েছিল। তারপর ছোট্‌ ছোট টিউশনি ক'রে কলেজে পড়তে হয়েছিল বলে ইণ্টারমিডিয়েটে আর স্কলারশিপ পেলে না। পড়বার ইচ্ছা প্রবল ছিল ব'লে সাংসারিক বাধা সত্ত্বেও আবার কলেজে ঢুকল। ফলে টিউশনির সংখ্যা বাড়াতে হ'ল, কারণ বেশি মাইনের টিউশনি কে তাকে জোগাড় করে দেবে? সুতরাং সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স ও পরে এম-এ-তেও সেকেণ্ড ক্লাস জুটল। তবু আর কেউ না জানুক, পূর্ণবাবু জানেন যে শিক্ষায় এমন অনুরাগ আজকালকার দিনে দুর্লভ।

বিমল ওঁকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'এখন তো থাকি সেই রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে—এধারে আসাও হয় না, খবরও রাখি না। হঠাৎ আজ খবরের কাগজের এককোণে দেখি এই খবর। ছ পয়েণ্ট টাইপে তিন লাইন—সভাসমিতির বিজ্ঞাপনের মধ্যে। দেখেই চলে এলুম, যখন পৌছলুম তখন সভা সবে শুরু হয়েছে। তারপর তো আপনার এই কাণ্ড। আপনি বেরোলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে ভীড় ঠেলে বাইরে এসে

দেখি আপনার চিহ্নও নেই। খুঁজে খুঁজে হয়রান!'

'বোস্ বাবা বোস্।' পূর্ণ মাষ্টার মশাই সেই সংকীর্ণ রকেই পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন।

'না না—আপনার অবস্থা দেখে চারিদিকে ভীড় জমে গেছে। ছেলেপুলের দল হাসছে। চলুন বাড়ী চলুন। ইস্ আপনার জামাটা কি হয়েছে!'

মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল—রকটা কিন্তু সিমেণ্ট বাঁধানো। বসবার সময় অত লক্ষ্য ক'রে দেখেন নি, দেখা সম্ভবও ছিল না—কোনমতে চোখ বুজে অবসন্নভাবে বসে পড়েছিলেন। জামাটা ঘামে ভিজে গিয়েছিল, মাটির দেওয়ালে ঠেস দেওয়ার ফলে পিঠে কাদার ছাপ পড়ে গেল যে—সেটাও বুঝতে পারেন নি।

বিমল একটা রিক্সা ডেকে কোন মতে ওঁকে তুলে তাতে বসিয়ে দিলে। তারপর নিজেও পাশে উঠে বসে রিক্সাওয়ালাকে নির্দেশ দিলে ওঁর বাড়ীতে যাবার। সে পুরোনো ছাত্র, সে-সময় এ পাড়াতেই ভাড়া থাকত। সবই সে চেনে।

রিক্সা চলতে শুরু করার পর কেমন একটু অপ্রতিভ ভাবে পূর্ণবাবু বললেন, 'তুই তো শুনেছিস সব। আমি—আমি কি খুব অন্যায় বলেছি?'

হয়তো তিনি নিজের সমর্থনই শুনতে চেয়েছিলেন বিমলের কাছে, কিন্তু সম্পূর্ণ হতাশ হলেন যখন বিমল দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ মাষ্টার মশাই, সেই ঝগড়াই আমি করতে এসেছি আপনার সঙ্গে।'

পূর্ণবাবু বিস্মিত- এবং কিছু স্খলিত-কণ্ঠে বললেন, 'সে কি রে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে নামুন তো, বাড়ী এসে গিয়েছি।' যত্ন ক'রে হাত ধরে নামিয়ে নেয় বিমল।

বিমলবা পাঁচ ভাই-বোন। বিমলই বড়, তাবপব তিনটি বোন ও সব শেষে একটি ভাই। মা-বাবা আছেন—এই সবসুদ্ধ সাতটি প্রাণীব ভরণপোষণেব সম্পূর্ণ দাযিত্ব তাব। তাব উপব বোনগুলি সবই প্রায বিবাহযোগ্যা।

বিমলেব বাবা ছিলেন সামান্য মাইনেব কেবানী। তাতে কোনমতে সংসাবটা চলত। কিন্তু যে বছব বিমল ম্যাট্রিক পবীক্ষা দিল সেই বছবেই পবীক্ষাব ফল বেবোবাব অল্প ক'দিন পবে দেখা গেল যে, বেবিবেবি তাঁব দুটি চোখকেই গ্রাস কবেছে। তাবপব কিছু কিছু চিকিৎসাব চেষ্টা যে হয নি তা নয, কিন্তু সে আবও মাসকতক ধ্বস্তাধ্বস্তিই হ'ল শুধু—সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি আব ফিবে পাওযা গেল না। একটা চোখ একেবাবেই নষ্ট হ'ল—আব একটা চোখ ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখা চলতে লাগল, কিন্তু চিকিৎসকরা বললেন পড়াশোনাব কাজ আব কোনদিনই চলবে না।

উপার্জন সেই থেকে তাঁব বন্ধই। সামান্য কিছু হোমিওপ্যাথি জানতেন, সেইটেই অবলম্বন ক'বে আছেন। এক আনা ক'বে ওষুধেব পুবিযা নেন—তাও মেযেবা কেউ কেউ কম্পাউণ্ডাবেব কাজ কবে কিন্তু সে আয এত সামান্য যে, কোন কোন মাসে পাঁচ টাকাও হয না।

সুতবাং বিমলকে উপার্জন করতেই হবে। কিন্তু কোন্ পথে যে সেটা করতে হয়—এই সামান্য তথ্যটুকু তাব জানা নেই।

ছেলেবেলা থেকে জানত যে, কোনমতে লেখাপড়া শেখাটাই জীবনের বড় উদ্দেশ্য—আব সে শিক্ষার চবম সার্থকতা হ'ল এম-এ বা এম-এস্-সি পাশ কবা। প্রাণপণে সেই চেষ্টাই শুধু ক'বে গেছে—আব কিছু ভাবে নি, কোন দিকে তাকায নি। ছেলে ভাল, ভালভাবে লেখাপড়া কবছে ব'লে কোনদিন এমন কি বাজাব পর্যন্ত করতে দেন নি বাপ-মা, ঘব-সংসাবের অন্য কাজ তো দূবেব কথা। তিনটি বোন থাকার জন্যে কিছু বিশেষ করতেও হয় নি কোনদিন—অসহ্য তৃষ্ণা বোধ হ'লেও জল কলসী থেকে গড়িয়ে খাবার কথা বিমল ভাবতে পারে না আজও।

সুতরাং একমনে এক লক্ষ্যব দিকে এগিয়ে গেছে সে চিরকাল। অবশ্য টিউশনি

করে সংসারের খরচ কিছু কিছু চালাতে হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা সে গ্রাহ্য করে নি কোনদিন। যত পরিশ্রমই করুক—মনকে সে চিরদিন এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছে যে, এই কটা বছর শুধু, এর পর আর কোন দুঃখ থাকবে না। এই দুঃখের কালটা কোনমতে সাঁতরে পার হয়ে যেতে পারলেই—ওপারে তার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে সুখ আর আনন্দ, নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবন। শুধু সে নয়, ওরা বাড়ীর সকলেও তাই ভাবত। বোনেরা স্বপ্ন দেখত তাদের বিবাহের, স্বামী ও শ্বশুরঘরের, আর বাপ-মা দেখতেন পরিশ্রমহীন ধীর মন্থর জীবন—জামাই পুত্রবধূ নাতি-নাতনি। তাই তারাও সকলে মিলে বিমলের সঙ্গে সঙ্গে কৃচ্ছ তার সুদুশ্চর তপস্যা করেছেন হাসিমুখেই, এই তো এই ক-টা বছর, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

তারপর ?

তারপর এম-এ পাশ করার আনন্দ-উৎসব স্তিমিত হয়ে এলে প্রশ্নটা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে সামনে এসে দাঁড়াল।

কি করবে সে এখন ?

চাকরি ত বটেই—কি চাকরি ? ক্রমশঃ মুখ শুকিয়ে উঠল বিমলের। বাপ-মাও যেন একটু বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এত কষ্ট ক'রে লেখাপড়া শেখানো হ'ল (অবশ্য তাঁরা যে শেখান নি সেটা তাঁরা ভুলেই গিয়েছেন), সে কি বাড়ীতে বসে থাকার জন্যে ?

আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যাঁরা জীবনযুদ্ধে জয়ী, বেশ প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা উপদেশ দিয়ে যান—দেশ স্বাধীন হ'ল, চারিদিকে অসংখ্য লাইন খুলে যাচ্ছে ইয়ংম্যানদের সামনে—এই তো মওকা। আমাদের সময়ে কিছুই ছিল না এসব। এখন আর ভাবনা কি। তাড়াতাড়ি লেগে যাও কোথাও! আর দেরি নয়।

এই 'কোথাও'টা যে ঠিক কোথায় তা যদি বিমলকে কেউ ব'লে দিতে পারত!

খবরের কাগজ একখানা মাত্র তাদের বাড়ীতে আসে কিন্তু পাড়ায় লাইব্রেরীতে বা ছাত্রদের বাড়ীতে পর্যায়ক্রমে সব কাগজেরই বিজ্ঞাপনের পাতা সে দেখে। চেনাশোনা যত লোক আছে—চেনা এবং শোনা, দুরকমেরই পরিচিত—সকলকার কাছেই গেছে অফিসে অফিসে। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নামও লিখিয়েছে, দরখাস্তও যে না করছে তা নয়।

সব জায়গাতেই ঐ এক প্রশ্ন।

কি জান তুমি ?

ইঞ্জিনিয়ারিং কিছু জান ? কলকারখানার কোন কাজ ? কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং জানা আছে ? যদি ডিগ্রি থাকে এসব বিষয়ের এবং বছর-কয়েকের অভিজ্ঞতা থাকে তো এগিয়ে এস।

কেমিস্ট হ'তে পারবে ? কাজ করেছ কোথাও ? রিসার্চ অভিজ্ঞতা আছে ?

মেটালার্জি পড়েছ ? খানবাদের খবর রাখ ?

এগ্রিকালচারের ডিগ্রি আছে ?

কিছুই জান না ? তবে আর কি করতে পারি বলো। কোন দিক খোলা আছে আর ?

এম-এ পাশ করেছ ?

ও তো ঢের আছে। সেদিন বি গ্রেড্ কেরানীর সতেরোটা পোস্টের জন্য দরখাস্ত এসেছিল আড়াই হাজার, তাতে এম. এ., এম এস-সি. সব ছিল। নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় পরিবহণ—মানে বাস্ চালানো হবে—তাতে কন্-ডাক্টারের জন্য দরখাস্ত এসেছে ছ হাজার, তাতেও এম.এ পাস প্রার্থী আছে।

না—কিছুই হবে না। যদি বয়স থাকে তো ঐ কেরানীর চাকরীর পরীক্ষা দিতে পারো। ফর্ম নিয়ে যাও, দশ টাকা লাগবে।

শিক্ষানবীশ থাকতে চাও ?

সে বয়স আর নেই। নেভি, মিলিটারী, আই. এ. এফ. ? সাড়ে সতেরো থেকে সাড়ে উনিশ। বয়স যদি কমানো থাকে তো চলে যাও এক নম্বর গোখেল রোডে। দেখা করো গে।

বয়স আছে য্যাডমিন্স্ট্রেটিভ্ সার্ভিসের। ফাইন্যান্স পরীক্ষা দিতে পার।

সে চেষ্টাও করেছে বিমল দু-বছর ধরে। কিন্তু চারটে টিউশ্যন্ যাকে করতে হয় সকাল-বিকেল (আর তার মধ্যে তিনটেই ইস্কুলের)—তার পক্ষে এসব পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করা বাতুলতা। য্যাডমিন্স্ট্রেটিভ্ সার্ভিসে সেবার তেরোজন লোক নেবে—ওর স্থান হ'ল না সে তেরোজনের মধ্যে। নম্বর কিছু কম ছিল।

বিমল চায় লেখাপড়ার কাজ করতে। দু-একজন পরামর্শ দিলেন, দিল্লীতে খোঁজ করো কিংবা পুণায়—নতুন সব স্কিম হচ্ছে। আর শুনছি আলিপুরে, যাদবপুরে এবং

হিজ্‌লীতে সরকারের নতুন পরিকল্পনা হচ্ছে, একটু খোঁজ করো না।

কি ক'রে কোথায় খোঁজ করতে হয় সেইটেই তো জানা নেই। অসহায ভাবে বিমল একে-ওকে-তাকে প্রশ্ন করে। কেউ সদুত্তর দিতে পারে না। উত্তর দেবার জন্য সরকারের কোন বিভাগ নিশ্চয়ই কোথাও আছে কিন্তু সে কোথায় তাই বা কে বলবে ?

অকারণ হাঁটাহাঁটি করে বিমল। পায়ের দড়ি ছিঁড়ে যায় হেঁটে আর সিঁড়ি ভেঙ্গে।

সরকারী অফিসে ইচ্ছামত ঢোকা যায় না। যেখানে যেতে পারে সেখানকার লোক ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা উত্তর দেয়, বেশী প্রশ্ন করলে বিরক্ত হয়।

অথচ ওদের দীনেন্দ্র স্ট্রীটের বাড়ীওলার ছেলে তেরো বছরে মার্চেন্ট নেভিতে গিয়েছিল শিখতে—ডাফ্‌রিণ জাহাজে—এই আঠারো বছর বয়সেই সাড়ে চারশো টাকা মাইনে(বিনা খরচে)র চাকরী পেয়েছে। ওর মামাতো ভাই আই.এস-সি. একবার ফেল ক'রে গত বছর কোনমতে পাশ করেছে, সেও চলে গেল ব্যাঙ্গালোরে। শোনা যাচ্ছে, বছর চারেক পরেই সাড়ে তিনশ টাকা আয় তার বাঁধা, খুব কম পক্ষেও। ওর মামা ঘোড়েল লোক। কিন্তু ছেলের জন্য যতটা করা যায় ভাগ্নের জন্য ততটা করা সম্ভব নয়, তার উপর ওর বয়স হয়ে গেছে বেশি।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর ওকে কে পরামর্শ দিয়েছিল রেলের মেক্যানিক্যাল য়্যাপ্রেন্টিস্‌শিপ ট্রেনিং নেবার জন্য। কিছু খরচ ওরা দেয়। পাঁচ বছর পরেই দু'শ কুড়ি টাকা বেতন। কিন্তু সে নাকি ভেতরে লোক না থাকলে হয় না। ওর সে মুরুব্বি ছিল না, তা ছাড়া ভালও লাগেনি কথাটা তখন। হাজার হ'ক কারখানার কাজ ত।

এখন অনেক কারখানাতেও খোঁজ করল। কাজ পাওয়া যায়—মজুরের কাজ। ভাল কাজের জন্য চাই বিশেষ শিক্ষা। সে শিক্ষা ওর নেই। ফোরম্যান ইত্যাদি ত দূরের কথা। আজকাল কোন কারখানায় সামান্য একটু উঁচু ধরণের কাজের জন্যও বহু শিক্ষিত লোক পাওয়া যায়। ডিগ্রি ডিপ্লোমা না হ'ক, অন্য কোন ট্রেণিং-এর সার্টিফিকেট দিলেও হবে।

এম. এ. পাস ?

'কি হবে মশাই আমাদের এম. এ. পাস লোক নিয়ে ?' বিদ্রূপ খেলে যায় তাঁদের ঠোঁটের কোণে।

অগত্যা একমাত্র যে পথ খোলা ছিল সেই পথই বিমলকে নিতে হয়েছে।

এ. জি. বেঙ্গলের জুনিয়ার ক্লার্ক—এখন সে পায় মাগ্‌গি ভাতা ইত্যাদি নিয়ে প্রায় একশ পঁচিশ। কোন উন্নতির পথ কোথাও নেই। এক যদি সাব্‌অর্ডিনেট য্যাকাউন্টস্‌ সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। নইলে পচে মরতে হবে দুশো টাকায়। অবশ্য সেক্রেটারিয়েটে গেলে কিছু বেশি সুবিধা পাওয়া যায়, কিন্তু সে আশা সুদূর-পরাহত।

সেই কেরানীগিরি। আশাহীন আনন্দহীন, দীর্ঘকাল ধরে অবজ্ঞাত অবস্থায় কলম ঠেলে ঠেলে একদিন রিটায়ার ক'রে বসা অথবা বাবার মত পুষ্টির অভাবে কঠিন ব্যাধিতে ভুগে বয়সের আগেই মরে দাঁড়ানো আর ভিক্ষান্নে দিন যাপন করা।

পাথরের মূর্তির মত নিস্তব্ধ হয়ে বসে পূর্ণবাবু সমস্ত ইতিহাসটা শুনে যান। শুধু ব্যাকুল হয়ে ওঠেন যখন সব বক্তব্য শেষ ক'রে বিমল বলে, 'ছোট ভাইটার এ বছরে ম্যাট্রিক দেবার কথা ছিল, কিন্তু আমি তার আগেই তাকে ইস্কুল ছাড়িয়ে ঐ পাড়াতেই একটা কারখানায় লাগিয়ে দিয়েছি—লেদের কাজ শিখছে।'

'সে কি ?' প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠেন পূর্ণ মাস্টার মশাই, 'ভদ্রলোকের ছেলে—একেবারে সাধারণ কারখানায় কুলি-মজুরের কাজ শিখবে ?'

'অবজ্ঞা করবেন না স্যার,' কঠিন হয়ে ওঠে বিমলের গলা, 'আমাদের ঐ পাড়াতে অনেক বস্তি আছে জানেন তো, বস্তির অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর, আর তাদের বেশীর ভাগই ছোটখাট কারখানাতে কাজ করে, কিন্তু তারা কেউই আমার চেয়ে কম রোজগার করে না!'

'কিন্তু একটা বছরের জন্যে—' তবুও পূর্ণবাবু আকুল হয়ে বলতে চেষ্টা করেন, 'ম্যাট্রিকটা পাস ক'রে নিয়েও তো—'

'শুধু শুধু একটা বছরই বা নষ্ট করি কেন ?'

'না না—ঐ লাইনেই যদি দিতে চাও তো কোন টেক্‌নিক্যাল ইস্কুলে পড়িয়ে নিলে —ধরো ম্যাট্রিক পাস ক'রে যদি কোন মেক্যানিক্যাল ট্রেণিং নিত—'

'সময় নেই স্যার।' অসহিষ্ণুভাবে উত্তর দেয় বিমল, 'আমার বড় বোনের বয়স চব্বিশ হ'ল, মেজ বোন তেইশ, ছোট বোনও কুড়ি পেরিয়েছে! তাদের লেখাপড়া

শেখানো হয়নি, কারণ সঙ্গতি ছিল না। কোনমতে সকলে কষ্ট ক'রে আমাকেই সুযোগ দিয়েছে বড় হয়ে ওঠবার। ওরা যদি সেদিন ঝিয়ের মত মুখ বুজে খেটে ঝিয়েরও অধম জীবন যাপন ক'রে আমাকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ না রাখত তো আমি এম. এ. পর্যন্ত পড়তে পারতুম না। এবার ওদের দিকে তাকাতেই হবে। আমি যদি এর চেয়ে ভাল কাজ জীবনেও না খুঁজে পাই, ওরা আর কতকাল অপেক্ষা করবে? এখন দু' ভাইয়ে রোজগার না করলে আর চলবে না।'

অনেকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকবার পর পূর্ণবাবু কেমন যেন অসহায়ভাবে বলেন, 'কি জানি! সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তোর ভাইও ত ভাল পড়াশুনো করত?'

'হ্যাঁ—বরাবরই ফার্স্ট-সেকেণ্ড হ'ত!'

'উঃ!' কেমন যেন এক ধরণের আর্তনাদ ক'রে ওঠেন পূর্ণবাবু। এ যেন আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথার চেয়েও বেশি—যেন তাঁর দেহেরই কোথাও একটা গুরুতর আঘাত লেগেছে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বিমল বলল, 'এই মাত্র আপনি যে অভিযোগ ক'রে এলেন তারই আমি জবাব দিচ্ছি। আপনি চিরদিন ঐ পুরানো ইস্কুলের ভাঙ্গা দেওয়াল-গুলোর মধ্যে বদ্ধ হয়ে ছিলেন, তার বাইরের জগৎ আপনার জানা নেই। মনে আছে 'টি'র মাথা না কাটলে কিংবা 'আই'-যে না ফুটকি দিলে আপনি নম্বর কাটতেন আর বকা-বকি করতেন, কিন্তু তাতে ক'রে আপনি ছাত্রদের কি ভাবে মানুষ ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন? কি কাজের উপযুক্ত ক'রে?'

পূর্ণবাবু বিহ্বল হয়ে যান এ প্রশ্নের সামনে। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলেন, 'তা ত কোন দিন ভাবিনি বাবা। শিক্ষা না পেলে ছেলেরা মানুষ হবে না, সেই শিক্ষার ভার আমার হাতে—এই ভেবেই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি নির্ভুল শিক্ষা দিতে!'

'অর্থাৎ বর্তমানটাই শুধু ভেবেছেন, ভবিষ্যৎ না। বড় হয়ে ছাত্রদের একদিন বিশাল পৃথিবীর সামনাসামনি দাঁড়াতে হবে, তুলে নিতে হবে তাকে সংসারের ভার নিজের কাঁধে। সে দায়িত্ব বহনের সে উপযুক্ত কিনা, যে যুদ্ধ তাকে করতে হবে তার সমস্ত রকম পদ্ধতি সে শিখেছে কি না, ঠিকমত হাতিয়ার পেয়েছে কি না—এ সব কথা কোনদিন কি ভেবে দেখেছিলেন? যাকে চাকরী ক'রে খেতে হবে কি কাজে আসবে তার বাংলা ব্যাকরণের কচ্‌কচি আর জ্যামিতির জটিলতা? ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস জেনেই

বা কি হবে ? কেরানীগিরি যদি করে কমার্স প'ড়ে ? বেশ তো তখনই না হয় ভূগোল প'ড়ে নেবে। তার জন্য আট দশ বছরের বালকদের ওপর এ অত্যাচার কেন ?…আর যদি টেক্‌নিক্যাল লাইনে যায়, যদি তাকে লোহা-পেটার কৌশলই আয়ত্ত করতে হয় তো কোন্ কাজে আসবে তার নরঃ-নরৌ-নরাঃ কিংবা ভীত্যর্থানাং ভয়হেতুঃ ? মিছিমিছি এ সময় নষ্ট করা কেন ?'

যেন দম নেবার জন্যই বিমল থামে একটু। পূর্ণবাবু ঈষৎ অনুযোগের সুরে বলেন, 'আমরা জানতুম, এই পাঠ্য-পুঁথি যাঁরা তৈরী করেছেন তাঁরা ভেবেই করেছেন। তাই কোন দিন এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিনি। তা ছাড়া, সব রকম ভবিষ্যতের জন্যই ছাত্রদের তৈরী ক'রে দেওয়া হয় ইস্কুলে—এই আমরা জানি, পরে যে-পথে খুশি যেতে পারবে। অল্প অল্প রনেদ সব দিকেই হয়ে থাকা কি ভাল নয় ?'

'হ্যাঁ ! একখানা ঘর করবার আপনার ক্ষমতা, আপনি সেই সবটুকু সাধ দিয়ে তিনমহলা বাড়ীর ভিত ফেঁদে নিঃস্ব হয়ে বসে রইলেন। তারপর ? সে ভিতের কি হবে, আপনারই বা ঘরের কি হবে ? তার চেয়ে গোড়া থেকেই একটা পথ ধরে চলা কি ভাল নয় ? শুনেছি, আমেরিকায় এমন বিদ্যালয় বহু আছে যেখানে আগে ছাত্রদের জীবিকার পথ ধরানো হয়—তার রুচি ও ক্ষমতামত, তারপর তার আনুসঙ্গিক হিসাবে কিছু কিছু বিদ্যা সে শেখে, ঠিক যেটুকু তার প্রয়োজন। তাতে সময়ও বাঁচে, ভবিষ্যতের অনেক ব্যর্থতা, অনেক হতাশা থেকে সে ছাত্র অব্যাহতি পায়। আর আপনি সব রকম রনেদের কথা বলছিলেন না ? যে ছেলে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে এসে পড়তে ঢুকেছে, এমন কোন সেকেণ্ড ইয়ার কি থার্ড ইয়ারের ছেলেকে ডেকে কোনদিন ইতিহাসের দু-একটা প্রশ্ন ক'রে দেখেছেন কি—কি অসামান্য অজ্ঞতা তার ? আমি এই চাকরীর পরীক্ষা দিতে গিয়ে কিছু কিছু টের পেয়েছি স্যার। যেমন তারা জানে ভূগোল তেমনই ইতিহাস ! পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ম্যাট্রিক পাসও কিছু কিছু ছিল। তারা সবে ইতিহাস ভূগোল শেষ ক'রে এসেছে। নিউজিল্যাণ্ড আমেরিকার রাজধানী লেখে এবং হর্ষবর্দ্ধন অশোকের পৌত্র এবং চানক্যের পুত্র লিখে বসে থাকে ! অর্থাৎ সব দিকেই আপনাদের এই শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে ! শিক্ষা আর তার সঙ্গে তাদের জীবন !'

উত্তেজিতভাবেই কথা বলে যাচ্ছিল ওরা, প্রিয়ম্বদা ইতিমধ্যে এসে দুটি নারকেল নাড়ু এবং এক গ্লাস জল বিমলের সামনে রাখলেন। এতক্ষণ একটি কথাও বলবার তিনি

অবকাশ পাননি, কোন প্রশ্নই করতে পারেননি। তাঁর সেই শান্ত সহনশীল একান্তভাবে তদ্গতপ্রাণ মূর্তিতে কি ছিল—সহসা সেদিকে চেয়ে বিমলের চোখে যেন জল এসে গেল।

প্রিয়ম্বদা এতক্ষণে প্রশ্ন করলেন, 'কি হ'ল বাবা বিমল ওখানে?'

'ওরা ধুতি-চাদর এবং কিছু টাকা ওঁকে দিতে চেয়েছিল, উনি না নিয়েই চলে এসেছেন।' অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠকে চাপা দিতে তাড়াতাড়ি নারকেল নাড়ুটা মুখে পুরে দেয় বিমল।

'না নিয়েই চলে এসেছেন? কেন?'

'ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন! শিক্ষার নাকি এত অধঃপতন ঘটেছে যে সেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দাঁড়িয়ে কোন সম্মানই উনি নিতে পারবেন না। তাতে ওঁর সততায় বাধবে।'

পূর্ণ মাষ্টার মশাই অপরাধীর মত মাথা হেঁট ক'রে বসে রইলেন। প্রিয়ম্বদা একবার স্বামীর সেই মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'সে উনি যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন বাবা। আর কী-ই বা হ'ত, ঐ ক-টা টাকায় কি আর চিরকালের মত দুঃখ ঘুচে যেত?'

বিমল যেন জ্বলে ওঠে নিমেষের জন্য, 'দেখুন এটা স্রেফ্ জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি। নিজে চিরকাল ঠকেছেন, ভুল করেছেন, অথচ এমনভাবে আপনাদের বুঝিয়েছেন যেন উনি একজন পূজনীয় মহাপুরুষ।···নিজের জীবন নষ্ট ক'রেই শুধু ক্ষান্ত হতেন ত কথা ছিল, আপনার জীবনও উনি নষ্ট করেছেন।' বলতে বলতে সত্যই ওর চোখে জল এসে যায়। ওর নিজের জীবনের যা কিছু ক্ষোভ, যা কিছু ব্যর্থতা, যত তিক্ততা তা এই অভিযোগের মধ্যে, এই কটুক্তির মধ্যে বেরিয়ে আসে। এ চোখের জলও সেই তিক্ততারই বিন্দু এক একটি।

অপ্রতিভ হয়ে প'ড়ে চোখ মুছে হেঁট হয়ে পূর্ণবাবুর ও প্রিয়ম্বদার পায়ের ধুলো নেয় বিমল, 'মাপ করবেন স্যার, আজ আমার মাথার ঠিক নেই। আরও যেন আপনার অবস্থা দেখেই আন্ব্যালেন্স্ড হয়ে পড়েছি।···আপনার মত কর্তব্যনিষ্ঠ পরিশ্রমী মানুষের জীবনটা কি হ'ল বলুন তো! সব ছেড়ে যেটাকে অবলম্বন ক'রে ছিলেন সেটাও আজ আপনার খসে পড়েছে।···এ শিক্ষা যে কি শোচনীয় রকমের ব্যর্থ—তা নিজেকে দিয়েই ত বুঝতে পারছেন! আচ্ছা আসি—।'

বিনা ভূমিকায়, বিনা আয়োজনে অকস্মাৎ সে একেবারে উঠে দাঁড়ায় এবং পর-মুহূর্তেই বাইরে বেরিয়ে সেই খররৌদ্রের মধ্যে হাঁটতে শুরু করে।

'ও বাবা বিমল, এই এত রোদ্দুরে—' আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন প্রিয়ম্বদা, কিন্তু বিমল ততক্ষণে বহুদূর পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

খানিকটা চুপ ক'রে থাকেন প্রিয়ম্বদা। প্রশ্ন করার কিছু দরকার হয় না। এতকাল এই সংসার চালিয়ে এসে, এই মানুষের ঘর ক'রে অনেক কিছুই নিজের মন দিয়ে বুঝতে পারেন।

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে স্বামীর দিকে ফিরে বলেন, 'মুখে-হাতে একটু জল দিয়ে নাও। যা হয় খাবে চলো দুটো।'

'হ্যাঁ—এই যে যাই।'

কিন্তু তবুও তিনি উঠতে পারেন না। বিমলের শেষ কথাটা তাঁর অন্তরে বেদনা-জড়িত স্মৃতির সরোবরে প্রচণ্ড এক ঢেউ তুলেছে। তাঁর মন বসে বসে সেই ঢেউ আছড়ে পড়ারই শব্দ শুনতে থাকে।

৫

পূর্ণবাবু বিহ্বল হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত। বলতে গেলে সারা দিনেও সে বিহ্বলতা কাটল না তাঁর। আজকের মত দিন তাঁর এই সত্তর বছরের জীবনে কোন-দিনই আসেনি। সকাল থেকে সেই বিশেষ মুহূর্তটি, বরং বলা যেতে পারে নাটকীয় মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হ'তে গিয়ে বিষম উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, এবং সে উত্তেজনা বেড়েই গিয়েছিল, নাটকের যেমন অঙ্কের পর অঙ্ক চরম পরিণতির পথে এগিয়ে গেলেও প্রতি অঙ্ক শেষ হবার সময়ে আবার একটি বিশেষ ধাক্কা দেয় দর্শকের মনে—সে ধাক্কারও অভাব ছিল না, আর চরম নাটকীয় পরিণতি ত তিনিই সৃষ্টি ক'রে এলেন। সুতরাং বলতে গেলে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকই অভিনীত হয়ে গেল আজ তাঁর জীবনে। সে প্রতিক্রিয়া ত আছেই—তার ওপর বিমল আবার এ কী ক'রে গেল! 'অন্যায় করেছেন' এ কথা জানবার পর কোনদিনই তিনি স্থির থাকতে পারেন না—তার

প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত। বিমল যা বলে গেল তা যদি সত্য হয় ত তিনি একটি ঘোরতর অন্যায় করেছেন—আর বোধ করি তার প্রতিকারেরও পথ খোলা নেই। এ কী হ'ল। এখন কী করবেন তিনি? কে বলে দেবে তিনি ভুল করেছেন কি না!

সারাদিন ভেবেও তিনি কূল-কিনারা পেলেন না ভাবনার। এমনভাবে ভাবতে তিনি অভ্যস্ত নন। শিক্ষাকে এভাবে তিনি কখনও দেখেন নি। এ একেবারে নতুন কথা। সব যেন গুলিয়ে যেতে লাগল তাঁর মাথার মধ্যে।

আজ তাঁর বাল্যকালের কথা মনে পড়ছে। সেদিনও কম দুর্দিন নয়—এত সমস্যা হয়ত ছিল না জীবনে কিন্তু দারিদ্র্য ও অভাব ছিল যথেষ্ট। তবু সেদিনও এই শিক্ষাকে, যাকে বলে য্যাকাডেমিক বা পুঁথিগত শিক্ষা, তাকেও হীন ব'লে ভাবতে পারেন নি। এই শিক্ষা বিতরণ করা জীবনের মহত্তম ব্রত ও আদর্শ ব'লে বেছে নিয়েছিলেন অনায়াসে। শিক্ষক জীবনের পরিণাম সেদিনও তাঁর অজানা ছিল না। এত কালো ছবি হয়ত দেখেন নি তিনি, তবু আর্থিক অভাব অনটনের জন্য প্রস্তুত হয়েই এই জীবন বেছে নিয়েছিলেন, আর সারা জীবনে সে জন্য অনুতপ্ত হবারও কোন কারণ অনুভব করেন নি তিনি। যেটাকে আদর্শ ব'লে, কর্তব্য ব'লে জেনেছেন, প্রাণপণে সেটাকেই পালন ক'রে যাচ্ছেন, সেই লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন—এই ত ছিল এতদিন সান্ত্বনা।

অথচ আজ—

বহু কষ্টে, বহু সাধনায় যে ইমারৎ গগনচুম্বী হয়ে উঠেছিল, এতদিন পরে প্রথম শুনলেন যে তার ভিতরটাই নেই!

সাধনা! শুধু কি কৃচ্ছ্রসাধন—শুধু কি আর্থিক অভাব? সমস্ত রকমের প্রয়োজনকে সঙ্কুচিত ক'রে কোন রকমে জীবনধারণ করা?

না—আরও অনেক আছে। আজ সেই সব কথাই মনে পড়ছে। বহুদিনের শুকিয়ে যাওয়া ঘা-টায় যেন কে খোঁচা দিয়েছে—টাটকা রক্ত ঝরছে সেখান দিয়ে।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে বৈকি। খুব ছেলেবেলার কথাও।

মফস্বলে মুন্সেফ কোর্টের উকীল—পূর্ণবাবুর বাবা ছিলেন তাঁরই মুহুরী। সামান্য আয়—সংসার খুব বড় ছিল না ব'লেই চলে যেত। ওঁরা থাকতেন সে মফস্বল শহরেরও বাইরে এক ছোট্ট গ্রামে (গণ্ডগ্রাম নয়—অনেকেই যেটা ভুল ক'রে থাকে। পূর্ণবাবুর মাস্টারী মন এই স্মৃতি-মথিত আবেগের মধ্যেও মনে করে কথাটা—শুধু ছাত্র কেন, বহু

শিক্ষক ও সাহিত্যিকও এই ভুল করেন—গণ্ডগ্রাম বলতে অজ-পাড়াগাঁ বোঝেন) সেখান থেকে দেড় ক্রোশ রাস্তা হেঁটে ওঁর বাবা আসতেন চাকরী করতে, পূর্ণবাবুকেও আসতে হ'ত। প্রথম প্রথম খুব পা-ব্যথা করত—বাবা নির্জন মাঠে পড়লে কোলে করতেন এক-আধবার। বাবাকে আসতে হ'ত ভোরবেলা—শীতকালে ত রীতিমত অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে পড়তেন—কারণ সকাল থেকেই মক্কেলের ভীড় লাগবে, তার আগে মুহুরীর পৌঁছনো চাই। তিনি মনিব-বাড়ীতে খেতেন, ঐ রকমই রেওয়াজ ছিল, তার কারণ অতদূর বাড়ী গিয়ে খেয়ে আসা সম্ভব নয়। এখনকার কথা পূর্ণবাবু জানেন না, কিন্তু তখনকার দিনে অনেক মক্কেলও উকীলবাড়ী মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে চাট্টি ভাত খেয়ে নিতেন। রান্না করতেন অবশ্য উকীলবাবুর বাড়ীর মেয়েরাই—ওঁর স্ত্রী আর বিধবা বোন, কিন্তু তবু তাঁদের বিরক্তি প্রকাশ করার উপায় ছিল না। ঠাকুর, গরু-বাছুর, কিষেণ এসব ছাড়াও বাইরের অতগুলি লোকের রান্না—অনেকসময়ে আগে থাকতে জানাও যেত না, বাবু হঠাৎ বলে পাঠাতেন বেলা দশটার সময়ে, 'আরো চারখানা থালা বেশি পড়বে, মক্কেল খাবে।' এসব তাঁদের গা সয়ে গিয়েছিল ব'লে সাধারণত তাঁরা প্রয়োজনের একটু বেশিই রাঁধতেন—হয় বাসি থাকত নয় গোরুর ডাবায় যেত। কিন্তু তাতে ক্ষতি হ'ত না—উকীলবাবুর নগদ আয় তেমন কিছু বেশী না থাকলেও চাল-কড়াই আসত চাষের—তাতে ভাত ডাল চলত। আর তাছাড় কীই বা রান্না হ'ত—ভাত-ডাল-আলুভাতে, উঠোনের শাক-ডাঁটা-কচু দিয়ে একটা চচ্চড়ি—বড় জোর একটা বড়ি কি বড়ার তরকারী। তার সঙ্গে চালতা আমড়া কি নোড়ের টক। মাছ কদাচিত আসত—হাটের দিন কিংবা পুকুরে জাল ফেললে—সেদিন অন্য টক না হয়ে মাছেরই অম্বল রান্না হ'ত। তবে একটা কথা এই যে বাড়ীর কর্তাও সকলের সঙ্গে বসে ঐ খাওয়াই খেতেন। বেশির মধ্যে তাঁকে একবাটি দুধ দেওয়া হ'ত ভাতের সঙ্গেই।

পূর্ণবাবুও ওখানে খেতেন সকালবেলা। কারণ ছেলে ছোট, কার সঙ্গে আসবে সে একটা বড় সমস্যা, তার ওপর বাড়ীতে পড়াবে কে? ছেলেকে এনে বৈঠকখানা-ঘরের দাওয়ায় এক কোণে একটা চট পেতে বই শেলেট দিয়ে বসিয়ে দিতেন ওঁর বাবা, আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে পড়া ব'লে দিতেন বা পড়া নিতেন। দশটার সময় বাবা নিজে পুকুরে স্নান করতে যেতেন, ওঁকেও নিয়ে যেতেন। ভাত খেয়ে তিনি যেতেন কাছারী, পূর্ণবাবু যেতেন ইস্কুল। ছুটির পরও বসে থাকতে হ'ত অনেকটা—কাজ সেরে বাড়ী

যেতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যেত এক-একদিন। এক গাল মুড়ি চিবিয়ে বসে বসে ঢুলতেন পূর্ণবাবু। তারপর বাবার হাত ধরে লণ্ঠনের আলোয় বাড়ী ফিরতে হ'ত। ওঁর বই শ্লেটের সঙ্গে বাবার কাগজপত্রও বইতে হ'ত তাঁকে। বাড়ী ফিরে বাবা বহুরাত্রি পর্যন্ত কাজ করতেন—ছেলের জন্যই সকাল ক'রে বাড়ী ফিরতে হ'ত—নইলে সব মুহুরীই রাত দশটা পর্যন্ত উকীল বাড়ী থাকে। কাজ বাড়ী এনে সেটা পুষিয়ে দিতেন ওঁর বাবা।

এই জীবন।

কষ্ট তখনই বুঝতেন পূর্ণবাবু। আর সেই সুযোগে বাবা ওঁকে কেবল বোঝাতেন—'দেখছিস ত! লেখাপড়া শিখেছেন বলেই উকীলবাবু আজ মনিব—আমি ওঁর মুহুরী। নইলে কাজ ত আমিই বেশী করি, উনি কতটুকু করেন? আমি ভূতের মত খাটি আর ওঁর পয়সা হয়। তুই দেখে শেখ। মন দিয়ে লেখাপড়া শিখে উকীল হবি—এইটে যেন দেখে যেতে পারি।'

কিন্তু সেটা দেখে যাওয়া তাঁর অদৃষ্টে ঘটে ওঠেনি। তার বহু আগে, পূর্ণবাবুর যখন মোটে দশ বছর বয়স তখনই হঠাৎ মারা গেলেন ওঁর বাবা। কাছারীর সামনে ঘোড়ার গাড়ী চাপা পড়েছিলেন—সেই উপলক্ষ্য ক'রে ভুগতে ভুগতে মাস দশেক পরে একদিন চিরকালের মত চোখ বুজলেন।

পূর্ণবাবুদের দাঁড়াবার স্থান ছিল—কারণ বাড়ীটা পৈত্রিক—কিন্তু খাওয়ার মত কিছু ছিল না। এগারো বিঘা জমির তিন অংশীদার—ধান চাল যা হ'ত তাতে তিন মাসও ওঁদের সংসার চলবার কথা নয়। কাকাদের অবস্থা তথৈবচ, তা ছাড়া সদ্ভাব ছিল না কারুর সঙ্গেই। ওঁর মা নীলাম্বুজসুন্দরী চো[illegible] অন্ধকার দেখলেন। এতকাল যা কিছু জমেছিল, দশমাস চিকিৎসার খরচ টানতেই শেষ হয়ে গেছে—এখন দুটি ছেলে ও মেয়েকে তিনি খাওয়াবেন কি?

পূর্ণবাবুর দাদামশাই থাকতেন কাশীতে—খ[illegible]র পেয়ে তিনিই এসে নিয়ে গেলেন। সেকালের কমিশেরিয়েটে চাকরী—এগারটাকা [illegible]সন পেতেন ভদ্রলোক। বিপত্নীক—নিজেই একবেলা বেঁধে খেতেন ব'লে বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যেত। কিন্তু তার মধ্যে মেয়ে তার তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে ঢুকলে একটু অসুবিধা হবারই কথা। কাশীতে সেকালে খুবই সস্তা-গণ্ডা ছিল—মাসিক দুটাকা তিনটাকা আয়ে বহু বিধবা জীবন কাটাতেন, কিন্তু তবু একটা টাকা ষোল আনাই—কোন মতেই তাকে টেনে উনিশ

আনা এমন কি সতেরো আনাও করা যায় না। তার ভেতর আবার লেখাপড়া শেখার প্রশ্ন উঠলে দস্তুর-মত বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। সুতরাং বাধ্য হয়েই বাহাত্তর বছর বয়সে তাঁকে এক কাঠ-কয়লার দোকানে খাতা লেখবার কাজ নিতে হ'ল মাসিক তিনটাকা বেতনে।

একটা মাটি থেকে মূলসুদ্ধ উঠিয়ে এনে আর একটা মাটিতে ফেলা হ'ল।

কিন্তু পূর্ণবাবুর তখনও সেটা বাল্যকাল, এমন কোন অসুবিধা হ'ল না।

কাশীতে এসেই বলতে গেলে ভাল ক'রে জ্ঞান হ'ল পূর্ণবাবুর। জন্মের প্রথম লগ্নে গর্ভনিদ্রার যে ঘোর লেগে থাকে এইবার তা কাটল। ভাল ক'রে চোখ মেলে তাকালেন পৃথিবীর দিকে।

কাশী ছিল তখন বিচিত্র স্থান!

ধনবানের ঐশ্বর্যের দম্ভ এবং বিলাসব্যসনে উচ্ছৃঙ্খলতা যে কিছু না ছিল তা নয়—কিন্তু সে যেন অন্য এক কাশী। সে কাশী ছিল দূর এক প্রান্তে সরানো—ঐ চকের ধারে—কোথায় যেন 'ডাল-কা-মণ্ডী'—ঐটেই নাকি খারাপ জায়গা। আর বড়লোক জমিদার যাঁরা তাঁরাও নাকি ঐ ওধারের কোন কোন্ অঞ্চলে থাকতেন। সে কাশী পূর্ণবাবু কখনও চোখে দেখেন নি। গঙ্গার ধারে সে কাশীর দেখা মিলত চৈত্রমাসে 'বুঢ়ুয়া-মঙ্গলে'র সময়—তখন ওঁর মা এবং দাদামশাই ওঁকে গঙ্গার ত্রি-সীমায় যেতে দিতেন না।

পূর্ণবাবু দেখেছিলেন, বরাবরই দেখেছিলেন আর আজও সেই ছবিই তাঁর মনের পটে আঁকা আছে—কাশীর অন্য রূপ। 'প্লেন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিঙ্কিং' যে-কথাটা অনেক বড় হয়ে শুনেছিলেন পূর্ণবাবু, যা আর কোথাও আছে কি না তিনি অন্তত জানেন না—তার পরিপূর্ণ চেহারা দেখা যেত সে সময় কাশীতেই। অন্ধকার সঙ্কীর্ণ গলির সারি—তারই মধ্যে মধ্যে আরও অন্ধকার ঘরে বসে চলেছে শাস্ত্র চর্চ্চা। কাব্য-ব্যাকরণ-সাহিত্য-দর্শন-স্মৃতি—তার সঙ্গে সঙ্গে, ইংরেজী-জানা লোকেরও অভাব নেই—পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও চিন্তাধারার আলোচনা। টোল ঠিক না থাকলেও অধ্যাপক পরম্পরায় অব্যাহত শাস্ত্র-চর্চ্চা অক্ষয় হয়ে ছিল ঐ সব প্রায়ান্ধকার বাড়ীর কোটরে কোটরে। ছিল অসংখ্য বেদ বিদ্যালয়; এমনিও বেদ, উপনিষদ নিয়মিত পঠন-পাঠন চলত। মন্দিরে মন্দিরে

মেয়েবাড়ীতে ঠাকুরবাড়ীতে চলত কথকতা। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে রামায়ণ ও চণ্ডীর গান—পালা কীর্তন ও কথকতা। তার সঙ্গে ঐ সব ঘাটেরই সিঁড়িতে সিঁড়িতে এসে বসতেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরা, রাত আটটা নটা—গরমের দিনে আরও গভীর রাত পর্যন্ত চলত আলোচনা ও তর্ক। যার কিছু জ্ঞান আছে সে এসে কান পেতে শুনত ও উপকৃত হ'ত। এক একটি পণ্ডিতের দলকে কেন্দ্র করে ছোট খাট উৎসুক শিক্ষার্থীর ভীড় জমে উঠত—সেদিকে চেয়ে চেয়ে পূর্ণবাবুর মনে হ'ত ভাবীকালের নক্ষত্ররা নীহারিকার মত ঝাঁক বেঁধে অপেক্ষা করছে, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের প্রস্তুতি চলছে এখানে।

আমোদ-প্রমোদও কিছু ছিল বৈকি!

কোন্ বড় বড় গায়ক ওখানে না আসতেন এবং গঙ্গার ঘাটে না গাইতেন? মহীশূরের সভা-গায়ক, মাইহারের সভা-বাদক থেকে শুরু ক'রে বড় বড় গায়ক ও বাদক—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কোন দিন না কোন দিন ওখানে বসে গাইবেনই। বিষ্ণু দিগম্বরকে তিনি দেখেছেন ঐ গঙ্গার ঘাটেই। একবার যেন বাম্বিকাপ্রসাদ গোস্বামীর গানও শুনেছিলেন মনে হচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে না হ'লে কোন ঠাকুরবাড়ীতে আসর পেতে গানের মজলিস বসত। গরমের দিনে হয়ত কোন ধনী রসিক ব্যক্তির আনুকূল্যে বজরার ছাদেও বসত—দেখতে দেখতে অসংখ্য নৌকা এসে লাগত সেই বজরার সঙ্গে, পরে যারা আসত তারা লাগাত এদের সঙ্গে—এমনি ক'রে অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য নৌকা এক ভাসমান দ্বীপের সৃষ্টি করত। বহু রাত্রি পর্যন্ত চলত গান-বাজনা। সরস্বতী-পূজার রাত্রে, শিবচতুর্দশীর রাত্রে—সারারাত ধরে গান-বাজনা চলত। পরবর্তী জীবনে একবার দুদিনের জন্য কাশীতে আসতে হয়েছিল, ওঁর এক বোনের শাশুড়ী মারা যান সেই উপলক্ষে—তারই মধ্যে উনি শুনেছিলেন ইউরোপ থেকে সদ্যপ্রত্যাগত দিলীপকুমার রায়ের গান ঐ গঙ্গার ঘাটে বসেই। আজও কানে বাজছে সে সুর, পরিপূর্ণ অবসর-মুহূর্তে চোখবুজে কথাটা ভাবলেই কানে বাজে 'মলয় আসিয়া কহে গেছে কানে প্রিয়তম তুমি আসিবে' কিংবা 'ছিল বসি সে কুসুম কাননে।'

অনেক দেখেছেন পূর্ণবাবু। বহু পণ্ডিতকে। তখন তাদের মর্যাদা সব বোঝেননি, কিন্তু অপরে যে সম্ভ্রমের সুরে উল্লেখ করত এঁদের—তাতে এটুকু বুঝতেন যে, এঁরা অসাধারণ পণ্ডিত। সারা ভারতের শিরোমণি পণ্ডিত। এঁরাই সরস্বতীর বরপুত্র। পরবর্তী জীবনে এঁদের মূল্য আরও বুঝেছিলেন, এঁদের খ্যাতি তখনও বিদ্বজ্জন সমাজে

মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন পূর্ণবাবু যে অন্তত এঁদের দর্শনের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল।

এখনও চোখ বুজলে মূর্তিগুলো স্পষ্ট না মনে পড়ুক, আদলগুলো মনে আসে। দেখেছেন বেদান্তের ভারতখ্যাত অধ্যাপক সুব্রহ্মণ্যম্ শাস্ত্রীকে, দেখেছেন সাংখ্যের দিক্‌পাল পণ্ডিত রাম মিশ্র শাস্ত্রীকে। রাখালদাস ন্যায়রত্ন নাকি সাক্ষাৎ ব্যাসদেবের বংশধর। সেটা কতটা সত্য তা জানেন না পূর্ণবাবু, কিন্তু রাখালদাস যে সর্বজনপূজ্য অধ্যাপক ছিলেন তা জানেন। কৈলাস শিরোমণির কথাও মনে আছে। সবচেয়ে এক-জনের কথা মনে আছে—এখন যাঁর নামও কেউ মনে করতে পারবে না, কিন্তু তখন কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিতরাও তাঁকে সম্ভ্রম করতেন—তিনি বামনাচারী। চার বেদ তাঁর ছিল নখদর্পণে। এ না কি দুর্লভ পাণ্ডিত্য। আজ বেদ নিয়ে কে ই বা মাথা ঘামাচ্ছে। যাঁরা চর্চ্চা করেনও—তাঁরাও হয়ত স্বীকার করবেন না যে এই চারটি পুঁথি সম্যক আয়ত্ত করতে এমন কিছু পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয়!

এই জ্ঞানচর্চ্চার মহৎ অথচ সহজ পরিবেশেই পূর্ণবাবুর বাল্যকাল এমন কি প্রথম কৈশোরও কেটেছে। কিন্তু তবু তিনি প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যাদান-পদ্ধতির দিকে আকৃষ্ট হ'তে পারেননি, গতানুগতিক ইংরেজী শিক্ষায়—ইংরেজী ইস্কুলের শিক্ষার নেশাতেই উন্মত্ত হয়ে উঠে আজীবন সাধনা করেছেন যতটা সম্ভব নির্ভুলভাবে এই শিক্ষা প্রচারের জন্য।

কেন?

তার জন্য বোধ হয় প্রধানত দায়ী ছিলেন ওঁদের ইস্কুলের তারাপদবাবু। তারাপদ-বাবু বিচিত্র, তারাপদবাবু অদ্ভুত।

আজও তাঁকে স্মরণ করলে হাত দুটো আপনিই ললাটে পৌঁছয়। প্রণাম করেন মনে মনে।

আজ জীবনে এই প্রথম সন্দেহ জাগছে মনে যে তারাপদবাবুর শিক্ষার আদর্শ মনে-প্রাণে গ্রহণ ক'রে ভুল করেছেন কিনা। নইলে এতদিন নিশ্চিন্তই ছিলেন।

তবু—তারাপদবাবুর প্রভাব মুছে ফেলা আজ বোধ হয় কিছুতেই সম্ভব নয়।

৬

মাঝাবি চেহাবাব গাঁট্টাগোট্টা মানুষটি! এক গাল দাড়ি-গোঁফ, খালি পা, মালকোঁচা-মাবা ধুতি আব উড়ুনি। চোখ বুজলেই এই চেহাবাটা মনেব পটে ভেসে ওঠে। সেকালেব ইংবেজী ইস্কুলে বাংলাব মাষ্টাব—তাও কাশীব মত জাযগায—মাত্র পনেবোটি টাকা বুঝি মাইনে পেতেন। কিছু কিছু যজমানীও ছিল অবশ্য, কিন্তু সেও—তাবাপদ-বাবু নিজেই ঠাট্টা ক'বে বলতেন, 'কাশীতে যজমানেব চেযে যাজকেব সংখ্যা বেশী। ডাকবে কে?' সুতবাং খুব কাযক্লেশে সংসাব চলত। উড়ুনি ছাড়া জামা কি গবম চাদবও কখনও গাযে দেখেননি পূর্ণবাবু। বালক-সুলভ প্রগল্‌ভতায একদিন প্রশ্ন ক'বে ফেলেছিলেন তিনি, 'আপনাব শীত কবে না মাস্টাব মশাই?' তাবাপদবাবু মোদ্দা হেসেই উত্তব দিযেছিলেন, 'কবে না আবাব! কাশীব শীত—হাড়ভাঙ্গা শীত। দেখছিস্ না গাযে কাঁটা দিচ্ছে? কিন্তু কবলেই বা উপায কি? পাবো কোথায? দানে ধুতি চাদব পাই—উড়ুনিটাই জোটে। গবম গাযেব কাপড় দেবাব লোক কৈ? কদাচিৎ কখনও যা পাই, ছেলেপুলেব জন্যে বাখতে হয ত!'

জুতো নাকি কখনই পাযে দেননি। খড়ম পাযে দিতে পাবতেন, কাবণ দানে পাওযা যায খুবই—চটিও যে এক আধ জোড়া না মেলে তা না কিন্তু পাযে কিছু দিতেন না ইচ্ছা ক'বেই, বলতেন, 'ইংবেজ এদেশ থেকে গেলে তবে জুতো পাযে দেব। এখন ত অশৌচ চলছে!'

এইটেই ছিল তাবাপদবাবুব চবিত্রেব সবচেযে বড় কথা—ধ্যানে-জ্ঞানে-স্বপ্নে—ঐ এক চিন্তা। 'প্যাসন' বলাই উচিত। পূর্ণবাবু তাঁব এই সুদীর্ঘ জীবনেও এতবড় ইংবেজ-বিদ্বেষী লোক দেখেন নি। আবাব অমন ইংবেজ ভক্তও কেউ ছিল না।

পৃথিবীতে যেখানে যত অন্যায অবিচাবই ঘটুক না কেন, সে দোষটা অনাযাসে ইংবেজেব ঘাড়ে চাপিযে দেবাব অসাধাবণ ক্ষমতা ছিল তাবাপদবাবুব। খবরেব কাগজ—তখনকাব দিনে যা বাংলা সাপ্তাহিক পাওযা যেত—মন দিযে পড়তেন তিনি, বাজ-নীতি ছিল তাঁব বড় বকমেব নেশা—আব প্রতিদিন ক্লাসে এসেই সেই সব সংবাদ সম্বন্ধে তাঁব যা ব্যাখ্যা—তা ছেলেদের বুঝিযে দেবাব চেষ্টা কবতেন। ছেলেবা অনেকেই

তা বুঝত না, এসব কথা ভাল লাগত না বেশীর ভাগ ছেলেরই, কিন্তু তারাপদবাবু তা দেখতেন না। এমন কি পড়াতে পড়াতে কোন প্রসঙ্গ-সূত্র পেলেই রাজনীতিতে চলে আসতেন আর সেই উপলক্ষে যে-কোন রকমে ইংরেজের কথা এনে বিষ উদ্গার করতেন তাদের বিরুদ্ধে। পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন—উচ্চারণ ছিল বাঁকা, ব্রিটিশ পলিসি বলতে পারতেন না—বলতেন 'ব্রিটিছ্ পলিছি'—এই পলিছি তিনি প্রত্যেকটি ঘটনায় দেখতে পেতেন। ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড উপন্যাসের মিস্টার ডিকের যেমন সব কথায় 'রাজা চার্লসের মাথা' এসে পড়ত—তেমনি ছিল তারাপদবাবুরও—ছটা কথা বললেও তিনি তার মধ্যে একবার 'ব্রিটিছ্ পলিছি'র উল্লেখ করবেনই! এই পলিছির সাংঘাতিক ক্ষমতার পরিচয় তিনি প্রতিদিনকার দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ থেকে শুরু ক'রে মেঘ-বৃষ্টি-রৌদ্রের আড়ালেও খুঁজে বার করতেন।

অথচ তাঁর মত ইংরেজী শিক্ষার এমন একান্ত সমর্থকও কেউ ছিল না। সংস্কৃত পড়ার কথা উঠলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন, 'ঝ্যাটো মারো—ঝ্যাটা মারো। ওসব ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি পড়ে কি হবে বাবা—সংস্কৃত পড়া হলো পৃথিবীর উল্‌টো দিকে হাঁটা। পৃথিবী যাচ্ছে একদিকে তোমরা চলেছো অন্য দিকে। এখন সারা পৃথিবীটা পড়ে রয়েছে ঐ ইংরেজগুলোর পায়ের তলায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান রণবিদ্যা যা কিছু বলো না কেন—ওরাই হাতের মুঠোয় পুরেছে। যেমন ক'রে হোক ইংরেজী শিখে ঐগুলো আগে হাতাও তারপর অন্য কথা! সংস্কৃতে আছে কি? সাংখ্য? পাতঞ্জল? বেদান্ত?—ওরে বাবা, তাও পাবি ইংরেজী পুঁথি পড়লে। ওরা নেয়নি কি? কোন্ বিদ্যেটা ওদের আত্মসাৎ করতে বাকী আছে তাই শুনি? প্রাণপণে ইংরেজী শেখ—পৃথিবীতে যা কিছু শেখা সব তোর কাছে সহজ হয়ে যাবে। সরস্বতীর ঘরের কপাট হল ঐ এ-বি-সি-ডি—জানিস বাবা? ঐ দোর খুলতে পারিস, গোটা ঘরখানাই তোর।'

শুধু জ্ঞানের কথাই নয়—প্রয়োজনের কথাটাই ছিল তাঁর কাছে বড়। বলতেন, 'ইংরেজী লেখাপড়া না শিখলে কোনদিন ওদের চিনতেও পারবিনি, ওদের সঙ্গে লড়তেও পারবিনি। ওদের সমান হয়ে তবে ওদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘর থেকেই চুরি করতে হয়েছিল। পুরাণে এসব গল্প যে তোদের শিক্ষা দেবার জন্যেই লেখা হয়েছে বাবা!'

প্রতিদিন শুনতে শুনতে কথাটা গভীর ভাবে মূলপ্রসার করেছিল পূর্ণবাবুর মনে।

ওঁর দাদামশাই রাখালদাস ন্যায়রত্নের কাছে যেতেন অবসর পেলেই—তাঁর নিজের বেশি লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি—বোধ হয় সেইজন্যই তাঁর সাধ হয়েছিল নাতি অন্তত সংস্কৃত শিখে পণ্ডিত হোক। মুখ ফুটে ব'লেও ছিলেন সে-কথা—পূর্ণবাবু কান দেন্নি। তারাপদবাবুর কথা প্রত্যহ মনের ইস্পাতে হাতুড়ি পেটার মত ঝঙ্কার তুলত—দাগও রাখত। তাই শোনা হয়নি। হয়ত—আজ মনে হয়—দাদামশাই সেদিন দুঃখই পেয়েছিলেন।

কিন্তু শিক্ষা চাই।

একথাটাও তারাপদবাবু বলতেন। শিক্ষাই মানুষের জীবনে বড কথা। পয়সা রোজগারের জন্য কেউ যেন লেখাপড়া শিখতে এসো না। ঐ যে মারোয়াড়ীরা লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছে—কার ক-টা ডিগ্রি আছে? না, পয়সা রোজগারের জন্যে লেখাপড়া শেখার কোন প্রয়োজন নেই। টাকা চাও? কাঁধে ক-খানা গামছা নিয়ে দশাশ্বমেধের ধারে দাঁড়াও—এক টাকার গামছা বেচলে অন্তত চার আনা পয়সা লাভ পাবে। লেগে যাও। এক টাকার গামছা কেনবারও সঙ্গতি নেই? বেশ ত—রাস্তার পাশে হাজার হাজার নিমডাল আছে—কেউ কিছু বলবে না, একরাশ দাঁতন ভেঙ্গে এনে বসে যাও। কিছু ত হবে—এমনি পাঁচদিন বসলেই রোজকার খরচ চলেও একটা টাকা মূলধন জমবে। তখন গামছা কেনো। গামছা বেচতে বেচতে কাপড়—তা থেকে মুদীর দোকান। এ-ও ইস্কুলের মতই ক্লাস ওআন থেকে ক্লাস টেন! কিন্তু সে হ'ল আলাদা পাঠ। লক্ষ্মীর পাঠ।

'শিক্ষার উদ্দেশ্য তা নয়। দারিদ্র্যই হ'ল শিক্ষার গৌরব। এই ত সব মাস্টার—ভিক্ষে করলেও হয়ত বেশী রোজগার হ'ত এদের—এদের হাত দিয়ে কত বড় বড় লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। জজ মেজেস্টার—কত কে! তারা ত কৃতজ্ঞ, তারা ত দেখা হ'লে হাত তুলে নমস্কার করে, কেউ হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়েও প্রণাম করে। এই-টুকুই পুরস্কার। শাস্ত্রে বলেছে বিদ্যাদানের চেয়ে বড় দান নেই। সামান্য দেহের দুঃখ হয়ত পাচ্ছে—কিন্তু এতবড় দান ত ক'রে যেতে পারছে অনায়াসে। সে সৌভাগ্য কি কম?'

কোন অকালপক্ব ছেলে হয়ত প্রশ্ন ক'রে বসত, 'মাইনে নিয়ে পড়ানোও কি দান মাস্টার মশাই?'

জ্বলে উঠতেন তারাপদবাবু, 'মাইনে? পনেরো কুড়ি—বড়জোর ত্রিশ চল্লিশ—এই ত মাইনে। একে কি তবে বিক্রী বলবি? এ-ও দান। ঐ টাকাতে কার কী হয়? অকৃতজ্ঞ হোসনি—ঐ ক'টা টাকা দিয়ে ভাবিসনি যে গুরুকে কিনে নিয়েছিস্। এক বর্ণ শিখে যদি গুরুর কৃপায়—শিষ্য তাকে চিরদিন বাঁধা থাকে পায়।'

এই সব কথাই শুনেছেন পূর্ণবাবু—প্রতিদিন। আর শুনেছেন তার বাল্যকালে। যখন সহজেই নরম মনে ছাপ পড়ে এসব কথার। আর নরম না হলেই বা কি? তারাপদবাবুর কথা ত নয়—হাতুড়ী। যে-কোন শক্ত লোহাকেও বাঁকিয়ে নিজের ছাঁচে ফেলতে পারতেন তিনি।

না—শিক্ষার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য অগৌরব নয়।

ওদের সহপাঠী বহু ছেলেই সত্রে বা 'ছত্রে' খেত। নাটোরের সত্র, রাঙ্গামাটি সত্র, বিজয়নগর সত্র, পুঁটিয়ার সত্র—নাটুকোটাদের সত্র। কাশীতে তখন অন্ন—গৌরবাবুদের মত ডাল ভাত আর একটা নিরামিষ তরকারী—খুবই অনায়াসলভ্য ছিল। বহু ছাত্র খেত—এমন কি মাস্টার মশাইরাও কেউ কেউ খেতেন। আর তা প্রকাশ্যে—সবাই জানত, সবাই দেখত। সেটা কিছুমাত্র অগৌরবের ছিল না। টোলের বহু বয়স্ক ছাত্রও এইসব সত্রে খেত—কারণ সব অধ্যাপকের অন্নদান করার ক্ষমতা ছিল না। স্থানটার ব্যবস্থা হ'ত খুব সহজেই কিন্তু খাওয়ার অভাব। এসব সত্র ছাড়া কোন কোন ঠাকুরবাড়ীতেও প্রসাদের বন্দোবস্ত ছিল কিন্তু সে-সব বাঁধা-ব্যবস্থা। তাছাড়া ওখানে ত অধিকাংশই শিবমন্দির—শিবমন্দিরে অন্নভোগ নেই। গোপাল কি কৃষ্ণমন্দির কিংবা দেবীমন্দিরে অন্নভোগের বরাদ্দ আছে।

আহার বাসস্থান বস্ত্র—সব দিক দিয়েই দৈন্য ছিল। খুবই টানাটানি, খুবই কৃচ্ছ্রতা। তবু কী প্রসন্ন ছিল সবাই। চোখ বুজলে অতীতের যেসব ছোটখাটো দৃশ্য, যে সব আপাত-হারিয়ে যাওয়া মুখ অকস্মাৎ থেকে থেকে মনের পটে ফুটে ওঠে তাতে ঐ একটা কথাই পূর্ণবাবু দেখতে পান। প্রসন্ন মুখে সবপ্রকার দৈহিক অসুবিধা অবহেলা ক'রে পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্যাচর্চা—জ্ঞানচর্চা ক'রে যাচ্ছে। শিক্ষাই জীবনের উদ্দেশ্য, শিক্ষাই জীবনের পরিপূর্ণতা—সার্থকতা।

শিক্ষা বলতে সাধারণ লোক যা বুঝত তখন—অবশ্য সেই শিক্ষাই।

পূর্ণবাবুর দাদা-মশাই বেশিদিন টেঁকেন নি। বয়স হয়েছিল ঢের—দীর্ঘ দিন

পশ্চিমে ছিলেন বলেই সুস্থ ছিলেন। পূর্ণবাবু প্রবেশিকা দেবার কিছু আগেই তিনি একদিন অকস্মাৎ মারা গেলেন। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে হিসাব করতে বসে নীলাব্জসুন্দরী দেখলেন যে যা অবশিষ্ট আছে তাতে কাশী শহরে ছ মাস চলতে পারে, অন্য কোথাও তা-ও চলবে না। তিনি কাশীতেই রইলেন এবং অন্যান্য বিধবাদের দেখে দেখে তকলীতে সুতো কেটে পৈতে তৈরী করতে লাগলেন। যা দু' এক পয়সা হয়। পূর্ণবাবু ও তাঁর ভাই সত্রে খেতে লাগল। পাড়ার দু' একটি লোক তদ্বির করে রাঙ্গামাটি সত্রে ব্যবস্থা করে দিলে। একটু দূর পড়বে—তা পড়ুক। ওখানে নাকি খাওয়া ভাল।

তবু পূর্ণবাবু পড়া ছাড়েন নি। তারাপদবাবু বলেছিলেন, 'না হয় সবাই মিলে হপ্তায় দুদিন উপোস দিবি—লেখাপড়া খবরদার ছাড়িস নি। একটা বছরের জন্যে পাসটা দিবি না? একটা পাস না দিলে ভদ্রলোকের ছেলে পরিচয় দিবি কি ক'রে? আর কাজই বা কোথায় কি পাবি? কেরানীগিরি হয়ত জুটতে পারে তাও ধরবার লোক থাকলে। কিন্তু জীবনটা নষ্ট হ'তে দিবি এমনি ক'রে?'

বলতে বলতে চোখ স্বপ্নালু হয়ে ওঠে তারাপদবাবুর, তিনি বলেই চলেন, 'ইস্কুল কি ছিল এখানে? ইস্কুল ত বসাল ওরাই—নিজেদের মৃত্যুবাণের সন্ধান দিলে নিজেরাই। এক স্কচ্ সাহেব—কী যেন, হ্যা—জোনাথন ডানকান তখন এখানকার রাজার রেসিডেণ্ট—লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতের গবর্ণর জেনারেল—ডানকান তাঁকে ধরে রাজাকে রাজী করিয়ে প্রথম ইংরেজী ইস্কুল বসালে পাদ্রীদের দিয়ে। ঐ যে এখন যাকে কুইন্‌স্ কলেজ বলে। সে হল ১৭৯৩ সালের কথা। তারপর অবিশ্যি বাঙ্গালীই এখানে ইস্কুল করলেন—খিদিরপুর ভূকৈলাসের রাজারা—জয়নারায়ণ ইস্কুল। সেও হ'ল ধরো ১৮১৪-র কথা, আর আমাদের এই ইস্কুল বসল বাঙ্গালীদেরই চেষ্টায়—১৮৫৪ সালে, মিউটিনিরও তিন বছর আগে। এখন ত কতই হচ্ছে, শুনছি আবার চিন্তামণি মুখুজ্জে বলে একজন কে উঠে-পড়ে লেগেছে বাঙ্গালীর জন্যে এক ইস্কুল করবার। বেশ করছে, যত হচ্ছে তত মঙ্গল। ইংরেজী ইস্কুল নয় বাবা—ও ইংরেজ মারবার কামান ঢালাই হচ্ছে একটি একটি। ইংরেজ তাড়াতে হ'লে ইংরেজী পড়তে হবে—মনে প্রাণে ইংরেজ হতে হবে। এও তোদের বলে রাখছি বাবারা, যদি কেউ সত্যি সত্যি ইংরেজদের গুণকু নিয়েটু

ইংরেজ হয়ে উঠতে পারে—সেই এ দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াতে পারবে। ভেতরে ভেতরে ইংরেজ হ'লে দেখবি যে সে বাইরেটায় যতটা সম্ভব এদেশী হবে—কারণ জাতীয়তা-বোধ আমাদের কোনদিনই ছিল না, ওটা ইংরেজদেরই। বিদ্যাসাগর অমনি মানুষ ছিলেন, তাই দেশটাকে এতটা এগিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছেন। আর একজন অমনি মানুষ চাই আমরা। তাহ'লেই কেল্লা ফতে।'

ইস্কুলের পাট যেদিন চুকলো—সেইদিনই পূর্ণবাবুকে বোধ হয় চাকরী বা ভিক্ষায় বেরোতে হত যদি না ইতিমধ্যেই ওদের অবস্থা দেখে হেডমাস্টার মশাই এক অসাধ্য-সাধন করতেন। অসাধ্য-সাধনই তখনকার দিনে—কাশীতে টিউশনী। একটি ধনী পরিবারের ছ'বছরের ছেলেকে পড়ানো—তাতেই পাঁচ টাকা মাইনে। যে কোন শিক্ষকই এমন চাকরী পেলে বেঁচে যেতেন কিন্তু তখন এ রেওয়াজ ছিল না ব'লেই কেউ খুঁজত না—হেডমাস্টার মশাই অনায়াসে টিউশনীটিতে পূর্ণবাবুকে ঢুকিয়ে দিলেন। পাঁচ টাকায় তখন কাশীতে দুটো লোকের চলতে পারত।

পূর্ণবাবু ভাল ভাবেই এন্ট্রান্স পাস করলেন। আর পড়া। প্রশ্নও উঠত না যদি না ঈশ্বর একটু মুখ তুলে চাইতেন। ঐ একবারই পূর্ণবাবুর জীবনে তিনি বোধ-করি মুখ তুলে চেয়েছিলেন। ওর মা'র মামাতো ভাই একজন বেড়াতে এসেছিলেন কাশীতে—হঠাৎ গঙ্গার ঘাটে দেখা হয়ে যায়। তাঁর অবস্থা ভাল—তিনি সব দেখেশুনে সদয় হয়ে বললেন, 'বেশ ত, পূর্ণ যদি আমার ওখানে থেকে খেয়ে পড়তে চায় ত চলুক। কিন্তু তোমাদের কী হবে?'

নীলাব্জসুন্দরী বহুদিনই ভাবা ছেড়ে দিয়েছিলেন—হতবুদ্ধির মত শূন্য দৃষ্টিতেই তাকিয়ে রইলেন। পূর্ণবাবু এধারে ভেতরে ভেতরে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, এতবড় সুযোগ সামান্য সুবিধার জন্য হাতছাড়া হয়ে যাবে? তিনি বললেন, 'ওখানে কি টিউশনী একটাও জুটবে না মামা? যদি মাসে দশটা টাকাও জোটাতে পারি ত দুটো টাকা নিজের জন্যে রেখে আটটা টাকা এদের পাঠাবো। তাতেই কায়ক্লেশে এরা চালিয়ে নেবে। পারবে না মা?'

মা তেমনিই বিহ্বলভাবে ঘাড় নেড়েছিলেন।

মামা বলেছিলেন, 'তা হয়ত আমার অফিসের বড়বাবুকে বললে—কিংবা অন্য বাবুদের বললেও দুটো একটা জুটতে পারে। তা যা জোটে তাই জুটবে। তোমার হাত খরচও আমি দেব একটা টাকা মাসে। কিন্তু পাস করতে হবে, মনে থাকে যেন। পাস করো, বি.এ-টাও পড়াবো,' নইলে ঐ পর্যন্ত। আমি এক কথার মানুষ!'

সাগ্রহে ও সানন্দে রাজী হয়েছিলেন পূর্ণবাবু। এ-ত হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পাওয়া। তার জন্যে সামান্য-মাত্রও ভয় পেলে চলবে কেন?

মামাই গাড়ী-ভাড়া দিয়ে কলকাতায় নিয়ে এলেন। প্রথমে পূর্ণবাবু ভেবেছিলেন সবটাই উদারতা, মামীও তাই মনে করেছিলেন—সেজন্য স্বামীর নির্বুদ্ধিতায় কিছু বিরক্তও হয়েছিলেন কিন্তু কয়েকদিন পরেই দেখলেন যে স্বামী তাঁর শুধু-শুধুই সামান্য বিদ্যে নিয়ে অফিসে অর্থকরী পদ (অর্থাৎ মাইনে ছাড়াও যে পদে উপরি আছে) অধিকার করেননি।—কারণ এখানে আসার পর একটু একটু ক'রে তাঁর নিজের তিন-চারটি ছেলেমেয়ের পড়ার ভার সম্পূর্ণরূপেই পূর্ণবাবুর ঘাড়ে তুলে দিলেন; 'ওরে তোর পূর্ণদাকে দেখিয়ে নে না পড়াটা'—'ও পূর্ণ তোমার ভাইয়ের এই আঁকটা দেখিয়ে দাওনা বাবা'—এই ভাবে। পূর্ণ 'না' বলতে পারেন নি—বিরক্তও হননি। কৃতজ্ঞতার কিছু মূল্য তখনও মানুষের জীবনে ছিল।

তবে বাইরের টিউশনীর সময় কমে গেল। মামা সকালে বিকেলে দুটো টিউশনী জুটিয়ে দিলেন, একটি ছ' টাকা ও একটি চার টাকা। ছ' টাকার টিউশনিতে দুটি ছেলে—আর চার টাকায় একটি। এতগুলি পড়িয়ে (মামাতো ভাই-বোনদের নিয়ে সাতটি) আর সময় থাকত না একটুও। গভীর রাত্রে নিজের পড়া পড়বার সময় হ'ত। তাও আলো পাওয়া যেত না—সামান্য 'সেজ'-এর আলোয় রাত দেড়টা দুটো পর্যন্ত পড়তেন। আবার ভোর বেলাই উঠতে হ'ত। তবু পূর্ণবাবু তাতে কষ্ট বোধ করেন নি কখনও—বরং মনে মনে যেন একটা আনন্দই বোধ করতেন। পড়তে পারছেন এই ত কত সৌভাগ্য। ছাত্রদের অধ্যয়ন হ'ল তপস্যা। তপস্যা কি এতই সহজ? সম্পূর্ণরূপে নিজের দেহকে ভুলে গিয়ে এই তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন পূর্ণবাবু।..

কিন্তু বোধ হয় সকল তপস্যাতেই ঈশ্বর বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। পূর্ণবাবু সামান্য

মানুষ, সামান্য তাঁর তপস্যা—লক্ষ্য আরও ছোট, তবু ঐকান্তিকতার অভাব ছিল না ব'লেই বোধ করি ভগবান তাঁর স্বর্গলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ বরনারীকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন ওঁর তপোভঙ্গের জন্য।

সে-ই ওঁর জীবনের একমাত্র রোম্যান্স। একমাত্র আনন্দ-স্মৃতি।

পূর্ণবাবু জীবনে কোন ব্যর্থতার জন্য কখনও বেদনা অনুভব করেননি এতকাল—শুধু তরুবালার স্মৃতিটি কখনও কোন অবসর-মুহূর্তে মনে এলেই বেদনায় টন্‌টন্‌ ক'রে উঠত সমস্ত অন্তরটা।

ঐ ক্ষোভটুকুকে কিছুতেই জয় করতে পারেননি।

তরুবালা বুঝি দেবতারও আকাঙ্ক্ষিত ধন।

৭

তরুবালার সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয় এফ-এ পরীক্ষার মাত্র মাস-কয়েক আগে। ওর চার টাকা ব্যবস্থার যে ছাত্র নবগোপাল, তরুবালা তারই দিদি। নবগোপালের দিদি আছে জানতেন তিনি, কারণ তার বাবা প্রায়ই দুঃখ করতেন, 'মেয়েটা আমার খুব লক্ষ্মী, জানো বাবা কিন্তু ছেলেটা যে কোথা থেকে এমন বদ হ'ল তা জানি না। আর তেমনি বেটির লেখাপড়ায় চাড়—একেবারে লক্ষ্মী-সরস্বতী।'

ছেলেটা অবশ্য এমন কিছু বদ নয়—একটু বেশী চঞ্চল। কিন্তু সেটা ত হওয়াই ভাল। প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করতেন পূর্ণবাবু সবিনয়ে।

'একটু? রীতিমত চঞ্চল। ওতে কি লেখাপড়া হয়। তুমি আমার মেয়েকে ছাখোনি বাবা—ভারি শান্ত, আর ভারি লক্ষ্মী।'

কিন্তু দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না—কারণ তরুবালা পড়ত মহাকালী পাঠশালায়। বাড়ীতে পড়াবার দরকারই হ'ত না। দেখা হওয়ার অন্য সুযোগ-সুবিধাও অত সুলভ ছিল না। তখন ভাইদের পড়ার ঘরে পুরুষ মাস্টারের সামনে গিয়ে বোনদের দাঁড়ানো—খুবই শিশু-বয়সের মেয়ে ছাড়া—দোষের ব'লে গণ্য হ'ত।

দেখা হ'তও না কোনদিন হয়ত—দূব থেকে ছাড়া, যদি না পূর্ণবাবুব ভাগ্য-দেবতা ওঁব জীবন নিয়ে এই নিষ্ঠুব খেলা খেলতে চাইতেন।

মেয়ে বড হয়েছে, এগাবো থেকে বাবোয় পড়ল—হুকুম এল মেয়েব ঠাকুমাব কাছ থেকে—'ইস্কুল ছাড়িয়ে নাও, পড়াতে চাও বাড়ীতে ব্যবস্থা কবো।' মেয়ে কান্নাকাটি কবলে—বলতে গেলে আহাব-নিদ্রা ছেড়ে দিলে কিন্তু ঠাকুমাব হুকুম পাল্‌টালো না। তরুব বাবা ইস্কুল ছাড়িয়ে নিতে বাধ্য হলেন। বিশেষ ক'বে মেয়েব বিয়েব তাগাদা আসছিল বহুদিন থেকেই—নিজেব স্বভাব-সিদ্ধ আলস্যেব জন্যই পেবে ওঠেননি পাত্র ঠিক কবতে—সেইটেই যথেষ্ট অপবাধ—তাব ওপব এ আদেশ অমান্য কবতে তাঁব সাহসে কুলোল না।

অবশ্য ভদ্রলোক—কী যেন নাম—মনে পড়েছে, প্রাণগোপালবাবু—মেয়েকে ভালবাসতেন খুবই, দিন-কতক ঘটা ক'বে নিয়ে বসলেনও পড়াতে। কিন্তু সে সদিচ্ছাটা বেশিদিন স্থায়ী হ'ল না। চিবকাল তাঁব অফিসেব ফেবৎ স্নান ক'বে সববৎ আব ক্ল খেয়ে গিলে-কবা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে ছড়ি নিয়ে বেবোনো অভ্যাস—অন্তত পূর্ণবা বু ববাববই তাই দেখেছেন (কোথায় যেতেন তা পূর্ণবাবু আজও জানেন না)—সে অভ্যাস ত্যাগ কবা গেল না। সকালে সময় হওয়া অসম্ভব, কাবণ তিনি উঠ নই আটটাব সময়।

মেয়েকে প ন্যে বন্ধ হ'ল কিন্তু পড়া বন্ধ হ'ল না। নবগোপাল এসে প্রায়ই গল্প কবত - জানেন মাস্টাব মশাই, দিদি নিজে নিজেই আঁক কষবাব চেষ্টা কবে আব য পাবে না তখন কেঁদে ফেলে।'

শুনে শুনে একদিন পূর্ণবাবু বলেছিলেন ছাত্রকে, 'তোমাব দিদি কি অঙ্ক কষতে পাবে না—আমাব কাছে পাঠিয়ে দিতে বলো—আমি কষে দেবো খাতায়। পড়ে দেখে বুঝতে পাববে না?'

সঙ্কোচেব বাঁধে আগ্রহ মাথা কুটছিল—এইটুকু প্রশ্রয়েই বাঁধ ভাঙল। খাতা হাতে ক'বে দিদি একদিন নিজেই দেখা দিলে।

ওকে দেখে একদিনেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন পূর্ণবাবু।

সুশ্রী খুবই—তবে এমন কিছু সুন্দবী নয়। কিন্তু তাব সেই বাবো বছবেব বালিকা দেহটিকে ঘিবে এমন একটি স্নিগ্ধ শান্ত লক্ষ্মীশ্রী বিবাজ কবত যে সেদিকে

চাইলেই নিমেষে চোখ জুড়িয়ে যেত। এত শান্ত, এত ভদ্র—এত মিষ্ট স্বভাব, পূর্ণবাবু আর কারও মধ্যে দেখেন নি। আর তেমনি মেধা। ইঙ্গিত মাত্রে বুঝতে পারে, বুঝতে পারলে আর কখনও ভোলে না।

পূর্ণবাবুর মনে হ'ল এ মেয়েকে পড়ানোর জন্য নিজের পড়া বন্ধ হ'লেও ক্ষতি নেই।

সেদিন আর কিছু বোঝেন নি। তাঁর বয়স সতেরো, মেয়েটির বয়স বারো। এখনকার কালের হিসেবে বালক-বালিকা, তখনকার দিনে অবশ্য ঐ বয়সে অনেক বেশি অভিজ্ঞ ও বয়স্ক হয়ে পড়ত ছেলেমেয়েরা—কিন্তু যে কোন কারণেই হোক পূর্ণবাবু একটু কম পাকা হ'তে পেরেছিলেন ; তিনি যে ভালবেসেছিলেন তা তখন বোঝেন নি—ভাল লেগেছিল এইটুকুই জানতেন।

অন্তঃপুরে খবরটা পৌঁছতে তরুর মা নিষেধ করলেন—শাসনও করলেন কিছু, কিন্তু প্রাণগোপাল সস্নেহে বললেন, 'তা কি আর হবে বড় বৌ—দুদিন পরেই ত বিয়ে হয়ে পরের বাড়ী চলে যাবে—পড়ার শখ হয়েছে মিটিয়ে নিক। মিছিমিছি অকারণ মেয়েটাকে কাঁদিও না। পূর্ণ ছেলে ভাল, আর কে-ই বা অত জানছে যে নিন্দা হবে।'

পরের মাসে মাইনে দেবার সময় পুরো পাঁচ টাকাই দিলেন। একটু প্রসন্ন হেসে বললেন, 'পাগলী বেটি নাকি তোমাকে বড্ড জ্বালাতন করে? তা একটু-আধটু দেখিয়ে দিও বাবা।'

এক টাকা মাত্র বেশি। কিন্তু সে এক টাকা না পেলেই খুশী হতেন পূর্ণবাবু। তরুবালাকে পড়ানোর জন্য মাইনে—ছিঃ।

তরুবালাকে পড়ানো নেশার মত পেয়ে বসল পূর্ণবাবুকে। তিনি ভুলেই গেলেন যে মাত্র দুতিন মাস পরে তাঁর নিজের পরীক্ষা। পড়াতে অবশ্য আর কতটাই বা সময় নেওয়া যায়—কিন্তু সে চিন্তা বাকী অবসর সময়কে মোহগ্রস্ত ক'রে রাখত, অনেক সময় নিজের পড়বার বই খোলাই থাকত, পড়া হ'ত না এক পৃষ্ঠাও।

এর যা ফল হবার তাই হ'ল। এফ-এ পরীক্ষায় পূর্ণবাবু ফেল করলেন। লেখাপড়ায় ঐখানেই পড়ল ইতি। মামা এক কথার মানুষ—তিনি আর পড়ার খরচ দেবেন না। কাশীতে ওদের দিন চলছে না—সেখানে আরও কিছু টাকা পাঠাতেই হবে। এখানের পড়ার খরচ চালায় কে? এই পরীক্ষায় ফিরের টাকা জমা দিতেই বহু অপ্রীতিকর কথা শুনতে হয়েছে তাঁকে ওর মামীর কাছে।

'অত টিউশিনী করছে, মাসে একটা ক'রে টাকা জমালেও ত এ টাকাটা জমে থাকত! তা নয়—তোমাকে যেমন বোকাচন্দর পেয়েছে—খুব দুয়ে নিচ্ছে।' ইত্যাদি—

সুতরাং উপার্জন করতেই হবে। ভাই-বোনদের প্রতিও কর্তব্য আছে। তাদের লেখাপড়া হয় ত হোক। ওর যখন হ'লই না।

কী কাজ খুঁজবেন?—কোন্ কাজ করবেন?

কোন দ্বিধা ছিল না পূর্ণবাবুর মনে। মাস্টারীই করবেন তিনি।

মামা চেয়েছিলেন তাঁর অফিসে ঢুকিয়ে দিতে। মাইনে আপাতত পনেরো টাকা হয়ত হবে কিন্তু ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। উপরি আছে এখন থেকেই।

এই কৃতজ্ঞতার সূত্রে বিনা মাইনের মাস্টারটিকে চিরকাল বেঁধে রাখবার ইচ্ছাই হয়ত এ প্রস্তাবের মূলে ছিল প্রেরণা হয়ে—কে জানে। কিন্তু পূর্ণবাবু রাজী হন নি।

'মাস্টারী? তুই কি পাগল হয়েছিস? মাস্টারীতে কি আছে? চিরজীবন দুঃখে কাটবে। তাছাড়া কী-ই বা লেখাপড়া শিখেছিস তুই যে মাস্টারী করবি? এফ-এটা পাস করলেও যা হয় হত।'

কিন্তু সদানম্র পূর্ণবাবু এই একটি স্থানে কঠিন হয়ে রইলেন। তারাপদবাবুর শিক্ষা তাঁকে পিটিয়ে কঠিন করেছিল—তিনি জানালেন, যা হবার হবে, তিনি মাস্টারীই করবেন।

খোঁজাখুঁজি ধর-পাকড়ের পর একটা মাস্টারী পাওয়া গেল। মাসিক কুড়ি টাকা মাইনে।

সেই টাকাটাই সেদিন মনে হয়েছিল ঢের। কুবেরের ঐশ্বর্য। ছেলেপড়ানো-গুলো ত রইলই।

ভাডাটে ঘব খুঁজে মা-ভাইদেব আনাবাব ব্যবস্থা কবলেন। এক কথায় শুরু হ'ল তাঁব সংসাব, শুরু হ'ল তাঁব নিজস্ব জীবন। নিজেব পথে নিজেব ইচ্ছায় সে জীবনধাবাকে চালিত কববেন তিনি।

কিন্তু সেদিন কি শুধু মামাই প্রস্তাব কবেছিলেন চাকবীব?

তাঁব এই শিক্ষকতা কবাব জেদ বাখতে গিয়ে কি চবম স্বার্থত্যাগই কবেননি তিনি?

প্রাণগোপালবাবুব বড একটা এসব তুচ্ছ কথা খেয়াল থাকত না। কিন্তু হয়ত অদৃশ্য কোন ইঙ্গিতেই তিনি একদিন ওদেব পড়াব ঘবে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হয়ত তরুবালাব সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা ছাড়াও কোন গভীবতব মনোভাবেব ইঙ্গিত পেয়ে তরুব মা-ই প্রবুদ্ধ কবেছিলেন প্রাণগোপালবাবুকে। প্রাণগোপালবাবু মিনিটখানেক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে ছড়িটা মোটা কপাটে ঝুলিয়ে বেখে ছেলে-মেয়েকে বলেছিলেন, 'তোবা একবাব ভেতবে যাতো—আমি মাস্টাব মশাইয়েব সঙ্গে কথা বলি একটু।'

শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন পূর্ণবাবু। কী এমন কথা। তবে কি তাঁব আচবণে কোন বৈসাদৃশ্য দেখা গেছে। বা কর্তব্যে কোন অমনোযোগ?

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে হয়নি তাঁকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণগোপালবাবু প্রশ্ন কবেছিলেন, 'তুমি না এফ-এ একজামিন দিয়েছিলে বাবা? কি হ'ল তাব?'

মাথা নিচু ক'বে পূর্ণবাবু উত্তব দিয়েছিলেন, 'ফেল কবেছি।'

'ফেল কবেছ? ইস্। ছেলেমানুষ—। ফেল কবলে কী ক'বে? তোমাব ত বেশ ভালো মাথা বলেই মনে হয়?'

তাবপবে আব উত্তবেব অপেক্ষা বাখেন নি। পুনশ্চ প্রশ্ন কবেছিলেন, 'তাবপব? এখন কি কববে?'

মাথা হেঁট ক'বেই পূর্ণবাবু বলেছিলেন, 'একটা মাস্টাবী পেয়েছি—আপাতত তাই কবব।'

'মানে পড়াশুনো আব কববে না—কেমন ত? তা ভালই—মিছিমিছি সময নষ্ট। সেই যখন চাকবী-বাকবীই কবতে হবে। তা মাস্টাবী কেন? ওতে কাজ

নেই, বরং ভাল একটা চাকরী ছ্যাখো—বলো ত আমিও চেষ্টা দেখতে পারি।'

পূর্ণবাবু মাথা হেঁট ক'রেই ছিলেন। কথা বলেন নি।

কিন্তু দিনকতক পরে যখন প্রাণগোপালবাবু চাকরীর প্রস্তাব নিয়ে এলেন—পঁচিশ টাকা মাইনে—পরে বাড়বে—চাই কি বড়বাবু হওয়াও বিচিত্র নয় একদিন—তখন আর চুপ ক'রে থাকা চলেনি। কথা বলতে হয়েছিল।

'আজ্ঞে, আমার মাস্টারীই ভাল লাগে। অফিসের চাকরী আমি করব না।'

'এঃ—তুমি একটা আস্ত পাগল। চাকরী পেলে কি কেউ মাস্টারী করে নাকি? কী আছে ওতে? ওসব মতলব ছাড়ো, কালই একটা দরখাস্ত লিখে দিও দিকি, বরং মুসৌবিদেটা আমিই ক'রে দেব—'

সবিনয়ে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে পূর্ণবাবু জানিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতের কোন স্বর্ণ-স্বপ্নেই তিনি তাঁর বেছে নেওয়া পথ ছাড়তে রাজি নন।

তখন আসল প্রলোভনটাই সামনে তুলে ধরেছিলেন প্রাণগোপালবাবু—জানিয়েছিলেন তাঁর কল্পনা। পূর্ণবাবু তাঁদেরই স্বজাতি—পাল্‌টি ঘর। তাঁর ইচ্ছা তিনি পূর্ণবাবুর সঙ্গে তরুবালার বিবাহ দ্যান। চাকরী তাঁর নিজের অফিসে, উন্নতিও কতকটা তাঁর হাতে—বেশি দেরী হবে না মাসিক আয়টা একশ' টাকাতে পৌঁছতে। আর কি চায় পূর্ণ। তবে একথাটাও আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রাণগোপালবাবু যে তাঁর অত আদরের মেয়েকে ইস্কুল-মাস্টারের হাতে তিনি দেবেন না। বিশেষত যখন ওর এই অবস্থা—না চাল না চুলো—না কিছু।

সেদিন একটু টলেছিলেন বৈকি পূর্ণবাবু।

সারারাত সেদিন ঘুমোতে পারেন নি—পায়চারি করেছিলেন ছাদে। এক-দিকে ওর আদর্শ, তারাপদবাবুর শিক্ষা—আর একদিকে জীবনের সবশ্রেষ্ঠ প্রলোভন।

এ কী পরীক্ষায় ফেললেন তাঁকে ভগবান। এখন কি করবেন তিনি?

তরুবালা? তাঁর আত্মার আনন্দ, তাঁর প্রাণের আরাম।

কোনদিন ভুল হয় না তার, পড়াতে গেলে প্রথমেই পাখা হাতে ক'রে এসে বসে বাতাস করতে, যতক্ষণ না গায়ের ঘাম জুড়োয়। কোনদিন ভুল হয় না তার

পূর্ণবাবুর বাড়ী চলে আসবার সময় প্রণাম করতে। তার সেই দীর্ঘ পক্ষ্মাচ্ছাদিত চোখের কী যে শ্রদ্ধা, কী যে প্রীতি নিয়ত উৎসারিত হতে থাকে—তিনি যতক্ষণ তার দৃষ্টিসীমায় থাকেন।

প্রতিটি কাজে তার কী নিপুণতা! কোন দিন কোন উপলক্ষে জলখাবারের ব্যবস্থা থাকলে কি যত্ন ক'রে আসন পাতে, ঠাঁই করে এবং খাবার এনে সাজিয়ে দেয়। হাতে জল ঢেলে দেওয়া থেকে, আচমনের শেষে পা ধুইয়ে দিয়ে পা মুছিয়ে দেওয়ার মধ্যে শুধু কি সুশিক্ষা, তার সঙ্গে কি ঐকান্তিকতাই কম—নিজের অন্তরের ?

সেই তরুবালা তাঁর হবে। তাঁরই জীবনসঙ্গিনী, তার গৃহিণী—? তাঁর অন্তঃপুরে থেকে তাঁর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করবে, এমনি অস্খলিত সেবা করবে চিরকাল ?

কিসের জন্যে এ সুদুর্লভ সৌভাগ্যের সম্ভাবনা হাতে পেয়েও ছাড়বেন তিনি ? কি দিতে পারে তাঁকে তার আদর্শ ? .

তবু সারারাত চিন্তার পর সেদিন তাঁর কাছে তার আদর্শই জয়ী হয়েছিল। এতদিনের স্বপ্ন-কল্পনা, এতদিনের শিক্ষা ও জীবনব্রতকে ছাড়া সম্ভব হয়নি।

তরুবালাকেই ত্যাগ করেছিলেন সেদিন। সেই সঙ্গে ছেড়েছিলেন লক্ষ্মীকে —চিরদিনের মত নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সৌভাগ্যের সম্ভাবনাকে।

'না'ই ব'লে দিয়ে এসেছিলেন প্রাণগোপালবাবুকে, তার পরদিন থেকে আর পড়াতেও যাননি। বেশি দিন হয়ত যাওয়া সম্ভবও হ'ত না—কারণ এই একেবারে দক্ষিণপাড়া চাকরী ক'রে অতদূরে পড়াতে যাওয়া পোষাত না। তবু সেইদিন থেকেই ছেড়েছিলেন—লোভ বড় বলবান।

আজ প্রথম সংশয় দেখা দিয়েছে, আজ প্রথম মনে হয়েছে—সেদিন তিনি ভুলই করেছিলেন, নির্বুদ্ধিতার চরম পরিচয় দিয়েছিলেন সেদিন।

সব ভুল, সব বৃথা।

যে দেবতাকে আজীবন পূজা করেছিলেন, বুকের সমস্ত রক্ত দিয়ে—আজ তিনি শুনলেন বিমলের মুখে যে সে দেবতা সেখানে নেই। বেদীমূলে ফুল বিল্বপত্র দিতে দিতে নিচের দিকে চোখ ছিল, ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখেননি তাই, যে কখন সে দেবতা অন্তর্হিত হয়েছেন। কিংবা আদৌ সে দেবতা ছিল কিনা!

৮

সারাদিন ধরেই মনটা তিক্ত হয়ে রইল বিমলের। কারণ আঘাত যতটা সে দিয়ে এসেছে তার অনেক চেয়ে বেশি পেয়েছে সে নিজে। পূর্ণবাবুকে সে শ্রদ্ধা ক'রে এসেছে চিরকাল। কোন্ অলক্ষ্যে সে শ্রদ্ধা একদা প্রীতিরসে সিক্ত হয়ে গিয়েছিল তা বোধ করি সে নিজেও টের পায়নি। সুতরাং, এমনিতেই তাঁকে আঘাত দেবার বেদনা তো আছেই। তাছাড়া আছে নতুন ক'রে নিজের সম্বন্ধে সচেতনতা। যে খোঁড়া সে খুঁড়িয়ে চলতে চলতে ক্রমশ নিজের খঞ্জতার কথা ভুলেই যায়। নতুন কোন আঘাতে সচেতন হ'লে শুধু যে সে আঘাতের ব্যথাটা অনুভব করে তাই নয়—এত দিনের সমস্ত বেদনার ইতিহাসটাও নতুন ক'রে তার মনে পড়ে। বিমলের হয়েছিল তাই। জীবনের ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গের বেদনা—প্রত্যহের নিত্যনিয়মিত-তার ও কর্মব্যস্ততায় একরকম ভুলে ছিল, অন্তত অনুভূতিটা গিয়েছিল খানিকটা অসাড় হয়ে। আজ এই আঘাতে নিজের জীবনের খঞ্জতা যেন নতুন ক'রে তীব্র বেদনা নিয়ে জেগে উঠেছে ওর মনে, নতুন ক'রে সেই সমস্ত ক্ষোভ আর গ্লানি ক্ষত-বিক্ষত করছে ওর সারা অন্তরকে। কিছুতেই তাই যেন সেদিন স্থির থাকতে পারল না ও—কোথাও। খেতে বসে উঠে গেল খাওয়া অসমাপ্ত রেখে, উত্তর দিল না কারও কথার, শেষ পর্যন্ত একটু রোদ পড়তেই সে বেরিয়ে পড়ল, তখন থেকে রাত এগারোটা অবধি পাগলের মত ঘুরে বেড়াল সে। একটা অশ্রান্ত বিক্ষোভ যেন অহরহ ওকে ঠেলছে সামনের দিকে—কোথাও ওর শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই।

পরের দিন স্নানাহার ক'রে সে যখন অফিসে এল তখন আগের দিনের তিক্ততা আর না থাকলেও তার কটু স্বাদটা যেন একেবারে যায়নি। যেন একটা অবসাদ আজ আচ্ছন্ন করেছে তাকে, আগের দিনের সেই উল্কার মত গতিরই প্রতিক্রিয়া বোধ হয় এটা।

কালকের একটা জরুরী ফাইল সারতে হ'ল অফিসে এসেই। এটা শনিবার দেবার কথা ছিল, দেওয়া হয়নি। অফিসে ঢুকতেই ওদের সেকশনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শরৎবাবু শুনিয়ে দিলেন যে, এখুনিই খোদ ছোট সাহেব অর্থাৎ

ডি-এ-জি তলব করবেন ফাইলটা। ওটা ক'রেই দিতে হবে।

অভ্যস্ত হাত চলে কোনমতে। মস্তিষ্ক অবসন্ন হয়ে যেন ক্লান্ত চোখ দুটি মেলে থাকে—নির্লিপ্ত উদাসীনের মত। পনেরো মিনিটের কাজ আধ ঘণ্টায় শেষ ক'রে ফাইলটা পাঠিয়ে দিয়ে সোজাসুজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বিমল। আগেকার দিন হ'লে কাজের একটা 'শো' তাকে বজায় রাখতে হ'ত অন্তত। এখন, অর্থাৎ স্বাধীনতা পাওয়ার পর, তার আর দরকার হয় না। চারিদিকেই এই ভাব, কেউ খবরের কাগজ পড়ছেন, কেউ পান-খাওয়া দাঁত খুঁটছেন কেউ বা পাশের টেবিলের সহকর্মীর সঙ্গে উচ্চকণ্ঠেই গল্প করছেন। বারোটার পর চা খেয়ে ওঁরা ফাইল খুলবেন। দু' একজন যাঁরা এখন কাজ করছেন তাঁরা আবার ঐ সময়ে উঠে পড়বেন। কেউ যাবেন হাওড়ার হাটে কাপড় কিনতে, কারও বা বড়বাজার থেকে ডাল-মশলা কেনা দরকার, কেউ বা এমনিই অন্য সেকশনে গিয়ে গল্পের আসর জমাবেন।

শ্রান্ত বিমল এদের দিকেই তাকিয়ে রইল বটে কিন্তু এই অফিস, এই পরিবেশ —এ সবে তার মন ছিল না। ওর মন চলে গিয়েছিল বহু দূরে—ওর ছেলেবেলায়। পূর্ণবাবুর কথাই ভাবছিল সে। অদ্ভুত মানুষ ছিলেন পূর্ণবাবু। মাস্টারি করতে এসেছিলেন তিনি, আগ্রহ উদ্যম অধ্যবসায়—কোনটাই তাঁর কম ছিল না, তবু তিনি যে মাস্টারিতে বেমানান ছিলেন আজ বিমল সেটা বুঝতে পারে।

ছেলেবেলাকার কথা হ'লেও মনে আছে বৈকি। পূর্ণবাবুর অদ্ভুত কৌতূহল ছিল কলকব্জার প্রতি। পাড়ায় প্রথম যেদিন ছাপাখানার যন্ত্র এল, প্রথম যেদিন তেলের কল বসল—সেদিন ছেলেমানুষের মতই আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে পূর্ণবাবুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। কোন্ 'নাট'টির সঙ্গে কোন্ বল্টু বসল, কোন্ লিভারে কাকে ঠেলা দেবে—এ খুঁটিয়ে না দেখে তার তৃপ্তি ছিল না। তিনি যেন নিঃশ্বাস রোধ করে দেখতেন। কলগুলো চালু হ'লে তবে তার নিঃশ্বাস পড়ত।...

শুধু কি তাই ?

আঁকবার হাতও ছিল পূর্ণবাবুর খুব ভাল। তাই ওদের ড্রয়িং ক্লাসটা তিনি স্বেচ্ছায় নিজে নিতেন। অন্তত বিমলদের সময় পর্যন্ত নিতেন, তারপরের কথা আর

সে জানে না। কিন্তু প্রথম প্রথম দু-একটা গেলাস প্রদীপ ছাতা আঁকানোর পরই তিনি ওদের আঁকতে দিতেন নানা রকমের কলকব্জা। কখনও গোটা কল—কখনও বা তার অংশ। রেলের ইঞ্জিন, তেলের কল থেকে শুরু ক'রে কত কি। মন থেকেই আঁকতেন তিনি, বোর্ডে এঁকে দিয়ে অনেক সময়ে বুঝিয়েও দিতেন কোনটা কি—কি করে কাজ চলে সে সব যন্ত্রের। কোন কোন ছেলে রাগ করত—কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই এগুলো বেশি ভাল লাগত। ড্রয়িং-বুকের একঘেয়ে আঁকা তাদের পছন্দ হ'ত না।

এ নেশা পূর্ণবাবুর নাকি আশৈশব।

পূর্ণবাবুর মুখেই শুনেছে সে। কলেজে পড়ার সময়ে ওঁর মামার বাড়ীর পাশে এক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিল। সে তাদের বাইরের ঘরে বসে নক্সা আঁকত নানা রকম। দেখে দেখে পূর্ণবাবুর আগ্রহ এত অদম্য হয়ে উঠল যে স্বাভাবিক সংকোচ দমন ক'রে একদিন সেধেই এগিয়ে গেলেন তার বাড়ী এবং আলাপ করলেন। দু-চার দিন সময় লেগেছিল ওঁর জিনিসটা বুঝতে। তারপর তিনিই সে ছাত্রটির গুরু হয়ে উঠলেন। ওর ভুল-ত্রুটি তো দেখিয়ে দিতে লাগলেনই, তাকে সাহায্যও করতে লাগলেন। অনেক সময় তার টাস্ক-ড্রয়িং পূর্ণবাবুই এঁকে দিতেন।

সেদিন যে-বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন তা দীর্ঘকাল পরেও মনে ছিল। ওঁর বাড়ীর পাশে বছর কতক আগে যাদবপুর কলেজের একটি মেস হয়েছিল, ক্রমে তা দুটো তিনটে বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ে। বহু ছাত্র থাকত কাছাকাছির মধ্যে। কি ক'রে তাদের ভিতরও পূর্ণবাবুর খ্যাতিটা ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু ছেলে আসত ওঁকে দিয়ে নিজেদের ড্রয়িংগুলো বুঝিয়ে নিতে বা করিয়ে নিতে। কখনও কখনও পূর্ণবাবুই রাত্রে গিয়ে হাজির হতেন ওদের মেসে। ওদের সাহায্য করতেন, বুঝিয়ে দিতেন।

আর একবার, এই বৃদ্ধ বয়সে—বিমল তখন কলেজে পড়ছে—এক ইঞ্জিনীয়ার এসেছিলেন ওদের পাড়ায়। বড় বিলাতি ফার্মে চাকরি করেন, মোটা মাইনে। সেই ফার্ম বুঝি কোন্ একটা বড় পোল মেরামতের কনট্রাক্ট পায়। বিলেত থেকে কনসাল্টিং ইঞ্জিনীয়ার এসে দেখে শুনে প্ল্যান তৈরী ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন। সে প্ল্যানের সবটা এ ভদ্রলোকের মাথায় ঢুকছিল না। কার মুখে যেন খবর পেয়ে

পূর্ণবাবু গিয়েছিলেন একদিন। যথেষ্ট সবিনয়েই প্রার্থনা করেছিলেন প্ল্যানটা দেখবার কিন্তু তবু ভদ্রলোক প্রথমটা চটে লাল হয়ে গিয়েছিলেন। ধৃষ্টতা মনে করেছিলেন ওঁর এই দুঃসাহসকে, প্রশ্ন করেছিলেন সোজাসুজি—'কতদূর লেখাপড়া করেছিলেন?' কিন্তু পূর্ণবাবু দুই হাত জোড় করে বারবার এত বিনীতভাবে নিজের আচরণের জন্য মাপ চেয়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত প্ল্যানটা ওঁকে আফিস থেকে এনে দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ভদ্রলোক।

প্ল্যানটা দেখে পূর্ণবাবুও প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেন নি, আবারও সবিনয়ে নিজের ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে চলে এসেছিলেন, কিন্তু বাড়ীতে এসে দুদিন ধরে দিনরাত ভেবে ভেবে এক সময়ে সবটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তারপর—আর্কিমিডিসের মত বিবস্ত্র অবস্থায় না হোক—তেল মেখে মাথায় জল ঢালবার আগেই ছুটেছিলেন ভদ্রলোকের বাড়ী এবং কি কারণে বুঝবার তাঁর অসুবিধা হয়েছিল সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সে ইঞ্জিনীয়ার অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, অনেকক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি। তারপর বলেছিলেন, 'আপনার ইঞ্জিনীয়ারিং-এ এমন মাথা, আর আপনি কি না গেলেন বাংলা ইস্কুলে গোরু ঠেঙাতে! এই করেই আমাদের দেশে ট্যালেণ্ট নষ্ট হচ্ছে।'

সত্যিই আজ বিমলও তাই ভাবে—কি ট্যালেণ্টটাই না অপচয় করলেন পূর্ণবাবু। ইঞ্জিনীয়ারিং-এ গেলে আজ কতদূর উঠতে পারতেন। ওঁর ঐ ভাগ্নের প্রাসাদে হেলান দেওয়া মাটির ঘরে থাকতে হ'ত না, নিজেই প্রাসাদ তৈরী করতে পারতেন।

শুধু নিজের হৃদয়বৃত্তিকে উৎসর্গ ক'রেই ক্ষান্ত হননি আদর্শের চরণে, নিজের প্রতিভাকেও বলি দিয়েছেন।

'ক্রিমিনাল অফেন্স!' মনে মনে গজরাতে থাকে বিমল। কালকের ব্যথাটা যেন নতুন করে মাথা তোলে আবার।

চমক ভাঙলো বিমলের, পূর্ণিমা এসে তার সীটে ধপাস ক'রে বসে পড়াতে। ওরই পাশের টেবিলে কাজ করে পূর্ণিমা। ঠাণ্ডা স্বভাবের মেয়ে। দেখতে চলনসই

গোছের সুশ্রী। অনেকগুলি পোষ্য বাড়ীতে—তাই ইণ্টারমিডিয়েট পাশ ক'রে বি.এ. পড়তে পড়তেই চাকরীতে ঢুকতে হয়েছে, ক-টা মাস থাকলেই পরীক্ষা দিতে পারত, কিন্তু তাও সম্ভব হয়নি।

পূর্ণিমা কখন উঠে গিয়েছিল তা বিমল টের পায়নি। ফিরে আসাটাও টের পেতনা—যদি না কেমন এক রকমের হতাশ ভঙ্গীতে ধপ্ ক'রে বসে পড়ত। যেন পুঁটলির মত গড়িয়ে পড়ল সে।

'কি ব্যাপার ? হল কি ?' সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন করলে বিমল।

পূর্ণিমা বেচারীর মুখ শুকনো—কাঁদো-কাঁদো কতকটা। তখনই কোন উত্তর দিতে পারল না, চুপ ক'রে টেবিলের দোয়াতদানটার দিকে চেয়ে বসে রইল।

অর্থাৎ কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়।

'ব্যাপার কি আপনার ? আজ আবার বকুনি খেলেন নাকি ?'

ব্যাপারটা অনুমান ক'রে নিয়ে যতদূর সম্ভব কোমল ও অনুচ্চকণ্ঠেই প্রশ্ন করেছিল বিমল, সহানুভূতির সুরে।

কিন্তু সেইটেই হ'ল আরও বিপদ। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিমার চোখের কোণ উপ্‌চে তিন-চার ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। তাড়াতাড়ি হ্যাণ্ড ব্যাগটার মধ্যে থেকে রুমালটা বার ক'রে সবার অলক্ষ্যে মুছে নেবার চেষ্টা করতে করতে গাঢ় কণ্ঠে বললে, 'আজও শশীবাবু যাচ্ছে-তাই করলেন একেবারে ! ছি ছি ! আমার মরে যাওয়াই উচিত !'

একটুখানি চুপ ক'রে রইল বিমল। হৃদয়াবেগের এই সব মুহূর্ত্তগুলোতে সামলে নেবার জন্যে একটু সময় নিতে হয়।

খানিক পরে মুখ চোখ মুছে পূর্ণিমা একটু সুস্থ হয়ে বসতে আগের মতই শান্ত কোমল কণ্ঠে বিমল প্রশ্ন করলো, 'কিন্তু আজ আবার হ'ল কি ?'

কলমটা হাতে তুলে নিয়েছিল পূর্ণিমা। সেটা আর দোয়াতে ডোবানো হ'ল না। সেটা নাড়াচাড়া করতে করতে মাথা হেঁট ক'রে জবাব দিলে সে, 'ঐ যে চক্রবর্ত্তী সাহেবের টি. এ. বিলটা। কুড়ি মাইল পথকে উনি চল্লিশ মাইল ধরে বিল ক'রে দিয়েছেন—ডেলিবারেট জুচ্চুরি। ওঁর কোন দোষ হ'ল না তাতে। কিন্তু যেহেতু আমি সে জুচ্চুরিটা লক্ষ্য করিনি সেহেতু সব দোষ আমার ! কত কথাই বললেন

মিষ্টি মিষ্টি ক'রে—বললেন, "আর ক-টা বছর কোন মতে কাটিয়ে রিটায়ার করতে পারলে বাঁচি। বাপ-দাদারা অনেক কষ্ট ক'রে চাকরি করেছেন বটে কিন্তু মেয়ে কেরানীর পাল্লায় তাঁদের পড়তে হয়নি—এই এক বাঁচোয়া। তাঁরা হ'লে তিন দিনও টিকতে পারতেন না বোধ হয়। কবে যে এই বিপদ থেকে রেহাই পাবো।" আবার বললেন, "ঘর সাজাতে যেমন ফার্নিচার, আফিস সাজাতে তেমনি মেয়েছেলে। ওটা শুধু শোভাবর্ধনের জন্য। দয়া ক'রে এইটি ক'রো যে কাজক রবার কেউ চেষ্টা ক'রো না তোমরা। আমরা বরং উপরি খেটে তোমাদের কাজ ক'রে নেব সেও ভাল।" এক ঘর লোকের সামনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি শোনানোটাই না শোনালেন। রোজ রোজ এমনি ক'রে কেন শোনাবেন উনি!'

আবারও চোখে জল এসে যায় পূর্ণিমার।

কিন্তু বিমলের মুখ কি একটা কারণে যেন কঠিন হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে হ'লেও কেমন একরকম নীরস কণ্ঠে বলে, 'কিন্তু আপনিও যে রোজ রোজ ভুল করেন এটাও ত সত্যি। একটা না একটা ত লেগেই আছে। শশীবাবু তো মিছে ক'রে বকেন না।'

মাথা আরও হেঁট হয়ে যায় পূর্ণিমার, 'সত্যি, কি যে হয় আমার। আজকের ভুলটা সম্বন্ধে সতর্ক হই তো কাল আর একটা ভুল হয়ে বসে থাকে। এত চেষ্টা করি—আপনি তো দেখেছেন—কি সিনসিয়ারলি আমি চেষ্টা করি, কিন্তু তবু কোনমতেই যেন চারদিকে চোখ রেখে কাজ করতে পারি না।'

বিমল আবারও বললে, 'টি এ. বিলের কোন আইটেমকেই আমরা পরীক্ষা না ক'রে মেনে নেব না—এই তো নিয়ম। কোন্‌টা কত দূর মিলিয়ে নেবার ব্যবস্থা ত ছিলই।'

'তা ছিল, কিন্তু চক্রবর্তী সাহেব যে অমন ভেলিবারেটলি মিছে কথা লিখবেন, কুড়ি মাইলকে চল্লিশ মাইল করবেন তা কেমন ক'রে জানব। ঐটুকু গাফিলির জন্যে কিন্তু এতটা কটু কথা বলা কি ওঁর উচিত হয়েছে?'

'বলেছেন বটে, কিন্তু রিপোর্টটা ত করেননি। সেইটেই আপনার সৌভাগ্য ব'লে মেনে নেওয়া উচিত।'

'রিপোর্ট ক-টা মেয়ের নামে উনি করবেন? ওঁর সেকশ্যনের মণিকা, জয়ন্তী,

বেখা—কে ভুল কম করে তাই শুনি ?' এবাব যেন পূর্ণিমা মাথা তোলে একটু-খানি।

বিমলেব ঠোঁটেব কোণে হাসি দেখা দেয়, 'সুতবাং মেয়েদেব যদি উনি ফার্নিচারের মতই শুধু অফিসেব সাজ-পাট ব'লে মনে ক'বে থাকেন ত খুব দোষ দেওয়া যায় কি ?'

'তা যায় না—' পূর্ণিমা কলমটা উল্‌টো ক'বে ধবে স্লিপ প্যাডেব ওপব ঘষে অন্যমনস্কভাবে বলে, 'তবু ভাষাটা বড কানে লাগে, নয কি ? উনি কিন্তু আপনা-দেরও বেহাই দেন না। বলেন, এই ত আজও বললেন, এব চেযে সেকালে যে নন-ম্যাট্রিকবা চাকবি কবতে আসত সে ঢের ভাল ছিল। আজকালকাব গ্র্যাজুয়েট ছোকবাবা জ্বালিযে খেলে একেবাবে। এবা কি ধান দিযে লেখাপডা শেখে না কি—তাও ত বুঝি না !'

'সেটাও উনি মিছে কথা বলেন না ত।' বিমল স্বীকাবই করে, 'প্রথম প্রথম যখন আমাব লেখা নোটগুলো ঢেবা মেবে কেটে দিতেন একেবাবে আদ্যোপান্ত, তখন আমাবও বাগ হ'ত। কিন্তু তাবপব ওঁব নিজেব লেখাব সঙ্গে মিলিযে দেখে বুঝতে পারতুম তফাৎটা।'

'তা বটে।' পূর্ণিমা আস্তে আস্তে বলে, 'আমাব এক জ্যাঠামশাই ছিলেন —এক বড মার্চেণ্ট অফিসে চাকবী কবতেন। সাতচল্লিশ বছব চাকবী কবেছিলেন, মবে তবে ছাডলেন। নইলে সাহেববা ছাডত না কিছুতেই। সাহেববা সুদ্ধ নাকি তাঁকে সমীহ কবত, নতুন পাঁচ হাজাব টাকা মাইনেব ম্যানেজাব এসে কাজ বুঝতে যেত তাঁব কাছে। অথচ ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত বিদ্যে ছিল তাঁব, যা কিছু শিক্ষা ঐ অফিসেই। শেষেব দিকে বি এ., এম. এ কেবানীবা যখন নতুন নতুন চিঠির ড্রাফ্‌ট্‌ ক'বে নিযে যেত সাহেবেব কাছে, সাহেববা নাকি সে ড্রাফ্‌ট্‌ ছিঁডে ফেলে আমাব জ্যাঠামশাইযেব কাছে পাঠিযে দিতেন। একটা আত্মজীবনী গোছেব তিনি লিখতে আবম্ভ কবেছিলেন—শেষ কবা হযে ওঠেনি। সে খাতাটা আজও আছে বাডীতে, সত্যিই—অপূর্ব ইংবেজি। অথচ সবটাই তিনি আযত্ত কবেছিলেন চাকবি কবতে কবতে। আশ্চর্য।'

দুজনেই চুপ ক'বে বইল কিছুক্ষণ।

সহসা এক সময় বিমল প্রশ্ন কবলে, 'ইস্কুলে-কলেজে কেমন ছাত্রী ছিলেন আপনি ?'

'খুব ভাল।' নিমেষে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পূর্ণিমাব, 'ভূগোলে আমি কখনও নব্বুইয়েব নীচে নম্বব পাইনি। ম্যাট্রিকে, আই.এ-তে আমাব বাঙলায় লেটাব ছিল। ম্যাট্রিকে মাত্র দুটি নম্ববেব জন্যে হিস্ট্রিতে লেটাব পাইনি।'

বিমল একটি ছোটখাট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'দুঃখেব বিষয় এখানে তাব কোনটাই কাজে আসবে না। ছাত্র আমিও ভাল ছিলুম মিস বায়, তাতে কি ?'

'তবু —'পূর্ণিমাব কণ্ঠে ঈর্ষাব সুব, 'আপনাব ত এত ভুল হয় না।'

'ওটা অন্যমনস্কতা ও অনবধানতাব ফল। অজ্ঞতাব ভুল নয়।'

বিমল এবাব জোব ক'বে একটা ফাইল টেনে নেয়। সবকাবী সময়েব অনেক অপচয় হয়েছে—আব নয়।

পূর্ণিমা আবও কিছুক্ষণ স্থিব হয়ে বসে থেকে অপাঙ্গে একবাব বিমলেব মুখের দিকে তাকিয়ে কাজে মন দিল। এ মানুষটাব পাশে বসে এত দিন কাজ কবছে তবু যেন আজও এব তল পেলে না পূর্ণিমা। অথচ এমনি তো বেশ ভদ্র, কখনও খাবাপ কথা বা ইঙ্গিত কবে না—সাধ্যমত কাজে সাহায্যও কবে। কে জানে কেন মধ্যে মধ্যে কেমন এক বকমেব কঠিন হয়ে ওঠে ওব গলাব সুব, সেই সময়টা যেন ভয় ভয় কবে পূর্ণিমাব।

৯

ছুটিব পব অফিসেব বিস্তৃত সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে গতিটা কখন যে মন্থব হয়ে এসেছিল বিমলেব তা সে নিজেই টেব পায়নি। এমন কি একসময় যে বেলিংটায় হাত দিয়ে সে চুপ ক'বে দাঁড়িয়েই গেছে তাও বুঝতে পাবেনি। একেবাবে চমক ভাঙ্গল—চমকেই উঠল বীতিমত—পেছন থেকে যখন পূর্ণিমা প্রশ্ন কবল, 'কী, অমন ক'বে দাঁড়িয়ে গেলেন যে ? হ'ল কী আপনাব ?'

এবার বিমল একটু অপ্রতিভ হ'ল। পূর্ণিমার দিকে চেয়ে অপ্রস্তুত ভাবে হেসে বললে, 'না এমনিই। চলুন।'

'আজ বাড়ী যাওয়ার খুব তাড়া নেই বুঝি?' পাশাপাশি নামতে নামতে বললে পূর্ণিমা।

'না। কোনদিনই থাকে না। তবু যাই—অন্যত্র যাবার জায়গা নেই ব'লে।'

'টিউশ্যনী নেই?'

'আছে বৈ কি। ওটা না থাকলে চলবে কেন? কিন্তু সে ত সাতটার আগে নয়।'

পূর্ণিমা একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'চলুন বরং একটু মাঠে গিয়ে বসি। আমারও আজ এখনই ফিরতে ভাল লাগছে না।'

'চলুন।' সংক্ষেপে বললে বিমল। অন্যদিন হ'লে সে বিস্মিত হ'ত একটু। কিন্তু আজ সে সত্যিই অন্যমনস্ক ছিল।

অফিস থেকে বেরিয়ে সহজেই গড়ের মাঠে পড়া যায়। কিন্তু পূর্ণিমা সে পথ পেরিয়ে এগিয়ে চলল।

'ও কি, চললেন কোথায়?' হঠাৎ এক সময়ে খেয়াল হয় বিমলের।

'আগে এক কাপ চা খেয়ে নিলে হ'ত না?' থমকে দাঁড়িয়ে বলে পূর্ণিমা।

'খেতে পারি। যে-যার পয়সা দেব কিন্তু।'

'আমিই না হয় আজকের পয়সাটা দিলাম।'

'না। তাতে আর একদিন আপনাকে খাওয়াবার দায়টা থাকবে। বেশি-spare পয়সা আমার সত্যিই থাকে না মিস্ রায়—বিশ্বাস করুন।' একটু রূঢ় ভাবেই যেন বলে বিমল।

পূর্ণিমার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। সে পথের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তাহ'লে চলুন, মাঠের ঐ কোণটায় পেতলের কলসী ক'রে চা বেচে—ওই কিনে খাওয়া যাক্।'

নিজের রূঢ়তায় বিমল একটু অনুতপ্ত হয়েছে এরই মধ্যে। সে বলে, 'তা মন্দ নয়। আচ্ছা বেশ, আপনি ঐ চা খাওয়ান। আমি একটু চিনেবাদাম কিনি। কী বলেন?'

অনেক খুঁজে একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন অংশে এসে বসে দু'জন। চারিদিকেই

ভীড—এর ভেতর বসতে এমনি যদি বা আপত্তি না থাকে, দুটি তরুণ তরুণীকে মাঠে এসে বসতে দেখলেই সকলে যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে- সেটা মনে করতেই বিশ্রী লাগে বিমলের।

তারপর দুজনেই বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসে বসে চীনাবাদাম খায়।

কী-ই বা বলবার আছে। একঘেয়ে দুঃখের বিবরণ। পারিবারিক ইতিহাসের একান্ত নগ্নতা এত স্বল্প পরিচয়ে অপরের কাছে উদ্‌ঘাটিত করতে মন চায় না। যেটুক বলা যায়, তা বলাও হয়ে গেছে।

'আচ্ছা, একটা ছোটখাটো ব্যবসা করলে কেমন হয়? অল্প মূলধনে যা করা যায় অবশ্য।' হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে পূর্ণিমা।

'কী ব্যবসা অল্প মূলধনে করা যায়? পানের দোকান চলতে পারে বটে। তাও কোন ভাল জায়গায় একটু কোণে বা খাজে দোকান সাজাতে গেলে তার ভাড়া, সেলামী, সাজপাট না পড়বে—অত টাকা আমাদের কারো নেই। তবে হ্যাঁ, রাস্তার পাশে ঐ রকম একটা কাঠের বাক্স পেতে বসতে পারেন। দেখুন—পারবেন? খদ্দেরের অভাব হবে না। তবে বেশিদিন ব্যবসা করতে যে দেবে আপনাকে তাও মনে হয় না।'

এ ধরণের ইঙ্গিত কখনও বিমলের কথাবার্তায় থাকে না। তবে আজ মনে হয় তীব্র বিদ্রূপই করতে চায় সে। তাই ক্ষমা করে পূর্ণিমা মনে মনে।

পূর্ণিমা রাঙা হয়ে ওঠে আবারও।

'ধ্যেৎ, আমি কি তাই বলছি।'

বিমল একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলে, 'আমাদের দোষ কী জানেন, ব্যবসার কথা যখনই ভাবি তখনই আমরা মনে করি যে শুধু মূলধনের জন্যেই সব আটকে আছে।'

'কিন্তু তাই কি ঠিক নয়?'

'না। কে বলেছে আপনাকে? ট্রেনিং কৈ? আপনারা কি মনে করেন যে সব প্রোফেসনেই ট্রেনিং দরকার আছে—নেই কেবল ব্যবসাতে? ডাক্তার হ'তে গেলে ডাক্তারী পড়তে হয় ছ-বছর। উকীল হ'লেও তিন বছর—তাছাড়া আর্টিকেলড্ থাকার ব্যবস্থা আছে। মাস্টারী করতে গেলে বি-টি পড়তে হয়। কেবল

ব্যবসা করাটাই খুব সোজা? শুধু মূলধন থাকলেই হ'ল, না? আপনি জানেন না বোধ হয়—আমি নিজে দেখেছি প্রচণ্ড বড়লোকের ছেলে ব্যবসা করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। শুধু ব্যবসা। একটি ভদ্রলোককে ত জানি—তিনি পান সিগারেট পর্যন্ত খান না। কোন বিলাস নেই। পর পর চার-পাঁচটি ব্যবসা ক'রে আজ পথের ভিখিরী।'

'কিন্তু ব্যবসার ট্রেনিংটা কী ক'রে নেওয়া যায় বলতে পারেন? ওর ত স্কুল-কলেজ নেই।'

'আর্টিকেল্‌ড্ থাকার ব্যবস্থা হ'তে পারে। অন্য উপায় আছে। তবে একটা গল্প শুনুন। আমাকে গল্পটা বলেছিলেন পাড়ার সুরেশবাবু। হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, বড়বাজার অঞ্চলে কোথায় যেন বসেন—বিরাট সংসার ডাক্তারিতে চলে না, তাই কিছু কিছু টিউশ্যনীও করেন। অর্থাৎ করতেন, এখন শুনেছি ভাল পসার হয়েছে। সুরেশবাবু এক ক্রোড়পতি মাড়োয়ারীর ছেলেকে পড়াতেন। ইস্কুলের পড়া নয়—হুকুম ছিল শুধু ইংরেজী আর অঙ্ক, তাও বীজগণিত জ্যামিতি নয়—শুধু পাটিগণিত! বছর দুই পড়িয়েছিলেন, তারপর অন্য ভাল টিউশ্যনী পেয়ে সেটা ছেড়ে দেন। তারও বছর-খানেক পরে একদিন ট্রামে দেখেন সেই ছেলেটি কান-খুস্‌কী দাঁত-খোঁটা আর জিভছোলা বিক্রী করছে। পয়সা পয়সা। ভারি দুঃখ হ'ল সুরেশবাবুর। বুঝলেন যে কোন বড় গোছের স্পেকুলেশ্যনে বা শেয়ার মার্কেটে সর্বস্বান্ত হয়েছেন ভদ্রলোক। তাই তার ছেলেকে আজ এই সামান্য কাজ করতে হচ্ছে। সাধারণ একটা দোকান দেওয়ার মতও পুঁজি নেই। একদিন সময় ক'রে সুরেশবাবু খবর নিতে গেলেন। হাজার হোক এককালে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল, পয়সা-কড়িও অনেক দিয়েছে। একটু সহানুভূতি দেখানো দরকার—অথবা ওর ক্ষমতার ভেতর যদি কোন সাহায্য করবার থাকে, তাও করতে তিনি প্রস্তুত। কিন্তু পূর্বের ঠিকানায় পৌঁছে দেখেন, তেমনি বড় বাড়ী, দোরে তেমনি দুখানা দামী গাড়ী, চাকর, দারোয়ান—কিছুরই অভাব নেই। ভেতরে গিয়ে দেখেন দুটো টেলিফোন ঠিক আছে, গদীতে তেমনি কর্মব্যস্ততা। কী ব্যাপার? সুরেশবাবু ত বেকুফ্। ভূতপূর্ব মনিব অবশ্য ওঁকে দেখে খুব খুশী হলেন। আদর ও অভ্যর্থনার-ত্রুটি হ'ল না। একথা ওকথার পর সুরেশবাবু তাঁর ছাত্রর খবর করলেন।

ছাত্রের বাপ বললে, ও, তাকে ত ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিয়েছি। তখন সুরেশবাবু আসল কথাটা বলেই ফেললেন, সেদিন ট্রামে দেখলুম ঠিক তার মত কে জিভ্‌ছোলা ফিরি করছে। ভদ্রলোক খুব সহজভাবেই বললেন, হ্যাঁ, তাকেই দেখেছেন। সুরেশবাবু আরও অবাক্, তার মানে? ওর বাবাও যেন বিস্মিত হলেন, তার মানে কি, ব্যবসা শিখবে না? হাতে কলমে কাজ করুক, পয়সার মর্ম বুঝুক, নইলে এতবড় গদী আমার—ও চালাবে কি ক'রে? সব উড়িয়ে দেবে যে। তখন জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হ'ল সুরেশবাবুর।'

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে বিমল থামল। পূর্ণিমা বললে, 'আশ্চর্য ত।'

'এমনি না হওয়াটাই আশ্চর্য মিস্ রায়। আমেরিকাতে শুনেছি ক্রোরপতি কারখানার মালিকের ছেলে সাধারণ শ্রমিক হিসেবে জীবন শুরু করে। আমার জানাশোনা এক বড় প্রেসের মালিক আমার কাছে গল্প করেছেন যে তিনি কম্পোজিটার হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন। চোখ খোলা রেখে প্রাণপণে শিখতে চেষ্টা করেছেন সব কাজ—কোথায় কোথায় ফাঁকি দেয় কর্মচারীরা, তাও শিখেছেন—তাই আজ তার প্রেসের এত উন্নতি। ছোট প্রেস থেকে খুব তাড়াতাড়িই বড় প্রেস করতে পেরেছেন।'

'সকলকেই কি এইভাবে জীবন শুরু করতে হবে?'

'ক্ষতি কি?'

'সুযোগ-সুবিধা কোথায়?'

বিমল বলে, 'ধরুন আপনি মুদির দোকান করবেন। কোন মুদীর দোকানে চাকরী নিতে পারেন না? খুব কম মাইনেতে যদি কাজ করতে চান ত কাজের অভাব হবে কি? না হয় বিনা মাইনেতেই করলেন ছ মাস।'

'তাতে কী এমন লাভ হবে?'

'আর কিছু না হয়—কর্মচারীরা কীভাবে চুরি করে সেটাও ত শিখবেন। ভবিষ্যতে সতর্ক হবার সুবিধা হবে। আমাদের পাড়ায় মুদীর দোকানে যে চাকরী করত সে-ই চার-পাঁচটা সোনার আংটি গড়িয়ে ফেলত। একজন এক বছর চাকরী ক'রেই সাইকেল কিনে ফেললে। মাইনে ত পেত বারো টাকা আর খোরাকী। ফলে দোকানটি উঠে গেল। অথচ খদ্দেরের তার অভাব ছিল না।'

অন্ধকার ঘনিয়ে আসে মাঠে। আকাশে তারা ফোটে একটার পর একটা। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে পূর্ণিমা। তারপর বলে, 'আপনি সব তাইতে বড় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেন।'

বিমল ঈষৎ অনুশোচনার সুরেই বলে, 'তা বটে। ওটা দেখছি স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। লোককে ভেংচাতে ভেংচাতে মুখটাই বেঁকে গেছে আর কি! কিন্তু আপনার প্রস্তাবটা কি, কী ধরণের ব্যবসা করতে চান আপনি?'

'ধরুন যদি একটা রেস্তোরাঁ খুলি? আমি অনেক রকম খাবার করতে পারি —তা জানেন? খদ্দের হবে না?'

'খদ্দের হয়ত হবে—হয়ত একটু বেশিই হবে—এ দেশে ওটা নতুন ত। কিন্তু লাভ হবে না মিস্ রায়। অনেক রকম ফন্দি-ফিকিরে হোটেল'ওলারা লাভ করে, আপনি তার কিছুই জানেন না। তাছাড়া সে আপনি পারবেনও না। সে শিক্ষা বা আবহাওয়া আলাদা।'

'যত লোক রেস্তোরাঁ করে—সকলেই কি ফন্দি-ফিকির জানে?'

'যত লোক রেস্তোরাঁ করে—সকলেই কি লাভবান হয়? ক-টা বদিন টেঁকে তা লক্ষ্য করেছেন? একটু নজর রাখলেই দেখবেন বার বার হাত-বদল হচ্ছে।'

'তা বটে। আমাদের ভবশরণবাবুর গ্যারেজ ঘরটায় কত বার যে চায়ের দোকান হ'ল। কোনটাই বেশিদিন টেঁকে না।' পূর্ণিমাও স্বীকার করে।

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'আপনি ত এত জানেন শোনেন— আপনি কেন চেষ্টা করলেন না। আপনার যা বুদ্ধি, আপনি দু' দিনেই ফন্দি ফিকির আয়ত্ত ক'রে নিতে পারতেন।'

'আমার সে অবস্থা নয় মিস রায়, এক্সপেরিমেন্ট করার বা রিস্ক নেওয়ার মত সাহস আসবে কোথা থেকে? একদিনও টাকা না আনলে চলবে না। তা ছাড়া রেস্তোরাঁ করতে গেলে যে-কটা টাকা লাগে তাও ত আমার নেই।'

'ধরুন যদি আমি দিই?'

'না, সে ঝুঁকি আমি নিতে পারব না। ধন্যবাদ! চাকরী ছেড়ে ব্যবসা ধরব— সংসার চালাবে কে? সে দায়িত্ব কে নেবে, যদি না টেঁকে? মাইনে পেতে চার-পাঁচ দিন দেরী হ'লেই ঘরে হাঁড়ি চড়া বন্ধ হয়। আমার যে কোথাও কেউ নেই।'

আবারও স্তব্ধতা নেমে আসে। দু'জনে বসে থাকে স্থিব হযে।

কত কী ভাবে হযত দুজনেই।

এক সময দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিমল বলে, 'এবাব উঠতে হবে মিস্ বায, আমাব টিউশ্যনীব সময হ'ল।'

'চলুন' ব'লে উঠে দাঁডিযে পূর্ণিমা একটু হেসে যেন অপ্রতিভ-স্বরে বলে, 'বাব বাব মিস্ বায বলে ডাকেন কেন বলুন ত? বিশ্রী শোনায কানে। আমাব নাম ধ'বে ডাকতে আপত্তি কি? আপনি আমাব চেযে বযসে বডই হবেন সম্ভবত। তা যদি না-ও হয, অফিসেব সহকর্মিণী ত -কজনেব মতই, নাম ধবে ডাকলেই পাবেন। পুরুষ সহকর্মীদেব ত নাম ধবেন।'

বিমল শান্ত অথচ কঠিন কণ্ঠে উত্তব দেয, 'এমন কি অফিসেব সহকর্মিণীদেব সঙ্গেও অন্তবঙ্গতা কববাব মত অবস্থা আমাব নয—the sooner you understand, the better!'

সে হাঁটিতে শুরু করেছে ততক্ষণ। পূর্ণিমাও নিঃশব্দে তাব পিছন পিছন হাঁটতে লাগল। বিমল একবাবও ফিবে তাব দিকে তাকাল না—ফলে ওব স্পষ্ট-ভাষণেব ভেতবকাব রূঢ় ইঙ্গিতে যে পূর্ণিমাব চোখে জল এসে গিযেছে, তাও সে লক্ষ্য কবতে পাবলে না।

১০

বিমলেব ছাত্র নিখিল ক্লাস এইট্-এ পডে। ছোটখাটো একটুক ছেলে। বযসেও কম—বছব-বাবো হবে বড জোব!

প্রথম যেদিন বিমল যায নিখিলকে পডাতে—সে প্রায মাস-আষ্টেকেব কথা হ'ল, নিখিল তখন ক্লাস-সেভেনেব মাঝামাঝি পৌঁচেছে—ওব বাবা দুঃখ ক'বে বলেছিলেন, 'দেখুন না মাষ্টাব মশাই, ছেলেটাব কী মাথা ছিল আব কী হযে গেল। ওব যখন তিন বছব বযস তখনই আমাব বাবাব মুখে শুনে শুনে সমস্ত মোহমুদ্গাব মুখস্থ ছিল। বাবা ওকে বড বড সব সংস্কৃত কাব্যেব সর্গ মুখস্থ

করিয়েছিলেন। আধো-আধো গলায় কী মিষ্টি যে লাগত ওর মুখে সেই আবৃত্তি, কী বল্‌ব। তাই শুনে আমি আবার রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে শোনাতে লাগলুম—দুবার শুনলেই জলবৎ। দেবতার গ্রাস ছাঁকা মুখস্থ ব'লে যেত—একবারও না থেমে। চার বছর বয়সে ওর দ্বিতীয় ভাগ, ফার্স্ট বুক শেষ হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম ইস্কুলেও বেশ ভাল রেজাল্ট্ করেছিল, তারপর কী যে হ'ল—এই ক্লাস সেভেন-এ উঠে একেবারে যেন গবেট হয়ে গেল। কিচ্ছু মনে থাকে না, ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে—মাথাতেও ঢোকে না কিছু। সেই জন্যেই আপনার শরনাপন্ন হয়েছি। আমার বন্ধু দেবেনবাবু বললেন যে আপনি যাকেই পড়ান খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে পড়ান, অন্য মাস্টার মশাইদের মত না—দেখুন, কী করতে পারেন। আমি ত খুব দুর্ভাবনায় পড়েছি।'

বিমল একটু হেসে জবাব দিয়েছিল, 'আপনাদেরই কৃতকর্মের ফল, এখন আর দুর্ভাবনায় লাভ কি বলুন।'

ভদ্রলোক একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলেন। বিমলের হাসির মধ্যে যে তিক্ততা ছিল তা তাঁর নজর এড়ায়নি। প্রথম যে চাকরী করতে এসেছে তার পক্ষে এ হাসি সহজও নয়—স্বাভাবিকও নয়। তিনি একটু হতচকিত ভাবেই প্রশ্ন করছিলেন, 'তার মানে? আমরা কী দোষ করলুম?'

'না—আপনারা কেন দোষ করবেন। যত দোষ ঐটুকু ছেলের। তিন বছরের ছেলেকে দিয়ে লম্বা লম্বা সংস্কৃত কবিতা যখন মুখস্থ করিয়ে পাঁচজনের কাছে এক্‌জিবিট্ ক'রে পুত্রগর্বে স্ফীত হতেন তখন কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে ছেলের কী সর্বনাশ করছেন। একে ত খুব সবল ছিল না— তা এখনকার চেহারা দেখেই বোঝা যায়- ওর সেই তিন বছর বয়সে কী এমন মস্তিষ্ক ডেভলপ করেছিল বলুন ত। ওর সেই অপরিণত অপরিপক্ক মাথাকে এমন ভাবে ট্যাক্স করার কী কারণ ছিল? আপনাদের একটু ভ্যানিটি চরিতার্থ করা ছাড়া। চার বছর বয়সে দ্বিতীয় ভাগ, ফার্স্ট বুক শেষ করবার কথা কি ওর? আমাদের প্রথা আছে পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি দেবার—অর্থাৎ পাঠ শুরু করবার। যাঁরা এ প্রথার প্রচলন করেছিলেন তাঁরা কি এতই নির্বোধ ছিলেন? লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি—চাণক্যের এ কথাটাও কি ফেলে দেবার মত?'

নিখিলের বাবা সত্যশরণবাবু বলেছিলেন, 'কিন্তু মশাই আমিও ত শুনেছি ঐ সাড়ে তিন বছর বয়সে পড়া শুরু করেছিলুম, চোদ্দ বছর বয়সে পাস করেছি। স্কলারশিপও ত ছিল একটা ছোটখাটো।'

বিমল সবিনয়ে হ'লেও বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই উত্তর দিয়েছিল, 'আপনি কি অমনি অপুষ্ট ছিলেন? ভেবে দেখুন ত। এই সন্তানটির আপনার পুষ্টির কত অভাব তা কি লক্ষ্য করেন নি? ওর ওপর পড়ার চাপ না দিয়ে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে রেখে ভাল খাইয়ে দিন-কতক খেলে বেড়াতে দিলে ওর প্রতি আপনার কর্তব্য পালন করা হ'ত। তা ছাড়া, আপনি যখন পাস করেছিলেন তখন কি এতগুলো ভারি ভারি বই পড়তে হ'ত আপনাকে, এতগুলো সাবজেক্ট ছিল? মনে ক'রে দেখুন দিকি। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত আর অঙ্ক। দু'টা বিষয় অপশ্যনাল নিতে হ'ত—তাও ত আপনারা অঙ্ক আর সংস্কৃত নিয়ে সেরে দিতেন। ঠিক কি না বলুন?'

সত্যশরণবাবুকে অপ্রতিভ ভাবে হেসে স্বীকার করতে হয়েছিল, 'ঠিক। আমারও ঐ অপশ্যনাল ছিল--অঙ্ক আর সংস্কৃত।'

'তবে? এদের কতগুলো বিষয় দেখুন ত। ইতিহাস ভূগোল ত আছেই—আরও দিয়েছেন তার সঙ্গে বিজ্ঞান। বাংলায় দুটো পেপার—সব মিলিয়ে কত নম্বর হোচ্ছ তার হিসেব দেখেছেন? ক্লাস সেভেনে হাপিয়ে যাবারই ত কথা—ম্যাট্রিকের সব বইগুলো ঐটুকু ছেলের ঘাড়ে এখন থেকে চাপিয়ে দিলেন। মোটা মোটা ভারি ভারি বই—ম্যাট্রিকের ছেলেদের জন্য লেখা—দেওয়া হ'ল একটা এগারো বছরের ছেলেকে। যে কোন একখানা বই তার হাতে ক'রে তোলাই শক্ত-পড়া ত দূরের কথা। চার বছর ধরে পড়ানোর অছিলায় ঐ ভারি বইগুলো পড়তে দেওয়া হয় এখন থেকে। ওতে ছাপাই আছে নাইন-টেনের জন্য কিন্তু ঈশ্বর জানেন—ওর যা ভাষা আর লেখার ধরণ—কোন্ ক্লাসের ছেলেদের উপযুক্ত ওগুলো। বাংলা ব্যাকরণ-খানা খুলেছেন কখনও? ঐ ব্যাকরণ পড়ে যদি আপনাদের পরীক্ষা দিতে হ'ত, তা হ'লে ফার্স্ট ডিভিশন পেতেন কিনা সন্দেহ। আমার ইচ্ছে করে এক-একবার—ছেলেদের বার ক'রে এনে পরীক্ষার হলে মাস্টার মশাইদেরই বসিয়ে দিই। দেখি তাঁরা কেমন পরীক্ষা দেন।'

'তাই ত! ভাবিয়ে দিলেন যে। কী করব এখন?' সত্যশরণবাবু প্রশ্ন করেছিলেন।

'কী আর করবেন। Reap as you sow! আমি আমার যথাসাধ্য করব। তবে খুব ভাল ফল আশা করবেন না। আপনার ক্ষমতা যদি থাকে ত আমি পরামর্শ দেব গরমের ছুটি আর পূজোর ছুটি দুটোতেই বাইরে কোথাও নিয়ে গিয়ে খেলে বেড়াতে দেবেন এবং পড়ার বই সঙ্গে নিয়ে যাবেন না।'

'তাতে সব ভুলে যাবে যে।'

'যাক। সে ঝালিয়ে নেওয়া যাবে।'

'দেখি। দুটোয় পারব না—একটা ছুটি হয়ত—। তাইত, আপনি—। এমন ভাবে কখনও ভেবে দেখিনি। হয়ত আপনার থিয়োরীই ঠিক। কে জানে।'

সত্যশরণ বাবু চিন্তিত মুখে বলেছিলেন।

আজ ওদের বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এই কথাটাই মনে পড়ল বিমলের। হাসি পেল একটু। তখনও পড়াশুনোর ওপর কিছু আস্থা ছিল ওর। মানে এই ধরণের পড়াশুনোর ওপর। আজ—আজ তাও নেই। আজ বোধ হয় কিছুর ওপরই আস্থা নেই।

পড়ার ঘরে নিখিল বই খাতা সাজিয়েই অপেক্ষা করছিল। চাড় আছে ছেলেটার—একটু বেশী রকমই চাড়। ক্ষমতা নেই তেমন। পড়ে অনেকক্ষণ, ক্লান্তি নেই যেন—কিন্তু কিছুই মনে থাকে না। মাথাতে ঢোকে না কিছু। ওর সেই অসহায় দৃষ্টি, ফ্যাল ফ্যাল চাউনির দিকে চেয়ে মায়া হয় বিমলের। রাগ যে হয়না তা নয়—তবে রাগ প্রকাশ পেলেই নিখিলের চোখ দুটো যেন আরও করুণ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মমতায় বুক ভরে যায় বিমলের, কাছে টেনে নিয়ে আদর করে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

অবোধ জীব যেন– তাইতেই খুশী ধরে না ওর। কৃতজ্ঞতায় চোখ স্তিমিত হয়ে আসে।

বিশ্বাস না থাক্—চেষ্টার ত্রুটি করেনি বিমল এটা ঠিক। ফলও কিছু কিছু

হয়েছে। ক্লাস সেভেনের অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় কোনটাতেই সে পাস করতে পারেনি—বার্ষিক পরীক্ষায় সব কটাতেই কোন মতে পাস-মার্ক রেখেছে। ক্লাসে উঠেছে সসম্মানে। সত্যশরণবাবু তাইতেই সন্তুষ্ট। নিজে থেকে স্বেচ্ছায় দশটি টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। শুধু বিমল মনে মনে কুণ্ঠিত হয়—সে জানে এ উন্নতির কী অর্থ। কতটা অন্তঃসারশূন্য এটা।

হঠাৎ বিমলের খেয়াল হয়, সে চুপ ক'রে বসে আছে।

'কৈ নিখিল, পড়ছ না?' সে ধমকই দেয় একটু।

নিখিল অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'এই যে—এইটে স্যার -কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

'তা কৈ, বলোনি ত এতক্ষণ।'

'বলছিলুম স্যার।' কুণ্ঠিতভাবে যেন অপরাধ তারই এমনিভাবে নিখিল বলে, 'আপনি যে কী ভাবছিলেন। তাই আর—'

জোর করে পড়াতে ব'সে বিমল।

'কৈ—ব্যাকরণের টাস্কগুলো করেছ?'

'এই যে—' খাতা বার ক'রে দেয় নিখিল।

'কিচ্ছু হয়নি। এটা কি করেছ? দ্যাখো। এত ক'রে সেদিন বুঝিয়ে দিলুম অপিনিহিতি—সেইটেই ভুল ক'রে বসে আছ।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার অপিনিহিতি বোঝাতে শুরু করে।

এ সরস্বতীরও অসাধ্য বোধ হয়। এমন ক'রে ঠেলে ঠেলে আর কতদিন চলবে? খরস্রোতের উজানে এমন ভাবে নৌকো বাওয়া।

তবু। পয়সা নিয়েছে যখন, নিতেও হবে—তখন আর এসব চিন্তা অবান্তর।

'স্যার একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'করো।' এই স্যারটা বড়ই শ্রুতিকটু লাগে ওর। বহুবার বলেছে দাদা বলতে কিন্তু নিখিল পারে না। বলে, 'সে আমার বড় লজ্জা করে। ভারি বিশ্রী।'

'বলো—কী বলবে?' একটু অসহিষ্ণু ভাবেই আবার বলে বিমল।

'আপনি ত বলেন, আগে এই বাংলা ব্যাকরণের বই পড়তে হ'ত না।'

'হ'ত—তবে এত নয়। সে সামান্যই ছিল

'যাঁরা এই সব লিখেছেন—তাঁরা এত জানলেন কী ক'রে। তাঁরা ত এ-রকম বই পাননি!'

'তাঁরা পণ্ডিত লোক। তাঁদের পক্ষে এটা জানা সহজ। তাঁরা কি তোমার মত গবেট।'

'না—তা বলছি না।' ঘাড় হেঁট ক'রে টেবিলে পেন্সিলের দাগ কাটে নিখিল, 'বলছিলুম যে এত ব্যাকরণ না পড়লে কি হয়?'

'কী আবার হয়—ভাষাটা শেখা যায় না ভাল করে। বাঙ্গালীর ছেলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ জানো না—এটা কি খুব গৌরবের কথা?'

লজ্জায় সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে যায় নিখিল। তার মুখে অনেকক্ষণ কথা ফোটে না। শেষে চরম সাহসে ভর ক'রে বলে, 'না স্যার, আমার এক দাদা বলছিলেন কি না, তাই।'

'কী বলছিলেন দাদা?'

'বলছিলেন যে আগে যারা বাংলা ব্যাকরণ পড়েননি তারা কি বাংলা ভাষা শেখেননি? বঙ্কিমবাবু, রবীন্দ্রনাথ । যে সব নাম-করা অধ্যাপক আছেন বাংলার তাঁরাও ত বাংলা ব্যাকরণ পড়েননি। যারা এই সব মোটা মোটা বই লিখেছেন তাঁরাও ত পড়তে পাননি তখন।'

'হ্যাঁ। তা পাননি। সেইজন্যই অনেক কষ্ট ক'রে শিখতে হয়েছে। তোমরা ত তৈরী বই পাচ্ছ। আর বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কথা আলাদা। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণ এত ভাল জানতেন যে তাতেই কাজ চলে যেত। তাঁরাই ত বলতে গেলে ভাষা তৈরী ক'রে গেলেন। তাঁদেরই কল্যাণে বাংলা ভাষা আজ এমন জায়গায় এসেছে যে এখন আর তার নিজস্ব ভাল ব্যাকরণ না হ'লে চলে না।'

তারপরই ধমক দেয় বিমল। 'এই সব পাকা পাকা কথা কে কী বলেছে তা ত বেশ মনে রেখেছ। অথচ পড়া ত একলাইনও মনে থাকে না। পড়ো এখন।'

নিখিলের হেঁট-হওয়া মাথাটা আরও হেঁট হয়ে যায়। ভয়ে ও অনুতাপে তার ছোট মুখখানি যেন বেশী ছোট দেখায়।

তাকে ধমক দেয় বটে কিন্তু বিমল মনে মনে জোর পায় না। বরং অনুতপ্ত হয়। ছাত্ররা খোলাখুলি আলোচনা করবে, সেইটেই ত বাঞ্ছনীয়। একেই ত

নিখিল একটু বেশী ভীতু স্বভাবের। তার ওপর এমন ধমক দিলে যে একেবারেই সব প্রশ্নকে কুলুপ এঁটে বন্ধ ক'রে রাখবে। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে ঈষৎ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, 'আর কি বলেছেন তোমার দাদা?'

নিখিল চকিতে একবার ভয়ার্ত একটা দৃষ্টি মেলে তাকায় ওর দিকে। পরক্ষণেই আবার মাথা নত ক'রে বলে, 'না, স্যার, সে আপনি শুনলে রাগ করবেন।'

'না, না—রাগ করবো না। তুমি বলো। সন্দেহটা দূর হয়ে যাওয়াই ভাল নয় কি?' উৎসাহ দেবার সুরে বলে বিমল।

'দাদা বলছিলেন যে, এই ব্যাকরণ তোদের কোনই কাজে লাগবে না। করবি ত চাকরী। আজও ইংরেজীতেই অফিসের কাজ চালাতে হয়। দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে কিন্তু তবু ইংরেজী আমরা ছাড়িনি—ছাড়লেও ধরতে হবে হিন্দী। বাংলা ব্যাকরণ কী কাজে আসবে। পরীক্ষাতেও ত পচিশটা নম্বর। তার জন্যে ঐ অতবড় মোটা বই? বই যারা লিখেছেন তাদের সঙ্গে সিলেবাস যারা করেছেন তাঁদের যোগাযোগ আছে নিশ্চয়। এ শুধু বই বিক্রী হওয়ার ফন্দী। পঁচিশ নম্বরের জন্যে একশ পাতার বই-ই যথেষ্ট। চলতি ভাষায় আমরা যে ভাবে কথা বলি, তারই একশ গণ্ডা ধরণকে একটা ক'রে নামের লেবেল এঁটে মুখস্থ করিয়ে লাভ কি?'

ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে কথাগুলো ব'লেই ফেলে নিখিল।

ধমক দিতে গিয়ে সামলে নেয় বিমল। আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বলার ভঙ্গীতেই বলে, 'চাকরী করাই ত শুধু লেখাপড়ার উদ্দেশ্য নয়। তোমার মাতৃভাষা সম্বন্ধে একটু জ্ঞান যদি না থাকে ত তোমার মনের গঠনটাই যে অসম্পূর্ণ রইল। বিশ্বসংসারে দাঁড়াবে কিসের জোরে—কী ক'রে পরিচয় দেবে নিজেকে বাঙ্গালী বলে? ইংরেজরা কি ইংরিজী ব্যাকরণ পড়ে না? না—নিখিল ওটা পড়তেই হবে।'

বলে কিন্তু মনে মনে জোর পায় না বিমল। সত্যিই কি দরকার খুব? যেটুকু নিতান্ত দরকার সেটুক কি একশ' পৃষ্ঠার একটা বইতে দেওয়া যায় না? খুব কি ক্ষতি হয় এই 'অপিনিহিতি'র বিবরণ না পড়লে? এতে ক'রে কি সত্যিই খুব ভাষা শিখছে ছেলেরা? কে জানে! ভাষা শিখুক বা না শিখুক—ভাষার যা উজ্জ্বলতম নিদর্শন—সেই সাহিত্য থেকে যে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে এটা ঠিক। আগে অনেক

বেশী সাহিত্যের খবর রাখত ছেলেরা। এখন অবসর কোথায় ? না ইংরেজী না বাংলা —সাহিত্যের বই পড়ে ক-টা ছেলে ? খেলাধুলো, সিনেমা—অবসর বিনোদনের এই ত দুটো বড় পথ খোলাই আছে, যারা ভাল ছেলে তারা পড়ার বইতে ডুবে আছে ; যারা তা নয়—হয় রেডিও খুলে তিন হাজার মাইল দূরের ক্রিকেট খেলায় কান পেতে আছে, নয়ত খবরের কাগজের শেষের দিক থেকে খুলে পড়ছে (অর্থাৎ খেলার পাতা) নয়ত সিনেমার চতুর্থ শ্রেণীর টিকিট ঘরে গিয়ে 'কিউ' দিচ্ছে রৌদ্র-বৃষ্টি উপেক্ষা করে। সাহিত্য—না, সাহিত্য থেকে তারা বহুদূরে সরে আছে।

সাহিত্যের কথা বাদ দিলেও ভাষাই কি খুব বেশী শিক্ষা হচ্ছে ? এই সব মোটা মোটা ব্যাকরণের বইয়ের চলন হবার পর এই বই পড়ে যারা শিক্ষিত হয়েছে, সাময়িক পত্র খুললে সেই সব তরুণ সাহিত্যিকদের লেখা দেখলে কান্না আসে বিমলের। শব্দের মৌলিক অর্থের সঙ্গে পর্যন্ত এদের পরিচয় নেই। সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে শব্দের প্রয়োগ ক'রে ভাষার তলোয়ার খেলা দেখিয়ে গর্বে নেচে বেড়ায় এরা। এদের কথাই বা কি ? বাংলার সর্বাগ্রগণ্য অধ্যাপকই ত আকর্ষক অর্থে আকর্ষণীয় শব্দ ব্যবহার করেন খবরের কাগজের দেখা-দেখি।

পড়ানো প্রায় অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়ে বিমল। নিখিল একটু বিস্মিত হয় কিন্তু কিছু বলে না। ওর সঙ্গে নিচে নেমে এসে একবারে দোরের কাছাকাছি পৌছে কোনমতে প্রশ্ন করে ফেলে সে—'আপনার শরীরটা আজ ভাল নেই। না স্যার ?'

'কেন বলো ত ! সকাল ক'রে উঠলুম তাই ?'

'না স্যার। তা বলছি না। মুখটা কেমন শুকনো শুকনো। গোড়া থেকেই আপনাকে যেন কী রকম দেখাচ্ছে। তাই বলছি। জ্বর হয়নি ত ?'

বিমল ওর মাথাটা ধরে নেড়ে দিয়ে একটু সস্নেহ হেসে বললে, 'এই ত বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি। ঠিকই ধরেছ। জ্বর হয়নি, তবে শরীরটা খুব ভালোও নেই। বড্ড ক্লান্ত লাগছে।'

আজ যা মানসিক অবস্থা তাতে পড়ানোর চেষ্টা করাই অন্যায় হয়েছে তার।

কেবল নানা বিক্ষিপ্ত চিন্তা এসে অন্যমনস্ক ক'রে দিচ্ছে, বার বার অপ্রস্তুত হ'তে হচ্ছে ছাত্রের কাছে। তার চেয়ে ও-চেষ্টা না করাই ভাল।

একেই গত দু'দিনে তার মনের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে গেছে, তার ওপর আজ পূর্ণিমার সঙ্গে আলোচনাটা যেন আরও আলোড়নের সৃষ্টি করেছে তার মস্তিষ্কে। চিন্তাগুলো এলোমেলো ছুটোছুটি শুরু করেছে, কিছুতেই তাদের সংযত ক'রে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।...

নিখিলদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে ঘড়ি দেখলে আটটা।

এখন বাড়ী যেতেও ইচ্ছা করে না। গেলেও সাত শ' জবাবদিহিতে পড়তে হবে—কেন এত সকাল সকাল, শরীর খারাপ করেছে কি না—নানান্ প্রশ্ন। সে আরও বিরক্তিকর।

বিমল খুব জোরে হেঁটে গিয়ে একটা পার্কের এক কোণে ঘাসের ওপর বসে পড়ল। শুয়ে পড়তেই ইচ্ছা করছিল কিন্তু জামাটা নষ্ট করতে সাহস হ'ল না।

বেশ ছেলেটি এই নিখিল। এর উন্নতি হ'লে মনে মনে খুশী হবে সে। কিন্তু হবে কি?

বড় মায়া হয় বেচারীর ওপর। মুখের ভাবটাই যেন বেচারী-বেচারী।

এমনি আরও একখানা মুখ মনে প'ড়ে যায় ওর।

বার-বারই মনে পড়ে।

ঠিক নিখিলের মত অতটুকু না হ'লেও—অমনি মাজা শ্যামবর্ণ, অমনি শঙ্কিত ভীত অবোধ দৃষ্টি। বকলে ঠিক ঐ রকমই ম্লান হয়ে উঠত নিমেষে। তারও পড়বার আগ্রহ ছিল অসাধারণ কিন্তু কিছুতেই মাথায় ঢুক্‌ত না।

সে মুখ আলপনার—আপুর।

ওরা আগে যেখানে থাকত—পূর্ণ মাষ্টারমশাইদের পাড়ায়—ওদেরই বাড়ীর একাংশে থাকত আপুরা। রেলে কাজ করতেন আপুর বাবা, কিন্তু কোয়ার্টার পান্ নি। রেলের কোট ছাড়া দ্বিতীয় জামা ছিল না ভদ্রলোকের, স্টেশন কুড়িয়ে বাজার আনতেন ব'লে দু'বেলাই অনেক দেরিতে তাদের উনুনে আঁচ পড়ত। কী আসবে—মাছ পাওয়া যাবে কি না, আনাজ কী পাওয়া যাবে—কেউ জানে না।

তিনি বাড়ী ফিরলে তবে রান্না চাপত। সকালে উঠে বোঁ ক'রে স্টেশনে চলে যেতেন —ডিউটি থাক বা না থাক্, ব্যাপারীদের ঝাঁকা থেকে টানাটানি ক'রে দুটো মূলো এক মুঠো বরবটি—হ'ল বা গোটা আষ্টেক উচ্ছে নামিয়ে দু' পকেট বোঝাই করতেন। মাছও ঐ ভাবে আদায় হ'ত। বাড়ীতে গিয়ে যখন রুমাল খুলতেন তখন দেখা যেত হয়ত একটা চিংড়ি, তিনটে খলসের বাচ্চা, গোটা দুই ট্যাংরা, তিনটে গুলে এবং গোটা আষ্টেক পুঁটি। এ ছাড়া আসত একটা ঘটিতে দেড় পো আধ সের দুধ। তখন উনুন ধরত, চা হ'ত, রান্না চড়ত। গজ গজ করতেন আপুর মা, 'চিরদিন সমান গেল। ঠিক যেন ভিখিরীর ঝুলি ঝাড়া হ'ল! যেমন আনাজের ছিরি, তেমনি মাছের। ন-টা উচ্ছে—পাঁচটা মুকী কচু—একমুঠো বরবটি। এ আমি কী রাঁধব, কার পাতেই বা দেব?' আপুর বাবা কিন্তু একটুও দমতেন না, সোৎসাহে বলতেন, 'কেন—উচ্ছে ক-টা ভাতে দাও না। উচ্ছে আলু ভাতে বেশ ত হয়। আর ঐ বরবটি আলু কচু বেগুন সব দিয়ে একটা ঘ্যাঁট। মাছ কটার ঝাল করো—যার বরাতে যা ওঠে। কিম্বা উচ্ছে কচু সব দিয়ে সুক্তো?'

তারপর কারুর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেলে হেসে চোখ মটকে বলতেন—তা কে জানে বিমল, কে জানে তার বাবা—'কতগুলি ক'রে পয়সা বাঁচছে, সেদিকে হুঁশ নেই। পয়সা খরচ ক'রে বাজার করতে হ'লে কি আর রোজ বাজার হ'ত? আঙুল ঠেলে ভাত খেতে হ'ত। এ রকমারী তরকারী আসছে, ভালই ত। কে বোঝাবে বলুন, তবে আর বোকা মেয়েমানুষ বলেছে কেন।'

অনেকক্ষণ শোনবার পর হয়ত আপুর মা ধমক দিতেন, 'তুমি চুপ করো! বোকা মেয়েমানুষ পেয়েছিলে তাই, নইলে আর কেউ তোমার ঘর করতে পারত না। যেন ডেযো-ডোক্‌লার ঘরকন্না। আমার বাবা কি আমার বিয়ে দিয়েছিলেন? হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছিলেন।'

ভদ্রলোক শামুকের মত গুটিয়ে গিয়ে একটা ছেলে কি মেয়ে কোলে ক'রে আদর করতে বসতেন।

এখনও তাঁকে মনে পড়লেই হাসি পায় বিমলের। কোন খাদ্য-বস্তুই বোধ হয় কখনও কেনেন নি। শীতকাল হ'লে দুধের ঘটি ছাড়া আর একটা গেলাস যেত পকেটে। তাতে আসত পয়ড়া গুড়। কোন দিন বা মোয়া। নিজের কোটগুলো

কাটিয়ে ছেলেমেয়েদের জামা ক'রে দিতেন। একদিন আপুরই পেট খারাপ হয়েছিল —ওর মা বলেছিলেন ডাব আনতে। ভদ্রলোক একটু বিমর্ষ হয়ে বলেছিলেন, 'তাই ত! মাছ ডাব দুধ এক গাড়ীতেই সব নামে যে। এটা ধরতে গেলে ওটা হয় না। ঈস্—! দুধটাই দেখছি বাদ দিতে হ'ল আজ। ব্যাটারা যা ছোটে পোঁ-পোঁ ক'রে। যাক্ গে—কী আর হবে, না হয় নুন লেবু দিয়েই চা খাওয়া যাবে।'

অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বলেছিলেন গৃহিনী, 'কেন, রোগা মেয়েটার জন্যে একটা ডাব একদিন তুমি কি কিনে আনতে পারো না!'

'কিনে—? তা তা অবশ্য—কী জানো, বড্ড দাম যে। ব্যাটারা চোদ্দ পয়সা হেঁকে বসে একটা ডাব। কলকাতায় কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে শুনেছি খুব সস্তা, ছ' পয়সা দু' আনায় ডাব পাওয়া যায়। কে যায়—আবার কলকাতা। দেখি—দুপুর বেলা এক ফাঁকে যদি ডুব দেওয়া যায়। ঐটুকু ত—যাবো আর আসব।'

হাত জোড় ক'রে বলেছিলেন গৃহিনী, 'থাক্। থাক্। ব্যাগোত্তা করি—আর আমার ডাবে কাজ নেই। তুমি মানুষ না পিশাচ, ঢের ঢের চসমখোর মানুষ দেখেছি তোমার জুড়ি নেই।'

'হ্যাঁ। তা ত ব'টেই। দেখতুম আমার মত দেড়শ টাকা আয়ে ছ'টা ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার চালাতে হ'লে কে কত টাকার মাল গস্ত করত রোজ! ওধারে ত বিইয়েছ শুয়োরের পাল। সেদিকে ত কমতি নেই। অধিক সন্তান দারিদ্দিরের লক্ষণ! এত বড় সংসার সব কিনে চালাতে গেলে রাজাও ফতুর হয়ে যেত— তা জানো?'

কিন্তু একটা শখ ছিল ভদ্রলোকের। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ঝোঁক ছিল খুব। মেয়েটিই বড়। বিকেলে বা রাত্রে—যেদিন যেমন ডিউটি পড়ত —ফিরেই মেয়েকে নিয়ে পড়াতে বসতেন। ছেলেরাও পড়ত কিন্তু তাদের গৃহিনী তাঁর অল্পবিদ্যাতেই যা হয় ক'রে পড়াতে পারতেন। মেয়ে ক্লাস সেভেন-এ উঠেছে তখন—তাকে পড়ানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আপুর বাবাই পড়াতেন মেয়েকে; কিন্তু সে সাংঘাতিক পড়ানো।

যেদিন নাইট-ডিউটি থাকত বা মর্ণিং-ডিউটি থাকত সেদিন তবু সুবিধা। ঈভ্নিং ডিউটি হ'লে ফিরতেন এক একদিন রাত দশটায়, নটার আগে ত হ'তই না।

বেচারী আল্‌পনা তখন ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ত। কিন্তু তাহ'লে কি হয়—তখনই এসে ওর চুলের ঝুঁটি ধরে বাবা ওঠাবেন এবং রাত এগারোটা পর্যন্ত পড়াবেন। নইলে ওঁরই বা সময় কোথা? সকালে আটটা অবধি কাটে বাজারের জোগাড়ে—তারপর ত আপুর ইস্কুলের সময়, কচি ভাই-বোনেদেরও একটু একটু দেখতে হ'ত। সুতরাং সে সময় পড়া যায় না। অগত্যা ঐ রাত্রে। ঘুমে বিহ্বল হয়ে থাকত ওর বুদ্ধিশুদ্ধি—প্রায়ই কিছু বুঝত না, পড়াও বলতে পারত না। ফলে বাবার হাতে খেত নির্মম প্রহার। সে প্রহারের শব্দে বাড়ী-সুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙ্গে যেত—চোরের মার একেবারে। অথচ তাঁরই বা উপায় কি? কত কষ্টে যে মেয়ের ফ্রি পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তা তিনিই জানেন—সেই খানে কি-না মেয়েটা ফেল ক'রে বসল! নেহাৎ তিনি করিৎকর্মা মানুষ তাই ফেল-করা সত্ত্বেও হাফ্‌ফ্রি রইল কিন্তু এবার যদি সব বিষয়ে পাস করতে না পারে ত তাও থাক্‌বে না। তখন পড়াবে কে? মায়া-দয়া করতে গেলে ছেলেমেয়ে মানুষ হয় না।

দেখে দেখে একদিন আপুর মা নিভৃতে ধরেছিলেন বিমলকে। সজল নেত্রে ওর হাত দুটো ধ'রে বলেছিলেন, দেখছ ত বাবা—মেয়েটার কি প্রহারটা। একে ত ঐ মেয়ে, চোরের মার খেতে খেতে আরও ওর মাথা যায় গুলিয়ে। আর রাত্রে মার খেতে হবে ব'লে সারাদিন যেন কাঁটা হয়ে থাকে। অমন দর্‌কে দর্‌কে থাকলে কদিন বাঁচবে বলো ত? তুমি বাবা একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে ওকে? সন্ধ্যেবেলা? তোমার কাছে গিয়ে বসবে? আমি তোমাকে কথা কিছু দিতে পারছি না কিন্তু যে মাসে যা পারব তোমাকে দু-এক টাকা লুকিয়ে চুরিয়ে দিয়ে যাবো। মেয়েটাকে বাঁচাও বাবা।'

তখন সবে ক্লাস টেন্‌-এ উঠেছে বিমল। তারও পাসের পড়া। তবু তাকে যে ভাল ছেলে ব'লেই অনুরোধ করা হচ্ছে তা বুঝতে পেরে আত্মতৃপ্তিতে ভারি আরাম পেয়েছিল ও। তাছাড়া এমন অনুরোধ এড়ানোও কঠিন। ওর বাবার একটু আপত্তি সত্ত্বেও সে-ভার নিয়েছিল বিমল। আর বিমল ওকে পড়ানোর ভার নিয়েছে—এবং বিনা পারিশ্রমিকে—শুনে ওর বাবাও নিশ্চিন্ত হলেন, কারণ বিমল ভাল ছেলে—কে না জানে? আলপনা বাঁচল।

কিন্তু লেখাপড়া তার বিশেষ এগোয় নি। বড়ই বোকা ছিল মেয়েটা। অথবা বোকা হয়ে গিয়েছিল। ক্ষমতা বা রুচির মাপে পড়াটা হ'লে কী হ'ত বলা যায় না। হয়ত ঢের সহজে এবং অনায়াসে এগিয়ে যেত সে। কিন্তু এ বোঝা তার পক্ষে অতিরিক্তই হয়ে পড়েছিল। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকত সে। প্রাণপণে মুখস্থ করত। মনে করে রাখার চেষ্টা করত—অথচ সময়ে বল্‌তে পারত না। তখন আপনিই চোখে জল এসে যেত বেচারীর। শুধু এত চেষ্টা সত্ত্বেও না বলতে পারার গ্লানিতে, অক্ষমতার লজ্জায় সে কেঁদে ফেল্‌ত। বিমল বুঝতে পারত না—এর পরও একে মারতে হাত ওঠে কেমন ক'রে।

হয়ত এ লজ্জা বিমলকেই বেশী তার। কে জানে। আজ তাই মনে হয় অন্তত। নইলে—ওর মা বলতেন—'চোরের মার খেয়ে এক ফোঁটা কাঁদে না বাবা, কিন্তু তোমার কাছে আদর পেয়েও কাঁদে কেন মুখপুড়ী।' আবার নিজেই উত্তর দিতেন—'হয়ত আদর পায় বলেই কাঁদে। যার কাছে যত পায় তার কাছেই ত তত অভিমান কিনা।'

আদর অবশ্য বিমল কোন দিনই দেয় নি—তবে হ্যাঁ সস্নেহ ব্যবহার হয়ত করেছে। ওর ঐ অবোধ পশুর মত করুণ চাহনি, যা সামান্য প্রশংসায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে ছল-ছল করত, আবার একটুকু কঠিন কথায় যা ভরাট হয়ে উঠ্‌ত সঙ্গে সঙ্গে, নিজের অক্ষমতার সচেতনতায় যা সদাই কুণ্ঠিত এবং দীন—সে চাহনি বিমলকে স্নেহার্দ্র ক'রে তুলত ঠিকই।

কিন্তু সেই স্নেহ কিংবা প্রশ্রয়—আলপনার মনে ঐটুকুর জন্যই কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। পালিত মার্জারীর মতই তার অন্তরটি সদা সর্বদা বিমলের পেছনে পেছনে ঘুরত—পদলেহন ক'রে। এত ভক্তি সে বেঁচে থাকলে তার গুরু বা ইষ্টকেও করতে পারত কিনা সন্দেহ। শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের অন্ত ছিল না তার। এত বুদ্ধি এবং প্রতিভা (অপূর্ব তাই ধারণা ছিল) যে কোন মানুষের মধ্যে থাকা সম্ভব—এ যেন তার কল্পনারও অতীত। এমন অনায়াসে এত ভারি ভারি পড়া আয়ত্ত করতে পারে কেউ? এমন জটিল অঙ্ক দিনরাত ভেবেও যার কোন হদিশ পায় না আপু, তাই কিনা একটু মুচকি হেসে এক মিনিটের ভেতর কষে ফেলে। অথচ কত মিষ্টি কথা। কত আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দেয়! কী ধৈর্য। বার বার বোঝানো সত্ত্বেও তার

মাথায় ঢোকে না কিছু, তাই ব'লে ত বাবার মত রেগে ওঠেনা। আবার বোঝাতে বসে। ছি ছি, এর কাছে তার কী দৈন্যই প্রকাশ পাচ্ছে। এই কথাটা ভাবলেই যখন-তখন ওর সেই অবোধ কুণ্ঠিত নয়নের কোল উপ্‌ছে জল ঝরে পড়ত!

তাব এ মনোভাব আজ বিমল বুঝতে পারে। সেদিনও যে কতকটা পাবে নি তা নয়। অপবিসীম আত্মগর্বে মন ভরে উঠ্‌ত ওর। এমন ভক্তিমতী উপাসিকা পাওয়ার গৌবব—অত অল্পবয়সেও ওকে যৎপবোনাস্তি মোহগ্রস্ত কবেছিল। আর তাইতেই না অমন কাণ্ডটা—।

ছি। বিমলেব জীবনে ঐ একটি কলঙ্ক।

কিন্তু আজ খুব ঠাণ্ডা-মাথায় ভাবলে কাজটাকে অত খাবাপ ব'লে মনে হয় না। বেচাবীব জীবনে জমাব খাতায ত কিছুই ছিল না। সে ত ওটাকে দেবতাব প্রসাদ মনে ক'বেই কৃতার্থ হযেছিল। তবু—বিমল বোঝে যে—সেদিন দেবতাব আসন থেকে ভ্রষ্ট হযে সে সাধাবণ মানুষেব স্তবেই নেমে এসেছিল ঐ বালিকাব অন্তব-লোকে। সেটা তখনই স্পষ্ট ভাবে তাব কাছে প্রতীত না হ'লেও মনেব অবচেতনে তাই ঘটেছিল। ঘটাই স্বাভাবিক।

বিমলেব স্কুল-জীবন ছিল বড বিচিত্র। বড মধুব, বড তিক্ত।

পূর্ব মাষ্টাব মশাইযেব ইস্কুল ছেডে হাইস্কুলে ভর্তি হ'যে প্রথমটা খুব সুখী হয নি বিমল। অনেক ছেলে, শিক্ষকদেব মনোযোগ নেই—ছাত্রদেব সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কম। এ কী হাটেব মাঝে এসে পডল সে।

ক্রমে ক্রমে সে নিজেব গুণে শিক্ষকদেব চোখে পডল। দু-একজনেব অন্তবঙ্গ হবার সুদুর্লভ সৌভাগ্য লাভ কবল সে। আজও বিমলেব বিশ্বাস, ব্যক্তিগতভাবে যে ছাত্র শিক্ষকদের সাহচর্য লাভ না কবেছে, সে বড বঞ্চিত।

তারপর তাব একটি বন্ধুগোষ্ঠিও গডে উঠল।

অদ্ভুত সে বন্ধুগোষ্ঠি। ভাল ছেলে ছিল ক-জন। তাবা সত্যিই ভাল ছেলে আর জনকতক ছিল ভালয়-মন্দে মিশানো। এরা লেখাপডায মাঝারি, অত্যন্ত পরোপকারী, স্নেহময় বন্ধু—কিন্তু চরিত্রে কিছু গোলমাল ছিল তাদের। বেশী নয়,

জন-দুই-তিন, এদের যৌনক্ষুধা জেগেছিল সেই বয়সেই। ক্ষুধা দৈহিক যত না উগ্র হোক—মুখে এরা ঐদিক-ঘেঁষা আলোচনা ক'রে সুখ পেত। এটাকে তারা 'খিস্তি' বলে স্বীকার করত না—বলত মুখ-খারাপ করা। গোড়াতে গোড়াতে তাও বলত না—বলত মাঝে মাঝে একটু 'ইয়ে' না হ'লে আড্ডা জমে কখনও?

ওদের ক্লাসে নাম-করা বকাটে ছেলেও ছিল। ক্লাস এইট্-এই তারা নানা দুষ্টামিতে পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল কিন্তু তারা নাম-করা ব'লেই তাদের সঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া চলত সহজে। সারা ক্লাসে চমৎকার দুটি ভাগ হয়ে গিয়েছিল। পেছনের বেঞ্চিতে ওরা বসত, জনা-ছয়সাত ছেলে। তাদের যে লেখাপড়া হবে না তা তারাও জান্‌ত, বাকী ছেলেরা এবং মাষ্টারমশায়রা সবাই জানতেন—জানতেন না কেবল তাদের অভিভাবকরা। অথবা ভাগ্যকে স্বীকার করতেন না। নানা জুলুমের সময় এসে তাঁদেরই মাপ চাইতে হ'ত—বছরের শেষে হ'ত হাতে-পায়ে ধরে পাস করাতে। এরা কিন্তু বিপজ্জনক নয় মোটেই। শুধু বিমল নয়—আরও এমন অনেক ছেলে ছিল যারা কখনও কথাই বলে নি ঐ-সব মার্কা-মারা ছেলের সঙ্গে। বিপজ্জনক ছিল এই সব ছেলেরাই—যাদের ভাল না বেসে থাকা যায় না, অনেকখানি ভালর সঙ্গে একটু মন্দ মেশানো যাদের চরিত্র। তার ওপর এ আড্ডাটা ঠিক স্কুলেরও নয়—এটা পাড়ার আড্ডা। সহরতলীর এই-সব আধা পাড়াগাঁয়ে পাড়ার ছেলের সখ্যতাটা সহরের চেয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। ওর সহপাঠীই বেশী ছিল ওর বিশেষ দলটিতে—কিন্তু ওদের শ্রেণীর এক-আধ শ্রেণী নিচে বা ওপরে পড়ে, এমন ছেলেও ছিল তার মধ্যে। তাতে কিছু ঘনিষ্ঠতা আটকায় নি। অত্যন্ত মধুর ছিল এদের সঙ্গ ও সাহচর্য। এদের এড়ানো সহজও ছিল না, প্রেয়ও ছিল না। সুতরাং বিমলের এই সব আলোচনা খুব ভাল না লাগলেও তা থেকে দূরে সরে যেতে পারে নি।

তাছাড়া··ভাল যে লাগে নি একেবারে, তাও কি হলপ ক'রে বলতে পারে বিমল? জীবনের এই অন্তরঙ্গ রহস্যময় অথচ গোপন দিকটা সম্বন্ধ মানুষের সহজাত কৌতূহল কি তারও ছিল না যথেষ্ট? আলোচনার মধ্যে মধ্যে ভাষাটা যখন একেবারে ইতর হয়ে উঠ্‌ত তখনই বিশ্রী লাগত, কান-মাথা ওর গরম হয়ে যেত—সমস্ত মুখ যে লাল হয়ে উঠেছে তা সে নিজেই টের পেত। নইলে ভালই লাগ্‌ত

বৈকি! এই ভাবেই আরও অনেকের ভাল লেগেছে—তারা জেনেছে, অনেক সময়ে অপরকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জেনেছে—এবং আরও 'ভাললাগার' নেশায় সেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল অন্বেষণ করেছে।

সব চেয়ে মজার কথা এই—যারা বিমলদের এই সব 'জ্ঞান' দিত, তারা কী ভাবে এই অভিজ্ঞতা আহরণ করেছে তা সব ক-জনকেই জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিয়েছিল বিমল—পরে। সে মূল বিচিত্র। ওদের পাড়ায় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক থাকতেন, হাইকোর্টের কেরাণী। সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, লেখাপড়াও কিছু শিখেছিলেন, গম্ভীর-প্রকৃতি, সন্তানের পিতা। ইনিই নাকি কিশোর-বয়স্ক ছেলেদের নিরিবিলি পেলে তাদের ঐসব কথা শোনাতেন, আকারে ইঙ্গিতে, তাদের কথার অর্থও বুঝিয়ে দিতেন। এটা অবশ্য শুধু জ্ঞান। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তারা অধিকাংশই তাদের গুরুজন-স্থানীয় দাদাদের কাছ থেকে—বা দাদার বন্ধুদের কাছ থেকে, যাদের সঙ্গে তাদের বয়সের তফাৎ পাঁচ থেকে পনেরো পর্যন্ত। এই ইতিহাস সর্বত্র—পরে ওপরের ক্লাসে বা কলেজ-জীবনেও—যাদের সঙ্গে ওর কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তাদেরই প্রশ্ন ক'রে জেনেছে বিমল। অবশ্য ক্লাসের বন্ধুরাও আছে, এবং হাতে-খড়ি অনেক জায়গায় ক্লাস-রুমেই হয়েছে—এমন ইতিহাস যে একেবারে নেই তা নয় কিন্তু খুব বেশী নয়। বরং প্রথম অভিজ্ঞতার পর তা ঝালাই করা হয়েছে স্কুলের আনাচে কানাচে কিংবা ক্লাসের ভিতরই—এই ইতিহাসই বেশী, ওর এম-এ ক্লাসের এক সহপাঠী স্বীকার করেছিল যে যখন সে মাত্র ক্লাস ফাইভ-এ পড়ে, তখনই এক ক্লাস সেভেনের ছেলে তার কাছে এ সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে সচেতন ক'রে দিয়েছিল।

কিন্তু সে আপুর কথা ভাবছিল।

আপুকে যে সে পড়াচ্ছে, এবং আপু তাকে কী সম্ভ্রমের চোখে দেখে, এ কথা বন্ধু-সমাজে গল্প করেছিল বৈকি। এতখানি আত্মপ্রসাদ কি একা-একা ভোগ করা চলে! কথা-প্রসঙ্গে নয়, ইচ্ছে করেই সবিস্তারে গল্প করেছে সে বন্ধুদের কাছে। সগর্বে।

তার ফলে ঠাট্টা তামাসার অন্ত ছিল না। যেমন বন্ধুসমাজে হয়ে থাকে।

কেউ অভিযোগ করলে, ডুবে ডুবে জল খাওয়ার।

কেউ বললে, সব ভালো-ছেলেদেরই জানা আছে। বরং তাঁরা এককাঠি সরেস।

কেউ বললে, গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি।

সে সব তামাসার আড়ালে ইচ্ছাতুর ঈর্ষার অভাব ছিল না। সে ঈর্ষা উপভোগ করল সেদিন বিমল।

প্রথম ঠাট্টা-তামাসার ঝোঁকটা কেটে গেলে সবাই জানতে চাইলে পূর্ণ বিবরণ। ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে।

মোটেই গড়ায় নি শুনে কেউ কেউ করলে অবিশ্বাস। অধিকাংশই হতাশ হ'ল। তারা তাতাতে শুরু করলে, 'তুই কী রে? তুই কোনও কাজের নোস্! ভোঁদা একেবারে। বোকারাম।'

ক্রমাগতই তাতাত তারা। বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করত। কাপুরুষ বলত। ক্রমে ক্রমে ওর ছেলেমানুষ মন সেই উস্‌কানির কাছেই হার মানলে। এক নির্জন মুহূর্তে একদিন হঠাৎ আপুকে কাছে টেনে এনে ওর মুখখানা তুলে ধরে চুমো খেলে।

ইস্! সে লজ্জা, সে গ্লানিতে আজও ওর সমস্ত গা রি-রি করে ওঠে। এই রাত্রির অন্ধকারে নিঃসঙ্গতার মধ্যেই—আজও তার মাথা ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠছে, ঘাম দেখা দিয়েছে সরশরীরে।

আপু অবাক হয়ে চেয়েছিল। সে বিস্ময়-বিহ্বল চাহনি যেন সঙ্গে সঙ্গে ছুঁচের মত বিঁধেছিল ওকে। আত্মসম্বরণ ক'রে লজ্জায় মাথা হেঁট করেছিল।

আজও সে চাহনি মনে পড়লে লজ্জা করে ওর।

এমন কি—তার অল্পক্ষণ পরে জিনিষটার পরিপূর্ণ অর্থ এবং অনুভূতিটা বোধগম্য হ'তে যে সুখে ও লজ্জায় সে মাথা নুইয়ে ছিল, তার শ্যামবর্ণ মুখেও যে রক্তিমাভা ফুটে উঠেছিল, আশার অতীত পুরস্কার লাভের যে কৃতজ্ঞতা ও চরিতার্থতা প্রকাশ পেয়েছিল তার অধরোষ্ঠের ভঙ্গীতে—তাতেও কোন সান্ত্বনা পায়নি বিমল সেদিন।

সেই প্রথম ও সেই শেষ।

আপুর দিক থেকেও কোন দাবী আসে নি বলা—বাহুল্য। অত উচ্চাশা তার ছিল না। সাধ হয়ত ছিল কিন্তু বুক ফাটলেও মুখ ফোটবার মত সাহস তার হয় নি কোন দিন।

শুধু তার মনোভাব বোধ করি গোপন রইল না—যখন মাত্র সতেরোটি দিন টাইফয়েডে ভুগে মারা যাবার পর ওর বই-রাখা কাঠের বাক্সটি থেকে বেরোল একখানা আধময়লা রুমাল আর একটা বিবর্ণ গ্রুপ ছবি।

অনেকদিন আগে এই রুমালটা হারিয়ে যায় বিমলের, কোথায় ফেলেছিল মনে করতে পারে নি কিছুতেই। ছবিটাও বহুদিন আগেকার। ওদের পাড়ার টীম সেবার কী একটা শীল্ড ফাইন্যালে জিতেছিল, তারই ছবি। সেই টীমের সঙ্গে বিমলেরও ছবি উঠেছিল। বহুদিন আগেকার কথা—রোগা টিংটিং-এ একরত্তি বিমল, আজ তাকে চেনাও কঠিন। ছবিটা কোথায় পড়েছিল ধূলোর গাদায়, বিমলের মা ঝাঁট দিয়ে জঞ্জালের সঙ্গে ফেলে দিয়েছিলেন। বিমল তুলে নিয়ে সকৌতুকে আপুকে প্রশ্ন করেছিল, 'বলো ত কোন্‌টা আমি?' আপু ঠিকই দেখিয়েছিল কিন্তু। তারপর হাসতে হাসতে বিমল ছবিটা আবার জঞ্জালের গাদায় ফেলে দিয়ে চলে যায়। আপু যে কখন সেটা কুড়িয়ে সযত্নে এনে তুলে রেখেছিল, তা কেউ জানে না।

জীবনের সমস্ত সাধ আহ্লাদ অপূর্ণ রেখেই—মাত্র চৌদ্দ পনেরো বছর বয়সে তাকে বিদায় নিতে হয়েছিল এই পৃথিবী থেকে। তার সেই একান্ত অন্ধকার জীবনে ওর ঐ দুষ্কৃতি কি একবিন্দু আলো দিতে পেরেছিল? অথবা গভীরতর বেদনার কারণ হয়ে বিঁধেছিল বুকে। কে জানে!

নিস্তব্ধ রাত্রির নিকষ-কালো আকাশে ঐ যে তারাগুলো ফুটে আছে, হয়ত ওরই মধ্যে কোন এক নক্ষত্রের কোন এক গ্রহে সে আবার জন্ম নিয়েছে। হয়ত বা এই গ্রহেই কোন সুদূর দেশে সে জন্মেছে। কিম্বা বিশ্বের অনন্ত প্রাণ-সমুদ্রে মিশিয়ে গেছে তার ছোট্ট একরত্তি ভীরু আত্মা—শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে।

মানুষ দেহান্তর গ্রহণ করে কি না, তা বিমল জানে না।

যদি তা হয়—এ জন্মে যেন সে সুখী হয়। এমন বিড়ম্বিত জীবন যেন তাকে

আর ভোগ করতে না হয়!

দূরের রাজপথে মানুষ ও যানবাহনের কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে। চমক ভেঙ্গে উঠে পড়ে বিমল।

১২

পূর্ণিমা বাড়ীতে ফিরে নিঃশ্বাস নেবার অবসর পায় না। মা একটু বিরক্ত-কণ্ঠেই বলেন, 'আপিসে ত ছুটি হয়েছে কখন? এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকিস আজ কাল? শেষে একটা কেলেঙ্কারী করবি নাকি? ঝকমারী হয়েছিল তোমাকে চাকরী করতে দেওয়া।'

বাবা হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, 'চাকরী আর করতে যেতে হবে না। অফিস ছাড়িয়ে নাও। আমাদের অদৃষ্টে যা আছে হবে।'

অভিযোগটা নতুন নয়—কিন্তু ঝাঁজটা নতুন। পূর্ণিমা একটু অবাক হয়ে যায়। অবশ্য আসল কথাটাও জানতে বেশি দেরি হয় না। বাবার হাঁপানীটা হঠাৎ বেড়েছে। বুকে-পিঠে একটা ব্যথা কদিনই টের পাচ্ছিলেন, তার-ওপর এই হাঁপানী—ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছেন। মা যথাসময়ে উনুনে আঁচ দিয়েছিলেন কিন্তু তারপর আর বাবাকে ছেড়ে উঠতে পারেন নি। এতক্ষণ ধরে বুকে তেল মালিশ ক'রে একটু সুস্থ করেছেন বটে কিন্তু ছেড়ে যাওয়ার মত এখনও হয় নি। বিশেষত হাঁপানী বাড়লে ত ওর বাবা একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে পড়েন, কিছুতেই মাকে কাছছাড়া করতে চান না।

মা একটু যেন কুণ্ঠিত ভাবেই বললেন, 'তার ওপর আজ আবার ঝি আসে নি। বাসন-কোসন এখনও সব পড়ে।'

অর্থাৎ সোনায় সোহাগা। কিন্তু এ-ও নতুন নয়। দিনরাতের লোক রাখার ক্ষমতা নেই, ঠিকে ঝি একটি আছে, সে বাসন মেজে আর ঘর-বারান্দা মুছে দিয়ে যায়। কিন্তু মাসে অন্তত চারদিন কামাই সে করবেই! তাড়ানোও যায় না—

কাবণ বহুদিনেব লোক ব'লেই আজও সে চাব টাকা মাইনেতে কাজ কবছে, তাকে তাড়ালে আট টাকার কম কাউকে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। ওপব তলায যে ঝি কাজ কবে সে শুধু বাসন মেজে দিযে যায—সাত টাকায়! অত টাকা দেবার ক্ষমতা তাদেব নেই।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পূর্ণিমা বলে, 'সাদা বাসনগুলো অন্তত মালুকে দিযে মাজিযে নিতে পাবো নি মা।'

'তবেই হযেছে!' মা ব'লে ওঠেন, 'যেখানকাব যা তেল মসলা ঠিক লেগে থাকত, উল্টে তাব সঙ্গে জড়িযে ধবত ছাই মাটি। একটা চাযেব পেযালা ধুতে পাবে না—তাব বাসন!'

বিবক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে ওঠে পূর্ণিমাব।

'পাবে না ব'লে কি কোন কালে শিখবে না। ওকে এমন ক'বে তুমি তৈবী কবছো যেন কোন কালে ওব নিজেব ঘব-সংসাব হবে না।'

'তৈবী আব কি ক'বে কবব বাছা তাও জানি না।' মা-ও বিবক্ত হ'যে ওঠেন একটু, 'বুড়ো বযসে কি মাবধোব কবব? এই ত তোমাব পেছনেও ত কম টিক্-টিক কবি না। তুমিই কি এখনও গুছিযে কাজ কবতে শিখেছো? তোমাদেব হেঁসেলেব ধাবে-কাছে যেতে দিতেই ত আমাব ভয় কবে। না আছে এঁটো-কাঁটাব বিচার, না আছে কোন হিসেব। এলো-পাতাড়ি কাজ। নেহাৎ দাযে পড়েই যেতে দিতে হয।'

কী একটা উত্তব দিতে গিযেও সামলে নেয পূর্ণিমা। প্রাণপণে বিবক্তিটা দমন কবে এ-ঘবে এসে অফিসেব জামা কাপড় ছাড়ে। মাঠে বসাব ফলে মাটিব দাগ হযেছে শাড়ীতে—অথচ এখনও তিনটি দিন চালাতে হবে। ভাল শাড়ী ওব এত কম যখন, তখন অত কাব্যি কবা ঠিক হয় নি।

মা'রই একখানা তেল চিট্‌চিটে ছেঁড়া কাপড় জড়িযে নিযে গিযে বাসন মাজতে বসে পূর্ণিমা। উনুনে দুবাব কযলা দেওযা হযে গেছে—এব পব বান্না আব হ'তেই চাইবে না। কলতলা থেকেই ছোট বোনকে হেঁকে বলে, 'মালু ততক্ষণ একটা কাজ কববি, হাত ধুযে একটু ডাল চাপিযে দিবি? ততক্ষণ ফুট্‌তে থাক্। তারপব আমি গিয়ে নামিযে চা ক'বে দেব!'

মালু ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'বাবা রে বাবা। এ বাড়ীতে লেখাপড়া করবার কোন উপায়ই নেই। কেন যে চেষ্টা করি তাও জানি না!'

পূর্ণিমার কণ্ঠস্বর তিক্ত হয়ে ওঠে, 'থাক মালু, আদিখ্যেতা করিস নি। লেখাপড়া আমরাও করেছি, ভাল ক'রেই করেছি। সাধারণ একটু আধটু ফায় ফরমাশ খাটলে তার কোন ক্ষতি হয় না। আমরা কি কখনও কিছু করি নি?'

মালুও সমান ঝাঁজের সঙ্গে জবাব দেয়, 'তোমাদের এত ফায়-ফরমাস খাটতে হয় নি—তখনও বৌদি ছিল।'

সে দুম্ দুম্ ক'রে পা ফেলে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। কলঘরের দশ বাতির আলোয় বসে বাসন মাজতে মাজতে রাগে গজরায় পূর্ণিমা, 'মা যা তৈরী করছেন ছোট মেয়েকে, টের পাবেন এর পর। আমার কি? আমি কি আর চিরকালই এইখানে পড়ে থাকব?'

সব চেয়ে বিপদ হয়েছে এই যে—অবস্থা চিরদিনই ওদের এত খারাপ ছিল না। বাবা সরকারী চাকরী করতেন, তখনকার দিনের হিসেবে মাইনেও খুব কম ছিল না। গত লড়াই বাধবার পরেই পেন্সন নিতে হ'ল। সে পেন্সনও পুরো রাখা গেল না, ওর দিদির বিয়ে বাকী ছিল, অনেকখানি পেন্সন বিক্রী ক'রে তার বিয়ে দেওয়া হ'ল। আয় কমে গিয়ে ভগ্নাংশে দাঁড়াল, অথচ ব্যয় বেড়ে গেল হু-হু ক'রে। ভরসার মধ্যে ছিল দাদা—সেও সরকারী চাকরী পেয়েছিল কিন্তু মা আর একটি ভুল ক'রে বসলেন। বড় মেয়ে চলে গেল, হাতের কাজ এগিয়ে দেবার লোক চাই—এই বাসনাতে ছেলের বিয়ে দিলেন। কাজ তার দ্বারা কিছুই হ'ল না, বিয়ের পর বোঝা গেল যে কম ক'রেও তার সাত রকমের অসুখ আছে, মাসের মধ্যে বাইশ দিনই সে থাকে অসুস্থ। সাতটার আগে তার ঘুম ভাঙ্গে না —শালীনতার দোহাই দিয়েও পূর্ণিমার দাদা স্ত্রীর সে অভ্যাস ছাড়াতে পারে নি। তাছাড়া কাজ-কর্ম সে কিছু জানতও না, শেখবারও ইচ্ছা ছিল না।

তবু কিছুদিন সময় পেলে কী হ'ত বলা যায় না। কিন্তু বিবাহের বছরখানেকের মধ্যেই তার মেয়ে হয়ে গেল। রুগ্ন কাঁদুনে মেয়ে। তাকে দেখতেই অবসর পেত না বৌদি, কাজ কর্ম করবার সময় কৈ? আর সেই যে শুরু হ'ল—চার বছরে তিনটি। অভাব বেড়ে গিয়েছিল তার ভেতর অনেক। খরচ-পত্র নিয়ে দাদার

সঙ্গে মায়ের খেচাখেচিও বেড়ে চলল সেই অনুপাতে। অবশেষে একদিন শোনা গেল দাদা শ্বশুরবাড়ীর কাছাকাছি কোথায় যেন ঘর ভাড়া করেছেন। দিন-কতক পরে সত্যিই চলে গেলেন—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-মালপত্র নিয়ে।

তখন এঁদের আয়ের মধ্যে ওপর-তলার ভাড়া বাবদ ত্রিশটি টাকা। আর বাবার পেন্‌সন সাতচল্লিশ। ভাড়াটে বহুকালের—দিত পঁচিশ, বেড়ে তেত্রিশ করেছে। তার চেয়ে বাড়ানো সম্ভব নয়। তুলতে গেলে নালিশ মকদ্দমা করতে হয়—সে খরচ দেবে কে? তাছাড়া কী রকম ভাড়াটে আসবে কে জানে। সে-ও যে ভাড়া দেবে ঠিক-মত, তার নিশ্চয়তা কি? চক্ষু-লজ্জাও আছে একটু। আত্মীয়ের মত হয়ে গেছেন ওরা। তবু পৈত্রিক এই বাড়ীটুকু ছিল শশীবাবুর তাই রক্ষা—নইলে কী যে হ'ত। বাড়ীতে চুনকাম করার খরচ জোটে না, ভাড়া ক'রে থাকতে হ'লে হয়ত আত্মহত্যা করতে হ'ত।

সেই সময়ই পূর্ণিমাকে কলেজের মায়া কাটিয়ে চাকরীতে ঢুকতে হ'ল। ছোট বোন আছে, ছোট ভাই আছে। ওর মাইনে যোগ করলেও ডাল-ভাত জোটা কঠিন। তবু ত ওর এক কাকা আছেন দিল্লীতে, তিনি ওদের ইস্কুলের মাইনে, বই খাতা বাবদ কিছু কিছু পাঠান—মধ্যে মধ্যে।

বাসন মেজে গাদা ক'রে রেখে এসে কাপড় কাচতে কাচতে ডাল-পোড়া গন্ধ এল নাকে। ভিজে কাপড়টাই কোনমতে গায়ে জড়িয়ে রান্নাঘরে ছুট্‌ল পূর্ণিমা। সেখানে গিয়ে কাণ্ড দেখে ত পূর্ণিমার চক্ষু স্থির। প্রায় জনদশেকের খাবার মত ডাল চড়িয়েছে মালু ফলে একরত্তি কড়ায় বেশী জল দেওয়া যায় নি, সে জল শুকিয়ে সমস্ত ডাল পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে।

ততক্ষণে গন্ধ পেয়ে মা-ও ছুটে এসেছেন। তিনি কিন্তু সমস্ত ঘটনাটার জন্য পূর্ণিমাকেই দায়ী করলেন। মালু কখনও করে নি, তার কি দোষ। পূর্ণিমা তাকে বলতেই বা গেল কেন, আর বললেও—কতটা ডাল চাপাবে ব'লে দেওয়া উচিত ছিল।

পূর্ণিমার যেন কান্না পেতে লাগল। মা'র এই পক্ষপাতিত্বর (অন্তত পূর্ণিমার

তাই বিশ্বাস) কোন জবাব দিতে তার রুচি রইল না। সে নিঃশব্দে খুন্তির ডগা দিয়ে পোড়া ডালগুলো চেঁচে চেঁচে ফেলে দিয়ে আবার নতুন ক'রে ডাল চাপিয়ে ঘরে গেল কাপড় ছাড়তে।

তারপর কর্মের নিরন্ধ্র নিরবসর।

চা করতে হ'ল। বাবা রাত ন-টার পর খান না কিছুতেই, আগে তাঁর রুটি ক'রে, দুধ জ্বাল দিয়ে দিতে হ'ল। বাকী গৃহস্থর একটা তরকারী আছে, রুটি আছে, ভাত আছে। মা ভাত খান—বাকী সকলের রুটি।

অবশ্য শেষের দিকে মা এসে পড়লেন কিন্তু পূর্ণিমার মনে হ'ল—না এলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। এসে পর্যন্তই গজগজ করতে লাগলেন, আটা মাখতে গিয়ে নাকি সে আটা ছড়িয়েছে চার দিকে। তেলের বোয়েম থেকে পলা ডুবিয়ে তেল না নিয়ে কাৎ ক'রে ঢেলে নিয়েছে, তারপর বোয়েমের গা-টা মুছে নেয় নি—গা বেয়ে তেল গড়িয়ে তাকৃটা-ময় তেল হয়েছে। কুটনো কুটে বঁটিতে খোসাতে আনাজে একাকার ক'রে ফেলে রেখেছে। জলের কলসীতে চাপা দেয় নি—বাটনার রেকাবীটা সকৃড়ি ক'রে বসে আছে—এমনি সহস্র অকর্মণ্যতার নজীর।

'অতবড় মেয়ে—একটা কাজ যদি গুছিয়ে করতে পারে।··ছোট বোন্‌কে বকবার সময় ত খুব আছ। নিজে ত কত কাজের লোক।'

অন্যদিন হ'লে রাগারাগি করত পূর্ণিমা। সমানে মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করত—তেজ দেখাত। বলত, যে, 'ঐ জন্যেই ত তোমার কাজ করতে চাই না। করেছি এই কত না।' বলত যে, 'মানুষে করতে করতেই শেখে। তুমি করতে দাও না বলেই ত এই কাণ্ড।' কিন্তু কে জানে কেন আজ নিঃশব্দে সব শুনে গেল —একটি প্রতিবাদ পর্যন্ত করলে না।

মাকে খেতে দিয়ে নিজের খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে যখন রান্নাঘর ধুতে শুরু করলে, তখন মা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কৈ তুই খেলি না?'

এইবার প্রথম মুখ খুললে পূর্ণিমা, 'আমিও ত মানুষ মা। মানুষ কেন— গাধাকেও বিশ্রাম করতে দিতে হয়। অফিস থেকে এসেই জুতেছি তোমাদের ঘানিগাছে, এখন একটু হাঁফ ছাড়তে দাও। এ অবস্থায় কি কিছু মুখে রোচে।'

মা জবাব দিলেন, 'এই ঘানিগাছে আমরা চিরদিনই জুতে আছি মা—

বিশ্রামের কথা মুখেও আনিতে পারি নি। তোমরাও কোন দিন ভাবো নি। উনি ত ভাবেনই নি!'

'তোমার দুপুর ছিল মা। দুপুরে ঘুমোতে পেতে, আমাদের মত অফিস করতে হ'ত না।'

'তুমিই বা আজ সকালে কি কাজ করেছ মা? কিন্তু তাও নয়—। দুপুর ত তুমি আজ দেখ্‌ছ। ষোল বছরের মেয়ে এ বাড়ীতে এসেছি। নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পাই নি তারপর থেকেই। দুপুর বেলা অবসর মিলত বটে কিন্তু শোবার হুকুম ছিল না—বসে বসে দিদিশাশুড়ীকে রামায়ণ শোনাতে হ'ত। নয়ত পিসশাশুড়ীর পাকাচুল তোলা ছিল। আমাদের কাঁচা বয়স, কাজেই বিশ্রাম করবার দরকার কি? তবে সে প্রথম দু-বছর। তারপরই কোলে ছেলে এসেছে। তোমার যে দিদি মারা গেছে সেই দিদি—শুধু সে কেন আমার সব ছেলেরাই, তোমরাই কি কম? কেউ দুপুরে ঘুমোত না। অথচ পাছে শাশুড়ীদের ঘুম ভাঙ্গে সেই জন্যে সারা দুপুর তোমাদের কোলে ক'রে ক'রে ঘুরতে হ'ত। এখানে সারা দুপুর ঘুমোতে না—সন্ধ্যা হ'লেই সব অজ্ঞান হয়ে পড়তে ঘুমে। ওঁরা ভারি খুশী হতেন। মেজ বৌমার ছেলেপুলেরা খুব লক্ষ্মী, সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ে—বৌমা একটু কাজ পায়। সে সময় যদি একটু ছুটি পেতুম ত হ'ত—কিন্তু সে সময় ছুটির কথা ভাবাই যায় না। তখন রান্নাবাড়া—একান্নবর্তী সংসার, এক এক বেলায় চল্লিশখানা পাতা পড়ত ছেলে বুড়ো মিলিয়ে। সব সেরে শুতে আসতাম রাত বারোটা, সাড়ে বারোটা, ঠিক তিনটেতে ছেলেমেয়েরা উঠে পড়ত। সব ক-টি সমান ছিল আমার। যখন যে কোলে থাক্‌ত তারই ঐ দস্তুর। তখন তাকে ভোলাতে হ'ত, খেতে দিতে হ'ত। তারপর নিয়ে পায়চারী করো, নইলে ওঁর ঘুম হবে না। সারাদিন খেটেখুটে এলেন আপিস থেকে, রাতেও যদি ঘুম না হয় ত বাঁচবেন কি ক'রে। আমরা বাঁচব কি ক'রে সে খোঁজ কেউ কখনও নেয় নি মা। আর বেঁচেও ত আছি, সেদিন যদি মরতুম ত শান্তি হ'ত। বুড়ো বয়স পর্যন্ত এই লাঞ্ছনা সইতে হ'ত না।...একদিন একবেলা করতে হয়েছে তাতেই ত মুখনাড়া দিচ্ছ। তাও কি বসে ছিলুম?'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বল্লে মা আবার ভাতের গ্রাস মুখে তুললেন। শেষের

দিকে তাঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এসেছিল, বহুদিনের ভুলে যাওয়া ব্যথার সমুদ্রে জোয়ার জেগেছে তাঁর। ডালমাখা ভাতও হয়ে এসেছে ঠাণ্ডা। তিনি হাত গুটিয়ে বাঁ-হাতে জলের ঘটিটা মুখে তুললেন।

চোখের নিমেষে তাঁর সেই বাঁ-হাতখানা চেপে ধরে পূর্ণিমা বললে, 'আমার অন্যায় হয়েছে মা, ও কথাটা বলা। তুমি কিন্তু ভাত ফেলে উঠ্‌তে পারবে না।'

মা বিস্মিত হ'লেন। এ যেন নতুন কোন পূর্ণিমা। ভালও লাগল খুব, স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে বললেন, 'আর ভাল লাগছে না রে।'

'না, তা হবে না। আজ আমি রেঁধেছি, তুমি যদি ভাত ফেলে উঠে যাও ত বুঝব রান্না ভাল হয় নি।'

'তবে তুইও খাবারটা নিয়ে বোস। গল্প করতে করতে খাওয়া যাক্—'

'দোহাই মা। জাঁনোই ত রান্না করলে গা না ধুয়ে আমি কিছু খেতে পারি না। খাবো আমি ঠিক—এখন এমনই বসে গল্প করছি।'

মা'র খাওয়া হ'লে রান্নাঘরের সব কাজ শেষ ক'রে সত্যিই গা ধুতে গেল পূর্ণিমা, কিন্তু তারপরও খেতে ইচ্ছা করল না। মা শুয়ে পড়েছেন, সবাই ঘুমিয়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম। বোধহয় এগারোটা বাজে। সে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে রান্নাঘরের দরজায় শেকল তুলে দিয়ে ছাদে চলে গেল।

অনেকদিন পরে ছাদে উঠল ও।

ওদের ত ছাদে ওঠাই হয় না। ভাড়াটেরাই ভোগ করে। তারা দোতালায় থাকে—কোন বাধা নেই তাদের। ওদের আসতে হয় ভাড়াটে পেরিয়ে, দিনের বেলা তাই আসতে ভাল লাগে না। মা কিছু শুকোতে দিতে বা বড়ি দিতে ওঠেন বটে মধ্যে মধ্যে—পূর্ণিমা কিন্তু কখনও-কোনদিন এলে রাত্রেই আসে। ভাড়াটেরা তাদের সিঁড়ির দোর বন্ধ করলে সিঁড়িটা আলাদাই হয়ে যায়।

আঃ! ছাদটা যা নোংরা ক'রে রেখেছে। অর্ধেকটা ছাদ জুড়ে গুল দিয়েছে। আর একটু হ'লে গুলের ওপরই পা তুলে দিত পূর্ণিমা।

কোন মতে এক পাশ দিয়ে আলসের ধারে এসে দাড়াল সে। পাড়ায় অধিকাংশ আলোই নিভে এসেছে। রাস্তার আলো সহরতলীর গাছ-পালা ছাপিয়ে

ওপবে ওঠে না। অল্প একটা আবছা আলো মাত্র আছে—সেটা কতটা পথেব আলোব প্রতিফলন আর কতটা নক্ষত্রব, তা ঠিক ক'বে বলা কঠিন।

তবু—ভাবি আবাম বোধহয পূর্ণিমাব। ঝিরঝিবে ঠাণ্ডা বাতাস আব এই অন্ধকার। তাব চেযেও বড কথা এই নিঃসঙ্গ অবসর—এইটেই যেন পবম উপভোগ্য।

একটু আগেকাব কথাগুলো মনে পড়ল—এলোমেলো ভাবনাব মধ্যে। বোনেব কথা, নিজেব কথা, ম'াব কথা। আব—আব বিমলেব কথাও।

ভাবতে ভাবতে মন ঘুবে ফিবে পৌছল বিমলেব কাছেই।

ক-দিন আগেই ত সে বলছিল।

বলছিল, 'এই ত শিক্ষা পায আমাদেব দেশেব মেযেবা। লেখাপড়া শেখাব অহঙ্কাবে বান্নাভাঁডাবেব ত্রি-সীমানায ঘেঁষে না—সংসাবেব খবব বাখা যেন স্কুল-কলেজেব মেযেদেব কাছে বড লজ্জাব। অথচ সব কাজ এড়িযে যে শিক্ষা হয তাব কি মূল্য, তা ত কার্যক্ষেত্রে এসেই বোঝা যায। আফিসেব কাজেবও কি কোন যোগ্যতা অর্জন কবে মেযেবা? একটুও না। তাছাড়া—এই অযোগ্যতা বুঝেই হোক বা নিশ্চিন্ত-নিবাপদে পবেব পযসায ব'সে খাওযাব লোভেই হোক, অধিকাংশ মেয়েবই মন ঝুঁকে থাকে বিযেব দিকে। আব বিযেব পব ক-টা মেযে চাকবী বাখে তাও ত দেখতেই পাচ্ছেন।'

জযন্তী বাধা দিযে বলেছিল, 'কেন অণিমাদি, গীতাদি, এবা?'

বাঁ-হাতটা তুলে থামবাব ইঙ্গিত ক'বে বিমল উত্তব দিযেছিল, 'আপনাদেব অণিমাদি বিযেব পবে চাকবীতে ঢুকেছেন, সংসাবে টানাটানি দেখে। আব গীতা ঘোষেব ট্রাজেডি ত জানেনই। স্পোর্টস্‌ম্যান্ স্বামী খেলায পা ভেঙ্গে এল বিযেব এক মাসেব মধ্যে। তখন উনি ছুটি নিযে বসে ছিলেন, চাকবী ছেড়ে দেবাব ভূমিকা হিসেবে। স্বামীব পা য্যাম্প্যুট্ ক'বে বাদ দিতে হ'ল দেখেই না ছুটিব পব আবাব উনি অফিসে এসে ঢুকলেন।...না মিস্ চৌধুবী, বিবাহিতা মেয়েবা দাযে না পড়ে চাকবী কবে খুব কম। শতকবা দুজন হবে কিনা সন্দেহ।... নেহাৎ খুব ভাল চাকবী হ'লে টিকে থাকে। কিংবা যেসব মহিলারা বুড়ো বযসে বিয়ে করেন তাঁরা থাকেন। কাবণ তখন চাকবীটা হ্যাবিট্ হয়ে যায়।...অথচ দেখুন এই যে এঁরা বিয়ে করেন,

কী শিক্ষা নিয়ে এঁরা ঘর করতে যান ? না জানেন গৃহস্থালী গুছোতে, না জানেন হিসেব ক'রে চার দিকে চোখ রেখে সংসার করতে—না শেখেন ছেলে মানুষ করতে। মাপ করবেন আপনারা—স্বামী বিবাহ না ক'রে রক্ষিতার কাছে গেলে যেটুকু পেতেন ততটা যত্নও পান না স্ত্রীর কাছ থেকে। কারণ তাদের পুরুষকে ধরে রাখতে হয় চেষ্টা ক'রে, সেখানে শৈথিল্য করলে চলে না। এরা সে দায়ে নিশ্চিন্ত ! পাঁচসিকে জোড়ার ফুলের মালার বাঁধন ছিঁড়ে যাবার জো কি ? অন্তত ভদ্রসমাজে ! Home, Sweet Home কী শুধু ইংরেজরই স্বপ্ন ? পৃথিবীর সব পুরুষেরই স্বপ্ন-কল্পনা হ'ল শান্তি ও আরামের একটি নীড়—ধরণীর এককোণে cosy corner একটি। কিন্তু দিনের পর দিন দেখছি সে স্বপ্ন কী নিষ্ঠুর ভাবেই না ভেঙ্গে যাচ্ছে ! কারণ যাদের নিয়ে ঘর বাঁধার কথা—তাঁরা আজ আর গৃহিনী নন, তাঁরা আজ শুধু—।'

আর বলতে পারে নি বিমল। হয়ত শব্দ খুঁজে পায় নি বলেই।

সেদিন ওরা সবাই রাগ করেছিল। জয়ন্তী বিমল সম্বন্ধে আড়ালে মন্তব্য করেছিল 'Brute!' কিন্তু আজ পূর্ণিমার মনে হয় যে হয়ত বিমলের কথাই ঠিক। ওর বোন যে কাণ্ড করলে সেটাকে ছেলেমানুষের আনাড়িত্ব ব'লে উড়িয়ে দিলেও নিজের ভেতরই যে বিমলের উক্তির সমর্থন পাচ্ছে। মা ওর প্রতি কাজে খুঁত ধরেন ব'লে এতকাল ও রাগ করত কিন্তু আজ মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে তিনি মিছে কথা বলেন না। মা যে ত্রুটিগুলো দেখান সেগুলো সত্যিকারের ত্রুটিই। সেগুলো না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।...

ঠাণ্ডা বাতাসে ওর সমস্ত শরীরে যেন একটা তন্দ্রার শৈথিল্য লাগে। দেহের সঙ্গে চিন্তাও আসে শিথিল হয়ে, খেই হারিয়ে যায় ভাবনার। তখন কী ক'রে যেন মনটা বক্তব্য ছেড়ে ব্যক্তিতে এসে পৌঁছয়। মনে হয় অদ্ভুত মানুষ। আজও যেন তল পাওয়া গেল না লোকটার।

অথচ—অথচ—কেন কে জানে কী একটা অজ্ঞাত আকর্ষণও অনুভব করে সে—দিনেরাতের নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে বার বার বিমলের কথাটাই মনে পড়ে।

যেন এক প্রচণ্ড বিক্ষোভ সর্বদা ওর ভেতরে জ্বলছে, সামান্য মাত্র আঘাতেই সে আগুন বেরিয়ে আসে বার বার। তার ঝাঁজ এক এক সময় অসহ্য লাগে। তবু কৌতূহল বেড়েই যায় লোকটার সম্বন্ধে। আগুনের আস্বাদেও লোভ হয় বুঝি।

কে জানে কোন মেয়ে কোনদিন ওকে সুখী করতে পারবে কি না! ··সেই মেয়ের জায়গায় কোন্ এক দুর্বল মুহূর্তে নিজেকেই কল্পনা ক'রে বসে সে। তারপর চমক্ ভেঙ্গে নিজেই লজ্জিত হয়—বুঝি বা সেই অন্ধকারেই রাঙা হয়ে ওঠে।

রাত গভীর হয়ে এসেছে। সহরের কলরব কখন একেবারেই নিস্তব্ধ হয়ে গেছে তা সে লক্ষ্য করে নি।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যায় পূর্ণিমা।

১৩

সে কী একটা ছুটির দিন। খবরের কাগজ শেষ ক'রে বিমল বসে বসে কি-যেন ভাবছিল—পুলক এসে বললে, 'আমাকে এই অঙ্কটা একটু বুঝিয়ে দেবেন বিমল দা?'

অঙ্ক! পুলক অঙ্ক শিখবে!

বিমল ত অবাক। বেশ খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে চেয়ে ছিল বিমল ওর মুখের দিকে।

সে চাহনীর অর্থ বুঝতে পুলকের দেরী হয় নি। ওর সুগৌর মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল লজ্জায়। মাথা নিচু ক'রে বলছিল, 'আমি এখন একটু একটু পড়াশুনো করছি বিমলদা। দেখলুম অন্তত অঙ্কটা একটু ভাল ক'রে না জানলে কিছুতেই কাজে উন্নতি হবে না।'

'তুই কি পরীক্ষা দিবি?' অনেকক্ষণ পরে কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছিল বিমল।

'দেখি। সে পরের কথা। কিন্তু অঙ্কটা ভাল ক'রে শিখতেই হবে।'

তবু বিমলের বিস্ময় সেদিন সহজে কাটে নি। কাটবার কথাও নয়।

পুলকরা ওদের বাড়ীতেই দুখানা ঘরে ভাড়া থাকত। পুলকের বাবার বেশী বয়স নয় কিন্তু অল্পবয়সে বিয়ে হওয়ায় অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। বিরাট সংসার, আয় কম—অধিকাংশ নিম্ন-মধ্যবিত্তের যে অবস্থা। তার ওপর ওর বাবা

অভিলাষ বাবু একেবারেই লেখাপড়া শেখেন নি—ব্যাঙ্কে চাকরী করলেও কাজটা উঁচুদরের নয়।

অভিলাষ বাবু নিজে লেখাপড়া শেখেন নি বলেই বোধ হয় ছেলেকে শেখাবার জন্য প্রাণান্ত করেছিলেন। অভিলাষ বাবুর বড় সম্বন্ধী মোটা মাইনের চাকরী করেন —তিনি মাঝে মাঝে কিছু পাঠান ভাগ্নে-ভাগ্নীর লেখাপড়া বাবদ, ভদ্রলোক শত অভাবেও সে টাকা কখনও ছোঁন্ না। ওটা ওদের লেখাপড়ার জন্যই খরচ হয়। দুঃখের কথা এই যে—বড় ছেলে পুলকটি একেবারেই সেদিকে গেল না। ওধারে ধর-পাকড় ক'রে কোনমতে ক্লাস-প্রোমোশন পাচ্ছিল, ক্লাস এইট্-এ এসে একেবারে আট্‌কে গেল। হেড্‌মাস্টার বললেন, 'নাইন মানে ম্যাট্রিক ক্লাস, এখানে আমি একটু দেখে শুনেই তুলব।'

প্রথমবার ফেল ক'রে সুবোধ বালকের মত ঐ ক্লাসেই টিকে ছিল আর এক বছর। আরও একবার যখন আট্‌কাল তখন সহজেই আশা করেছিল যে এইবার তার এ যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি মিলবে। কিন্তু অভিলাষ বাবু সে ধার দিয়েই গেলেন না। তিনি কড়া হুকুম জারি করলেন, লেখাপড়া ছাড়তে আমি দেব না। ইস্কুল ছেড়ে দাগা-ষাঁড় হয়ে ঘুরে বেড়ানো চলবে না। ফের পড়ো একবছর।'

মা ছেলের শুকনো মুখ দেখে প্রস্তাব করলেন, 'অন্য ইস্কুলে দিলে হ'ত না ? ওর সঙ্গীরা সব টপাটপ উঠে গেল আর ও—ঐ ইস্কুলেই থেকে গেল সেই এক কেলাসে। ওর লজ্জা করছে বোধ হয়।'

'অত লজ্জা যদি ত মন দিয়ে পড়লেই পারে। আজকাল ভাল ছেলেদেরই কোথাও ভর্তি করা যায় না—ফেল ছেলে কোথায় ভর্তি করব ? তা ছাড়া আবার বাড়তি খরচা। ওসব হবে টবে না—।'

এর পর দুর্বুদ্ধিমান ছেলে-মাত্রই যা করে পুলকও তাই করলে। একদিন বাড়ী থেকে বাড়তি একটি হাফ প্যান্ট এবং পাঁচটি মাত্র টাকা সম্বল ক'রে পালাল।

মা হা-হুতাশ করলেন, কান্নাকাটি করলেন। কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে। অভিলাষ বাবু কিন্তু অটল, 'অত পয়সা কোথায় আমার ? যা গুণের ছেলে তার জন্যে আবার বিজ্ঞাপন। পড়াশুনো করলে না মানুষ হ'লো না—সে ছেলে ঘরে থেকেই বা কি হবে। পারে রোজগার ক'রে খাক গে।'

যাই হোক—অভিলাষ বাবুর আশা বা মা'র আশঙ্কা কোনটাই সফল হ'ল না। মাস-দশেক পরে পুলক আবার বাড়ীতে ফিরে এল। এর ভেতর কিন্তু ওর পরিবর্তন হয়েছে ঢের। ছেলেটা বরাবরই সুশ্রী। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ এবং লম্বা ছিপছিপে চেহারা ছিল। এবার দেখা গেল যেন আরও ঢ্যাঙা হয়েছে এবং ক-মাসে কিছু মাংসও লেগেছে গায়ে। ফলে আগের চেয়েও সুন্দর দেখাচ্ছে। টেরী কাটতে দিতেন না অভিলাষ বাবু, এখন বিনা বাধায় ব্যালবার্ট শোভা পাচ্ছে মাথার আগে। হাফ প্যাণ্ট্ ছেড়ে পাজামা ধরেছে—সঙ্গে একটা স্যুটকেস এসেছে তাতে কিছু জামা কাপড। অর্থাৎ কিছু যে রোজগার করেছে ইতিমধ্যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইতিহাসটা কি? সবাই কৌতূহলী হয়ে ঘিরে ধরল। অভিলাষ বাবু আত্মসম্মানে আঘাত লাগবার ভয়ে নিজে কোন প্রশ্ন করলেন না বটে কিন্তু তাঁরও কান খাড়া রইল।

সব ছেলেরাই আজকাল যা স্বপ্ন দেখে—পুলকেরও সেই স্বপ্নই ছিল, চিত্রাভিনেতা হ'বার। বাংলার চেয়ে বোম্বের বাজার ভাল; এ খবরটা সে পেয়েছিল সকলকার কাছেই। সুতরাং সোজা হাওড়াতে গিয়ে বোম্বের গাড়ীতেই চেপে বসেছিল। সম্বল মোটে পাঁচ টাকা, কাজেই টিকিট নিয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব ছিল না—ইচ্ছাও ছিল না বোধ হয়। বার দুই-তিন চেকারের হাতে ধরাও পড়েছিল, প্রায় বালক দেখে তাঁরা বিশেষ কিছুই বলেন নি, শুধু নামিয়ে দিয়েছিলেন। পুলকও আবার অন্যদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে অন্য কামরায় উঠেছিল। একবার শুধু নিজের একটু অন্যমনস্কতার ফলে একই চেকারের হাতে অল্পক্ষণের মধ্যে দু-বার ধরা প'ড়ে একটা গলাধাক্কা ও গাঁট্টা খেয়েছিল। কিন্তু সে কিছু নয়।

বোম্বে ত পৌঁছল। কোন জানাশুনো লোক নেই, কোন আশ্রয়ও নেই। দুটো-তিনটে দিন সম্পূর্ণ পথে পথেই কাটল। সামান্য কিছু জলযোগ ক'রে নেয় আর টো টো ক'রে ঘোরে।

কিন্তু কোথায় সেই স্বপ্নে-দেখা স্বপ্ন-স্বর্গ? সে যে এত সুদূর, সেখানের গণ্ডী পার হওয়া যে এত কঠিন তা ত কেউ তাকে বলে দেয় নি। প্রথমত ঢোকা যায় না—যদি বা লুকিয়ে চুরিয়ে কৌশল ক'রে ঢোকে—বেরিয়ে আসতে হয় অল্পক্ষণ পরেই। অবাঙ্গালীরা হাসে, বাঙ্গালী যাঁরা আছেন তাঁরা ধমক দেন,—'বাড়ী

থেকে পালিয়ে এসেছ নিশ্চয়! আঃ—তোমাদের জন্যে আমাদের মাথা কাটা যায় এখানে। সরে পড়ো দিকি সোজা—বাড়ী গিয়ে পড়াশুনো করোগে।'

অনেক কান্নাকাটি ক'রেও সে স্টুডিওতে একটা ঝাড়ুদারীর চাকরীও জোগাড় করতে পারলে না। অনেকদিন আগেকার এক পাঠ্যপুস্তকে মাইকেল ফ্যারাডের কাহিনী পড়েছিল সে—ল্যাবরেটরীতে চাকরের কাজ চেয়েছিলেন ভদ্রলোক। সেটা মনে ছিল পুলকের। সে-ও এবার সর্বত্র সেই কাজই চেয়ে বেড়াতে লাগল কিন্তু তাও যে এত দুর্লভ তা কে জানত।

অবশেষে পাঁচটাকার পুঁজি যখন পাঁচ আনায় এসে ঠেকল তখন সে কাজ পেলে এক রেস্তোরাঁয়। অপরিচিত ছেলের পক্ষে বাসন মাজার কাজও আজকাল পাওয়া কঠিন—নিহাৎ ওর সুশ্রী চেহারা দেখেই গুজরাটী মালিক দয়ার্দ্র হয়ে কাজটা দিলেন, বেশ একটু ঝুঁকি নিয়েই। কাপ-ডিস ধোয়ার কাজ—তা হোক্, মাথার উপর একটু ছাদ এবং নিয়মিত দুবেলা আহারের জন্য যে কোন কাজই ওর কাছে তখন লোভনীয়।

সেখানেই মাস পাঁচেক ছিল পুলক। না, চুরি বা বেইমানী সে করে নি কোন রকম। ভবিষ্যতে তার মত কোন অসহায় বাঙ্গালী ছেলের এই ধরণের আশ্রয় পাবার সম্ভাবনা সে তার ব্যবহারের দ্বারা নষ্ট ক'রে যাবে না, এটা সে আগে থেকেই ঠিক করেছিল। সে হয়ত চুরি ক'রে নিরাপদেই পালিয়ে যেতে পারবে কিন্তু তারপর কি আর কেউ আশ্রয় দেবে এমনি কোন অপরিচিত ছেলেকে?

এই পাঁচ মাস সে অবসর পেলেই চেষ্টা করেছে স্টুডিওতে চাকরী পাবার। কিন্তু তারপর একটু একটু ক'রে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে তার। রেস্তোরাঁয় বিস্তর লোক আসে যায়—এর ভেতর সে ওখানকার স্থানীয় ভাষাও আয়ত্ত ক'রে ফেলেছিল—তাদের কথাবার্তায় সে স্টুডিওর ভেতরের হালচাল কিছু কিছু জেনেছিল। তারপর আর লোভ হয় নি সেখানে চাকরী করতে যাবার। বাড়ীই ফিরবে সে, কিন্তু তার আগে দেশটা একটু ঘুরে একবার দেখে যেতে দোষ কি? আর কি সুযোগ মিলবে?

ওখানকার কাজ ছেড়ে সে গিয়েছিল দিল্লী, সেখান থেকে আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কাশী। দিল্লীতে গিয়েও এক রেস্তোরাঁতে কাজ পেয়েছিল সে। এবার

রঁাধুনীর কাজ—চপ কাট্‌লেট ভাজতে শিখেছিল সে বোম্বাইতে থাকতেই। আসবার সময় গুজরাটী মনিবের কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট নিতেও ভুল করে নি—তাই দিল্লীতে পৌছেই সে কাজ পেয়েছিল। ওখানে মাস কতক কাজ ক'রে সেই জমানো টাকায় বাকী শহরগুলো ঘুরে আবার কলকাতাতেই ফিরে এসেছে। যদি সামান্য কাজ ক'রেই খেতে হয় ত দেশে এসেই করবে। একা নির্বান্ধব অবস্থায় পড়ে থেকে লাভ কি?

এই হ'ল ওর অজ্ঞাতবাসের মোটামুটি ইতিহাস।

অভিলাষবাবু এবার আর ভুল করেন নি। ওকে লেখাপড়া শেখাবার বৃথা চেষ্টা না ক'রে কাকে কাকে যেন ধরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন এক কারখানাতে।

'বামুনের ঘরের গরু—লেখাপড়া শিখলি না। যা লোহা পিটগে যা। কামারের কাজ করতেই ভগবান পাঠিয়েছেন, তা আমি করব কি।'

এই কথা ব'লে অভিলাষবাবু নিশ্চিন্ত হলেন।

পুলকের লেখাপড়া হয় নি মন ছিল না ব'লে। নইলে নির্বোধ সে একেবারেই নয়। কয়েকমাস কারখানায় কাজ ক'রেই বুঝল যে সামান্য একটু লেখাপড়া না জানা থাকলে সেখানেও উন্নতি ক'রার কোন সম্ভাবনাই নেই। চিরদিনই তাকে সাধারণ মিস্ত্রী হ'য়ে থাকতে হবে, অশিক্ষিত অর্ধবর্বর কতকগুলি লোকের সঙ্গে।

সেটা বোঝামাত্রই কিছু কাগজ কিনে নিয়ে পুলক অঙ্ক কষতে লেগে গেল। যতদিনেই হোক—উন্নতি সে করবেই। ফোরম্যান-সুপারভাইজার না হ'তে পারা পর্যন্ত সে থামবে না।

পুলকের বক্তব্য শেষ হ'তে বিমল বিস্মিত হয়ে বললে, 'কিন্তু তোমার কাজে যা লাগবে তা ত এই সাধারণ অঙ্ক নয়। ততদূর পর্যন্ত পৌছতে গেলে তোমাকে অন্য পড়াশুনাও কিছু কিছু করতে হবে।'

'তাও করব বিমলদা। যখন যা দরকার হবে তাই পড়ে নেব। আমি ওভার-টাইম নেওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছি। কারখানা থেকে ফিরে এসেই বই খাতা নিয়ে

বসি—রাত দশটা পর্যন্ত পড়াশুনো করি। খেলাধূলো বেড়ানো—সবই ছেড়েছি। আপনি যদি বলে দেন যে কী ধরণের পড়াশুনো দরকার হবে ত এখন থেকেই শুরু করি।'

খুশী হ'য়েছিল বিমল। শিখিয়েছিল যত্ন ক'রেই। তবু এতটা উন্নতির জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। পুলক যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলল। যে বীজগণিত কিছুতেই তার মাথায় ঢোকে নি ইস্কুলে পড়বার সময়, সেই বীজগণিতের অঙ্ক একবার দেখিয়ে দেবার পর এক-এক রাতে পঞ্চাশ ষাট্‌টা ক'রে কষে ফেলত। শিগ্‌গিরই অর্থাৎ বছর-খানেকের মধ্যেই এমন সময় এল যে বিমলের বিদ্যায় আর কুলোয় না। এর পর বিজ্ঞান-জানা ছাত্রর দরকার। শুধু তাই নয়, পুলক চায় কিছু কিছু ফিজিক্‌স্ বা পদার্থ বিজ্ঞান পড়তে। কিন্তু তার জন্য একটু ইংরেজী জানাও দরকার।

পুলক অধীর আগ্রহে শুধু বলে, 'আমাকে বলুন শুধু কি করতে হবে—আমি গাধার মত খাট্‌তে রাজি আছি। বলেন ত গোটা ডিক্সনারীটাই মুখস্থ ক'রে ফেলব।'

গাধার মত না—ভূতের মতই খাট্‌তে পারে সে।

ইংরেজী শেখাবার সোজা রাস্তা হিসেবে বিমল তাকে একদিন ব'লে দিয়েছিল, ইংরেজী দৈনিকগুলো থেকে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাংলায় অনুবাদ ক'রে তাকে দেখিয়ে, সেই বাংলা থেকে ইংরেজী অনুবাদ ক'রে আসলের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে। তার ফলে ওরই প্রাণান্ত। প্রতিদিনকার কাগজ থেকে দুটি ক'রে অন্তত বিরাট সম্পাদকীয় প্রবন্ধ অনুবাদ ক'রে রাখত। সেটা মিলিয়ে দেখতেই বিমলের দেড়ঘণ্টা দুই ঘণ্টা সময় লেগে যেত। প্রথম প্রথম খুবই হাস্যকর ভুল হ'ত কিন্তু শিগ্‌গিরই ভুল কমে এল। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে দু-একটি শক্ত বাক্যাংশ ছাড়া মোটা-মুটি ঠিকই বুঝেছে সে। তখন বিমল হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচল। ওকে বললে, 'বাংলা আর আমাকে দেখাতে হবে না পুলক। বাংলা ক'রে তুমি তা থেকে সঙ্গে সঙ্গেই ইংরিজি ক'রে ফেলো—তাহ'লেই হবে।'

এর কিছুদিন পরে ওকে স্বাধীনভাবে একটি রচনা লিখতে দিয়ে চম্‌কে উঠ্‌ল বিমল—বানান ও ব্যাকরণ-গত ভুল দশ বারোটার বেশি চোখে পড়ল না! ক্লাস টেন্-এর ফার্স্ট সেকেণ্ড ছেলের কাছে ছাড়া এমন লেখা আশা করা যায় না। তাও ত তাদের মুখস্থ লেখা!

খুশি হ'ল যেমন, চিন্তিতও হ'ল। একদিন প্রকাশ্যেই বল্‌লে বিমল, 'পুলক ভাই, আমাব বিদ্যেতে ত আব কুলোচ্ছে না। এবাব ভাল বিজ্ঞান-জানা ছাত্রেব কাছে যাওয়া দবকাব। কিন্তু কে-ই বা বেগাব দেবে তাও ত বুঝতে পাবছি না!'

পুলক খুবই দমে গেল। ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল একেবাবে। কাবণ ইতিমধ্যে ও নতুন ক'রে ভূগোল ও ইতিহাস পড়তে শুরু কবেছে, ম্যাট্রিক পবীক্ষাব জন্য তৈরী হচ্ছে, সে খবব বিমল পেযেছিল ইতিমধ্যেই। উচ্চাশাব নেশায পেযেছে তাকে।

সে অনেকক্ষণ চুপ ক'বে থেকে বললে, 'বিমলদা, ওভাব টাইম ত কবি না— নইলে মাইনে দিতে পাবতুম। ওভাব-টাইম নিলে আব পডবাব সময পাবো না। ···আচ্ছা, এমন কাউকে ধবতে পাবেন না, যাকে এখন কিছু সামান্য টাকা দিলে চলে? পবে আমি তার যোগ্য মাইনেব টাকাই কডায গণ্ডায় বুঝিয়ে দেব।··· আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি মাবব না। কিন্তু এখন—সামান্য টাকা নিতে গেলেই বাবা গোলমাল কববেন—কাবণ আমাব আযটা তিনি হিসেবেব মধ্যে ধবতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। তবু নিতেই হবে, যেমন ক'বে হোক। তবে সে ত ঠিক দেবাব নয। তাই বলতে লজ্জা কবে। পাওয়া যাবে না এমন কাউকে বিমলদা, যিনি আমাকে বিশ্বাস ক'বে অপেক্ষা কববেন?'

ওব বলবাব করুণ ভঙ্গীতে বিমল বিচলিত হযেছিল। ওকে কোলেব ভেতব টেনে নিযে ওব মাথাটা নেড়ে আদব ক'বে বলেছিল, 'ওবে পাগল, লোক কি আমাব বাক্সের মধ্যে লুকোন আছে যে বাব ক'বে দেব। দেখছিস ত বাজাব— লোকে হাঁড়ি চডিযে তবে টিউশনী কবতে যায। দেখি একটু ভেবে, তবে আশা কম। তুই একলব্যেব মতই মনে মনে গুরু বেখে তৈবী হ' ভাই।'

পুলক ছল-ছল চোখে জবাব দিলে, 'সে সাহস আমাব আছে দাদা কিন্তু বড্ড যে দেবী হয়ে যাবে। আমাব কাবখানায পবীক্ষা দেবাব বযস যে চলে যাবে।'

'আচ্ছা, দেখি কি কবতে পাবি।'

'চেষ্টা ক'বে দেখব' এমনি আশ্বাস মুখে দিলেও মনে মনে কোন উপাযই খুঁজে পায় না বিমল। অথচ পুলক ওব সেই প্রায়-স্তোক-বাক্যেব ওপবই যে কতটা ভবসা ক'রে রইল তাও সে বুঝতে পারে। সেই জন্যই বলতে গেলে সারাদিন কথাটা ওর

মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করতে লাগল। কারুর কথাই ওর মনে পড়ে না। কে এমন আদর্শবাদী আছে, যে এতখানি ত্যাগস্বীকার করবে। ভবিষ্যতের আশা? পুলককে বিমল বিশ্বাস করলেও অপরে ততটা করবে কেন? তাছাড়া ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত, বর্তমানের অভাবটা ধ্রুব এবং নিশ্চিত।

বিমল কথাটা ভাবতে ভাবতেই সন্ধ্যার পর নিখিলদের বাড়ী গেল। সেখানে ঢুকতেই নিখিলের বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি একটু ক্ষমাপ্রার্থনার স্বরে বললেন, 'নিখিলকে ওর মামা নিয়ে গেছেন জোর করে--এখনই আসবে, দুপাঁচ মিনিট বসবেন একটু অনুগ্রহ ক'রে?'

না বসে উপায়ও ছিল না বিমলের। এতটা হেঁটে এসে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওর সঙ্গে ওঁদের বাইরের ঘরে এসে বসল। নিখিলের বাবা ভিতরে গিয়ে চায়ের ফরমাশ দিয়ে এলেন। চা খেতে খেতে নানা প্রসঙ্গ উঠল। ফলে, আজকে যে কথাটা বিমলের মনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জুড়ে বসেছে, সেই কথাটাই উঠে পড়ল। বিমল বললে, 'একটি অদ্ভুত ছেলের কথা বলব আপনাকে। আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না—কিন্তু সবটাই সত্যি।'

এই বলে সে পুলকের কাহিনী আদ্যোপান্ত শোনালে তাঁকে। সব। মায় আজকের কথাটা সুদ্ধ শেষ ক'রে বললে, 'বিশ্বাস হয় আপনার?'

সত্যশরণ বাবু কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত হ'লেন না, বললেন, 'ও কি বলছেন, তবে শুনুন আর একজনের কথা। আমার এক বন্ধুর দাদা সুশীল গুপ্ত, এখন উত্তর কলকাতার খুব বড় ডাক্তার, দিনেরাতে নাইবার-খাবার সময় নেই, চারটে ডাক্তার য্যাসিস্ট্যাণ্ট। কিন্তু আমি ত ছেলেবেলা থেকে দেখছি, ইস্কুলে একেবারে গবেট ছাত্র ছিল। তখনকার দিনে ত মশাই বিজ্ঞান ফিজ্ঞান ছিল না—যা করে অঙ্ক, বড় জোর মেকানিক্স্। অঙ্কে ভাল মাথা ছিল ওর—কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বাংলায় পেত কেঁদে-ককিয়ে তিরিশ, আর ইংরেজিতে তের চোদ্দ। ওর বাবা দুটো মাস্টার রেখেছিলেন, তারা হিমসিম খেয়ে যেত। আমার বন্ধুর বাবা দুঃখ ক'রে বলতেন, আর সব ছেলেগুলো তবু সকাল-সন্ধ্যে দু'মুঠো খেতে পাবে—এইটেই হ'ল একেবারে বাঁদর।

ওর আর কিছু হবে না।…ও মশাই, কোনমতে ত অঙ্ক আর মেকানিক্‌স্‌-এর জোরে ম্যাট্রিকটা সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ করলে; ইণ্টারমিডিয়েটে গিয়ে একেবারে ফার্স্ট ডিভিসন, সায়ান্স আর অঙ্ক তিনটে সাব্‌জেক্টেই লেটার! ঢুকলো মেডিকেল কলেজে—ব্যস্‌ চড়চড় ক'রে উন্নতি, কোন পরীক্ষায় ফেল করে নি কখনও, ফাইন্যালে গিয়ে মেডিসিন আর একটা কিসে যেন ফার্স্ট হয়ে বেরোল। ওর মাথা বিজ্ঞানের দিকে, তাকে নর-নরৌ-নরাঃ মুখস্থ করালে চল্‌বে কেন বলুন!…আপনার এই ছেলেটি দেখবেন এর পর উন্নতি করবে!'

'তা ঠিক।' বিমলও স্বীকার করে, 'আমিও ত এই কথা বলি, জোর ক'রে গেলাতে গেলে ভাল জিনিষও বিস্বাদ লাগে। নিজে থেকে প্রয়োজন বুঝে এগোলে কত সুবিধে হয়।'

কিন্তু তাতে আসল সমস্যার কোন মীমাংসাই হয় না। আরও খানিকটা গল্প ক'রে বিমল উঠে পড়ে। নিখিল তখনও পৌঁছয় নি। সত্যশরণ বাবু লজ্জিত হয়ে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করেন, 'দেখুন ত এ কী কাণ্ড! আমার সম্বন্ধী এধারে এত রেস্‌পন্‌সিবিলিটির গর্ব করেন, অথচ দেখুন নিজের বেলায় কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। বার বার বলে দিলুম, মাস্টার মশাই এত কষ্ট ক'রে আসবেন—। আগে থাকতে বলা থাকলেও না হয় কথা ছিল। ছি ছি, আপনার কাছে বড় অপরাধী হয়ে রইলুম!'

'না-না, তাতে আর কি হয়েছে' ব'লে বিমল উঠে পড়ে, 'তবু ত আপনার সঙ্গে খানিক গল্প করা গেল, এটুকু ত হ'ত না। যাক্‌—কাল শনিবার আছে, নিজে নিজেই চালিয়ে নিতে পারবে 'খন নিখিল। আচ্ছা, আসি। নমস্কার।'

১৪

পথে বেরিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটছিল বিমল। পুলকের সমস্যাটাই মনে মনে ভাবছিল ব'লে, গতিও একটু মন্থর হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ কাঁধে একটা ভারী হাতের চাপড় খেয়ে চমকে ফিরে দেখলে—অপরিচিত একটি যুবক, প্রায় তারই সমবয়সী

মিশ-কালো রং, বেশ জোয়ান গোছের চেহারা। অতিশয় ময়লা একটা লং-ক্লথের পাঞ্জাবী পরা, হাতে একটা সিগারেট, ওর দিকে চেয়ে মুচকী মুচকী হাসছে।

হাসিটা দেখে চিনতে পারল, শিশির ভাদুড়ীর মত অনেকখানি বিস্তৃত নিঃশব্দ হাসি। এটা অনেক কষ্টে আয়ত্ত করেছিল মণি, স্কুলে পড়বার সময়ই।

মণি, ওদের সহপাঠী মণি ঘোষ।

'চিনতে পেরেছিস তাহ'লে। চল্ ঐ পার্কে গিয়ে বসি একটু। কতকাল পরে দেখা বল্‌ত।'

ওর চোখের চাউনীতে বিহ্বলতা কেটে গিয়ে বিস্ময় ফুটে ওঠা দেখেই মণি বুঝতে পারে যে বিমল তাকে চিন্‌তে পেরেছে। আগের মতই তীক্ষ্ণ-ধী আছে মণি। ছেলেবেলায় কোন কথা ওকে মুখে বলতে হ'ত না। মুখ দেখে অনুমান করত।

'উঃ সত্যিই রে মণি, কতকাল পরে বল্‌ত। চল্ চল্ বসি গে কোথাও।'

পার্কে গিয়ে খুঁজে খুঁজে বেঞ্চি পাওয়া যায় না, অগত্যা ঘাসের ওপরই বসে দুজন। মণি বলে, 'তারপর ?'

ঠিক বিদ্যুৎ বেগেই কথাটা মাথায় খেলে যায় বিমলের।

এ হয়ত ঈশ্বরেরই নির্দেশ। নইলে আট ন' বছর পরে মণির সঙ্গেই বা এমন অভাবনীয় ভাবে দেখা হবে কেন ?

মণি বিজ্ঞানের ছাত্র এবং বেশ ভাল ছাত্র। আই-এস-সি-তে একটা স্কলারশিপ পেয়েছিল। বি-এ-সিতে অনার্স ছিল, যদিও ফার্স্ট ক্লাস পায় নি। পায় নি তার চরম দারিদ্র্যের জন্যই। সকালে কলেজে আসত, ল্যাবরেটরীর কাজ সেরে বেরোতে সাতটা সাড়ে-সাতটা—তারও পরে টিউশনী ক'রে বাড়ী ফিরতে কোন-দিন সাড়ে নটা, কোনদিন দশটা হয়ে যেত। এর ভেতর শুধু জল ছাড়া আর কিছুই জুটত না। একদিন ক্ষিদেতে মাথা ঘুরে গিয়েছিল—ল্যাবোরেটরীর মধ্যেই। সেদিন প্রোফেসার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খুব তিরস্কার করেন। বলেন, 'এই দীর্ঘ সময় উপবাসী থাকলে কখনই ভাল কাজ করতে পারবে না। শরীরটা ভেঙ্গে যাবে। অবশ্যই কিছু খাবার ব্যবস্থা করবে। যা হোক—অন্তত চাট্টি মুড়িও।'

কিন্তু চাট্টি মুড়ি খাবার পয়সাও ওর ছিল না। সেটা তাঁকে বলাতে তিনিই একটা বেশী মাইনের টিউশনী ওকে যোগাড় ক'রে দেন। একটি স্কুলের ছাত্র—সত্তর

টাকা। তাতে অবশ্য সামান্য জল খাবারের ব্যবস্থা ক'রে নিতে পেরেছিল—কিন্তু তবু পরীক্ষার ফল ভাল হয় নি, টিউশনী ক'রে, ঘর সংসারের বাজার-হাট ক'রে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পাওয়া শক্ত। মণিদের দারিদ্র্য বিমলের চেয়েও বেশী—সমস্ত কলেজ জীবনে ওর বাইরে বেরোবার একাধিক কাপড় ছিল না। সেজন্য কোন রবিবার কোথাও বেবোতে পারত না। সাবান দিয়ে কাপড়-জামা কেচে—সারাদিন বাড়ীতে বসে থাকতে হ'ত। বর্ষাকালে আরও দুর্ভোগ। নিবস্ত উনুনের ধারে দাঁড়িয়ে নেড়ে নেড়ে শুকোতে হ'ত।

এর পর আর এম-এস-সি পড়া হয় নি। টিউশনী ক'রে সংসার চালিয়ে পড়া—এই রকমই ফল হবে! তাছাড়া সংসারের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। বাবা অশক্ত, মা পক্ষাঘাতে পঙ্গু। ছোট ছোট ভাই বোন। বাবা তাঁর শেষ ধূলি-গুঁড়ি ঝেড়ে ওর বড় বোনের বিয়ে দিয়েছিলেন, সে বিধবা হয়ে এসে উঠল তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে। স্বামী অফিসের তহবিল তছরূপ করেছিলেন—ফলে একদা তাঁকে গলায় দড়ি দিতে হয়। একটি পয়সাও ছিল না সঞ্চয়—যা ওর গায়ের গয়না কটা। দেশে কোথায় জঙ্গলের মধ্যে ভাগের বাড়ী আছে, ওর বোন দেখেও নি। শ্বশুর এবং দেওর স্রেফ্ সব দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিলে।

সুতরাং মণিকে চাকরী নিতে হ'ল। দেরি করার সময় ছিল না। পাড়ার এক ইস্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষকের চাকরী পেয়ে বেঁচে গেল। যুদ্ধের শেষের দিক সেটা—সরকারী চাকরীতে ছাঁটাইয়ের সময়। স্বাধীনতা পাবার পর হয়ত খোঁজ করলে সরকারী চাকরী পাওয়া যেত। কিন্তু তিনটে টিউশনী ও মাষ্টারী ক'রে উদ্যম থাকে না। দেখতে দেখতে বয়সও চলে গেল।

আগের দিকের খবর কতক বিমলের শোনা ছিল। শেষের দিকের খবরগুলো সংক্ষেপে দিয়ে মণি বললে, 'তোর কথা বল এবার।'

'আমার কথা? তথৈবচ।' ম্লান হেসে বিমল বললে, 'সাধারণ সরকারী চাকরীতে ঢুক্‌লেই বা এমন কি রাজা হতিস? আমি ত ঢুকেছি। চারটে হাত বেরিয়েছে? প্রস্‌পেক্টই বা এমন কি? সেই ত টিউশনী করতে হচ্ছে, আর হবেও। তার চেয়ে এ বরং ভাল আছিস। অখণ্ড অবসর। বছরে চার মাস ছুটি বলতে গেলে।'

মণি যেন মুহূর্তে জ্বলে ওঠে, 'বলিস্ নি! বলিস্ নি! হেলিশ!'

'হেলিশ বলছিস কেন?' একটু যেন আহত হয় বিমল, 'হাজার হোক ছোট ছোট ছেলেদেব সঙ্গ, তাব একটা আনন্দ আছে ত!'

'You are a fool!' যেন ঝেঁঝে ওঠে মণি, 'সেইটেই ত বেশী হেলিশ। mischievous imps—যত সব। এত বকমেব বজ্জাতি আর বদমাইসি জানে ওরা যে তা সব লিখতে গেলে একটা পুবো এনসাইক্লোপিডিয়াতেও কুলোবে না। ওদের সাহচর্যে আনন্দ! তুই বলিস কি? ছোট ছোট ছেলেপুলে দেখলে আমাব গায়ে জ্বর দেয়! দুচোক্ষে দেখতে পাবি না ওগুলোকে!·· ওটা তোদেব একটা ফ্যাশন। যীশুখ্রীষ্টেব বাপ-মা ভোলাবাব চাল—তাই থেকে যত বাজনীতিকরা এঁটে নিয়েছে। শুনেছি বিলেতে ইলেক্শনেব আগে যে ক্যাণ্ডিডেটেব বৌ যত বেশী ছোট ছোট বাচ্চাদেব চুমো খেতে পাবে তাব ইলেকশন্ জেতবাব তত চান্স। ও তুই নেহেরুই বলিস আব গান্ধীই বলিস—সব লোক-ভুলানো চাল। কেউ যে ঐ শয়তানগুলোকে সত্যিই ভালবাসতে পাবে, তা আমি আদৌ বিশ্বাস কবি না!'

চুপ ক'বে থাকে বিমল। কিছুক্ষণ পবে আস্তে আস্তে বলে, 'তাহ'লে তোব এ কাজ নেওয়া একেবাবেই উচিত হয় নি মণি।'

'তা ত হয়ই নি। কিন্তু কি কবব বল? সংসাব যে ঘাড়ে চেপে আছে সেই সিন্ধুবাদ নাবিকেব ঘাড়েব বোঝাব মত। আসলে কি জানিস্—মাস্টাবী কেবাণী-গিবি, কোনটাই আমাব ভাল লাগে না। আমাব যা ট্যালেণ্ট, অভিনয়ে—সেদিকে যদি কোন একটা চান্স্ পেতুম বে।'

বলতে বলতেই বোধকবি কল্পনায় সেই সুখ-ছবি দেখে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মণিব মুখ, সে কণ্ঠে একটু জোব দিয়েই বলে, 'একটা কোথাও যে কোন বকমেব চান্স্ পেলে আব আমি কোন স্কুপাবিশেব তোয়াক্কা কবতুম না।···আছে নাকি তোব ও পাড়ায় কোন যোগাযোগ? বিস্তব ত ফিল্ম্ কোম্পানী হচ্ছে চাবদিকে, কাকুব সঙ্গে কোন আলাপ পবিচয় নেই?'

'তুই পাগল হয়েছিস? আমাব মত লোকেব সঙ্গে ঐ লাইনেব যোগাযোগ?'

'না—তা নয়। থাকতেও ত পাবে। আত্মীয়তাসূত্রেও থাকে অনেক সময়ে—!'

উৎসাহ কতকটা নিভে আসে মণিব। একটু থেমে আবাব সে বলে, 'আমি

সোজা গিয়েছিলুম দু একজনের কাছে। আমল দিতে চায় না। একজন খুব ভদ্র, তিনি বুঝিয়ে বললেন, 'দেখুন আপনার যা ফিগার আর ফেস্ কাটিং তা স্টেজে হয়ত চলে, ক্যামেরাতে চলবে না। মানে হিরো কবা চলবে না আপনাকে। ছোট খাটো সাইড-রোল পেতে পারেন কিন্তু তাতে আজকাল সংসার চালানো শক্ত। আর কমিক পার্ট ত কবেনও নি কখনও। সে কি পাববেন ?·· অগত্যা চলে এলুম। আমার প্রতিভা আমি দুশ তিনশ-ফুটের সাইড-বোলে নষ্ট কবতে রাজী নই।···সত্যিই কি আমাব দ্বাবা হিবো সাজা চলবে না ?'

কণ্ঠে অনুনয়ই ফোটে মণিব।

বিমল ভালো ক'বে তাকিয়ে দেখে। কুচকুচে কালো বং—কিন্তু তাতে কিছু এসে-যেত না, চোখ দুটোও অসম্ভব ছোট। ফিগাবও ভাল না—একটু বেঁটে আব চোকো গোছেব। বলতে মাযা হ'ল কথাটা। সে চুপ ক'বেই বইল।

মণি আবাবও বললে, 'থিযেটাবে চলে। ভালই চলে। জানিস ত, শিশিব ভাদুডী আব দানী বাবুব বোল সব একচেটে আমাব। বহু অফিস ক্লাবেব হযে প্লে ক'রে আসি পাবলিক বোর্ডে—সবাই ধন্য ধন্য কবে। এব মধ্যে একদিন প্রায় হাতে পাযে ধবে শিশিব বাবুকেও দেখিযেছিলুম—ওঁবই বোর্ডে প্লে ছিল একটা অফিসেব, আমি সেজেছিলুম আলমগীব। উনি দেখে-শুনে বললেন, আপনাব সত্যিই খুব ট্যালেন্ট আছে। আমি নিতে পাবি আমাব দলে কিন্তু টাকা-কডি বিশেষ পাবেন বলে মনে হয না। বুঝতেই ত পাবছেন এখন স্টেজেব অবস্থা—পযসা সব ফিল্ম্ লাইনেই চলে গিযেছে। ফিবে এসে ইস্কুলেব সেক্রেটাবীকে জিজ্ঞাসা কবলুম, তিনি একেবারে সোজা এম্ফ্যাটিক 'নো' বলে দিলেন। পাবলিক স্টেজে প্লে কবলে অন্তত তাঁর ইস্কুলে মাস্টাবী কবা চলবে না। কী কবি বল। মাস্টাবী আব টিউশনী মিলিযে যা আয তাইতেই সংসাব চলে না—তাব থেকেও যদি কম পাই ত চালাবো কি ক'বে ?'

বিমল একটুখানি চুপ ক'বে থেকে প্রশ্ন কবলে, 'বিয়ে কবেছিস বুঝি ?'

'পাগল হযেছিস তুই ! বিধবা বোন—তাব তিনটে ছেলেমেয়ে। এখনও দুটো ভাই-বোন ইস্কুলে পডছে। তাছাডা—মা আবাব বিধবা বোন, তাব ভেতর বৌ এনে ঢোকালে অশান্তিতে একদিনও টিকতে পারব না। আইবুডো বোনের সঙ্গে

বৌদিদের তবু বনে—কারণ তাদের জীবনে ভবিষ্যতের আশা আছে। বিধবা বোন বাড়ী থাকলে কারুর বিয়ে করা উচিত নয়!'

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ-চাপ বসে থাকে। রাস্তার কোলাহল কমে আসছে। পার্কও জনবিরল হয়ে আসছে ক্রমশ। একসময় মণি বলে ওঠে, 'আরও একটা টিউশনী ছিল। তা আজ আর হ'ল না। সিগারেট খাবি একটা?'

'না। ওটা এখনও ধরিনি।'

'এখনও তেমনি গুড়ি-গুড়ি রয় আছিস!'

'তা হয়ত ঠিক নয়। অতটা বাজে খরচের অবস্থা নেই।'

'এটাকে বাজে খরচ বলিস নি বিমু। সকাল সাড়ে ছটা থেকেই প্র্যাক্টিক্যালি গাধা পিটোনো শুরু করি—রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত। মধ্যে কতটুকুই বা ফাঁক মেলে? একটা কোন নেশা না হ'লে পারব কেন?'

'আমার খাটুনী কি ওর চেয়ে কম মনে করিস?'

'না, তবু বৈচিত্র্য আছে। দুপুরটা বকতে হয় না—কলমপেশার কাজ। আমাদের যে একঘেয়ে কাজ।'

'তোদের তবু একটা সান্ত্বনা আছে—তোরই দেশের কতকগুলো ছেলেমেয়ে তোদের হাতে মানুষ হচ্ছে।'

অকস্মাৎ চারিদিকের লোকজনকে সচকিত ক'রে পার্ক কাঁপিয়ে হো হো ক'রে হেসে ওঠে মণি। অতিকষ্টে অনেকক্ষণ পরে হাসি থামিয়ে বলে, 'What next! আমরা ছেলে মানুষ করি? ছ্যাগ, ডাক্তাররা যেমন মনে মনে জানে যে রোগী ভাল হওয়ায় আসলে তাদের কোন কৃতিত্ব নেই—রোগী আপনিই ভাল হয়, তারা করে না—তেমনি মাস্টারেরাও জানে যে ছেলেমেয়ে মানুষ হওয়ায় তাদের কোন হাতই নেই। কেউ কেউ তবুও মানুষ হয়—সে শুধু তাদের বরাত আর জন্মগত কতক-গুলো ফ্যাকাল্টি। পড়ানোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তাহ'লে একই ইস্কুল থেকে বছর বছর ফার্স্ট হ'ত।

'তা না হোক্, তবু কোন কোন ইস্কুলে কি বছরই মোটামুটি ভাল রেজাল্ট্ হয় ত!'

'হ্যাঁ—তা হয়। তবে একটু লক্ষ্য করলে দেখবি যে সে-সব ইস্কুল বা কলেজে বাছাই-করা ছেলেরাই শুধু যায়। আবার সেগুলো বড়লোকের ইস্কুলও বটে, সেখানে যারা পড়ে তাদের বাড়ীতে প্রায় সবাইকারই দুটো তিনটে ক'রে মাস্টার।'

বিমল তর্ক করে কতকটা যন্ত্রের মতই। বলে, 'কেন পূর্ণ মাস্টার মশাইএর মত মাস্টারও ত আছেন দু-চার জন।'

'ছিলেন। এখনও আছেন কি?' মণির কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ শোনায়, 'থাকলে ভালই। কিন্তু আমি ত দেখি না। কোথায় আছে। কে জানে।'

তারপর বিমলের কাঁধে একটা হাত রেখে সে বলে, 'একদিন আমাদের ইস্কুলের টিচার্স কমন রুমে গিয়ে বসলেই টের পেতিস—আজকালকার মাস্টার মশাইদের মনোভাব কি! দিনগত পাপক্ষয় শুধু! তাঁরা সব কথা আলোচনা করেন—ইউনিয়ন, অ্যাসোসিয়েশন, পলিটিক্স, সংসার, চালডাল, নেহেক গবর্ণমেণ্টকে গাল দেওয়া—এভ্রিথিং বাট দেয়ার ওন্ ডিউটি। পড়াশুনো কেমন হচ্ছে ছেলেদের, কী করলে ইম্প্রুভমেণ্ট হয়, কোন থিওরীতে কি বলে—এসব কথা, যদি সাতদিন পর পর গিয়ে সারাদিন ধ'রে বসে থাকিস, তাহলেও কারুর মুখে কোনদিন শুনতে পাবি না।'

বোধ হয় দম নেবার জন্যই কয়েকমুহূর্ত থেমে মণি আবার বলে, 'শুনবি তবে? আমাদের হেড মাস্টার মশাই আড়াই শ' টাকা মাইনে পান, এ ছাড়া অ্যালাউন্স ফ্যালাউন্স ত আছেই। এ অঞ্চলে খুব কম ইস্কুলের হেড্‌মাস্টারেরই এত বেশী মাইনে আছে। কিন্তু তবু তাঁর তাতে পোষায় না। তাঁর বইয়ের ব্যবসা আছে ভাগ্নের বেনামীতে, কিছু কিছু আমদানী রপ্তানীর কারবারও করেন। তাঁর নিজের নামে কতকগুলো লাইসেন্স আছে। এ ছাড়া বিস্তর পাব্‌লিশারের পাঠ্য বই লিখেছেন—কতক নিজের নামে বেরোয়, কতক অপরের নামে। মোটা টাকায় কপিরাইট বেচে দেন। তারা ভাবে এত বড় একটা ইস্কুলের একজন এক্স্‌পিরিয়েন্সড্ হেড্‌মাস্টার বই লিখছেন—বেশী দাম দিলেও ক্ষতি নেই। অথচ বই-গুলো লেখেন আমাদের ফণীবাবুতে আর অটলবাবুতে। তাঁরা যৎসামান্যই পান। ইস্কুলে এসেও তাঁদের অধিকাংশ দিন ঐ সব কাজ নিয়ে থাকতে হয়, গাদাগাদা প্রুফই দেখেন বসে বসে, ফলে ক্লাস নেওয়া হয় না বেশীর ভাগ দিনই। সময়

কোথা ? সে ক্লাসগুলো হেড্‌মাস্টার মশাই স্থকৌশলে চালিয়ে দেন এর-ওর ঘাড়ে। আমাদেরও নিতে হয়। জেনে শুনেই নিই। জলে বাস ক'রে কুমীরকে চটাবে কে ? চাকরী করতে হবে যখন—তখন ওপরও'লাকে চটিয়ে লাভ নেই। আমাদের সেকেণ্ড টিচার অপরেশ বাবু নাকি পাঁচটা টিউশনী করেন—সকালে তুটো, বিকেলে তিনটে। শৈলবিহারী বাবু সকালে কোন্ এক বড়লোকের বাড়ী টিউশনী করেন--কোন্ এক বিখ্যাত গয়নাও'লার ফ্যামিলি টিউটর। থাকেন শহরতলীতে —ছটায় বেরিয়ে আসেন। পড়ানো সেরেই ইস্কুলে আসেন—ইস্কুল শেষ হ'লে ওই ইস্কুলেরই একটা ঘরে কোচিং ক্লাস নেন। তিন শিফ্‌ট্। খাবার চাকর দিয়ে যায়। টিফিনের সময় কমন-রুমে বসে খেতে হয়। অপরেশ বাবু ত এসেই নাক ডাকান রীতিমত। ক্লাসে গিয়ে এঁরা সকলেই ঢোলেন। বিশ্রাম চাই ত—সে বিশ্রামের আর অবসর কৈ ? ইস্কুলের ছাত্ররা শোনে—প্রাইভেট ছাত্ররা শুনবে কেন ?'

বিমল বোকার মত প্রশ্ন করে—'কর্তৃপক্ষের কানে এ সব কথা কি ওঠে না !'

'উঠবেনা কেন ? তারাই বা কি করবেন ! যে আসবে লঙ্কায় সেই হবে রাবণ। তাছাড়া—খুব দোষ দেওয়াও যায় কি এদের ? কী আয় সেটা ত দেখতে হবে ! দারিদ্র্য দোষঃ গুণরাশি নাশি।'

এবার বিমলের উত্তপ্ত হবার পালা। সে বললে, 'বাজে কথা বলিস নি মণি। এখনকার মাস্টার মশাইদের যা আয় তার চার ভাগও ছিল না আগে।—কিন্তু তখনকার দিনের এক একজন শিক্ষকের কথা মনে ক'রে ছাখ্ দিকি। অত কথায় দরকার কি, আমাদেরই দেখা পূর্ণ মাস্টার মশাইয়ের কথাটা ভেবে ছাখ্ না। তাঁর কি আয় ছিল ? কিন্তু তিনি কি কোনদিন ফাঁকি দিয়েছেন ? তোদের ঐ শৈলবিহারী বাবুকে আমি চিনি। ঢাকুরে একখানা দমদমে তুখানা বাড়ী করেছেন উনি। মাসিক বারোশ' টাকা ওঁর আয়—গর্ব ক'রে বলেন উনি ওঁর শ্বশুর বাড়ীতে। আমাদেরই পাড়ায় ওঁর শ্বশুর বাড়ী। ওঁর কি এখনও এত অভাব আছে যে উদয়াস্ত খাটতে হবে ? ঐ অপরেশ বাবুর কত আয় খোঁজ করিস ত ! অভাব নয় বন্ধু স্বভাব ! তোমাকে এখন আড়াই শ' টাকা মাইনে দিলেও তুমি এর চেয়ে মন দিয়ে পড়াবে না। ঐ ছেলেগুলোকে তখনও তেমনি মিস্‌চিভাস্ ইম্প্ মনে হবে। আগে যাঁরা মাস্টারী করতেন তাঁরা দারিদ্র্য জেনেই আসতেন। আর তার জন্য তাঁদের কাজে

ফাঁকি দেবার অধিকার জন্মেছে এ কথা কখনও মনে করতেন না। অথবা তার জন্য রাস্তায় বসে ধর্মঘট করা যায়—একথাও ভাবতে পারতেন না। তাঁরা স্বর্গে গেছেন, এখানকার খবর সেখানে পৌঁছনোর উপায় আছে কিনা জানি না—কিন্তু মাস্টার মশাইরা স্লোগান দিয়ে রাস্তায় মার্চ করছেন আর ধর্মঘট করছেন জানলে তাঁরা সেখানে থেকেও শিউরে উঠবেন।'

'তা আর কি করা যাবে। স্ট্রাগ্‌ল্ ফর একজিস্টেন্স্। বাঁচতে হবে ত!' বিরসকণ্ঠে বলে মণি।

'তা নয় বন্ধু। এর সবটাই নির্ভর করে তুমি কাকে বাঁচা বলো তার ওপর। দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য আর সুখের শেষ নেই। ওর কোন সীমাও নেই। কর্তব্যজ্ঞান আলাদা বস্তু। তখনকার দিনের সে শিক্ষকরাও বেঁচে গেছেন,—সসম্মানেই। মনে আছে পূর্ণ মাস্টার মশাইয়ের এক ছাত্র আই-সি-এস হয়েছিলেন? সতেরো বছর পরে কি একটা কাজে তিনি ঐ পাড়ায় এসেছিলেন, পথে দেখা হয় পূর্ণ মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে। উনি তখন বাজার ক'রে ফিরছেন—খালি পা, এক পা কাদা। সে ভদ্রলোক গাড়ী থামিয়ে রাস্তার মাঝখানে ঐ কাদামাখা পায়েই হাত দিয়ে প্রণাম করলেন যখন, তখন আমি সেখানে দাঁড়িয়ে। সে যা অনির্বচনীয় তৃপ্তির হাসি দেখেছিলাম ওঁর মুখে, তা আর কোন দিন ভুলব না। ছাত্রটি তখন হাজার দুই টাকা মাইনে পান—ভারত সরকারের এক বিশিষ্ট কর্মচারী। কোন স্বাচ্ছন্দ্য বা বিলাসের উপকরণ পেয়েই ও হাসি ফুটত না তোমার মুখে।'

কথাগুলো বোধ হয় মণির মনে লাগল না। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে সে একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'চল্—ওঠা যাক।'

বিমল ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওর হাত ধরে একরকম জোর ক'রেই বসিয়ে দিলে। 'ওরে বোস বোস—আর একটু। তোর সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।'

'কি কথা বল্ ত? ব্যাপার কি?' বিস্মিত হয়ে তাকায় মণি, 'এতকাল ত মনেই ছিল না আমাকে। অথচ এখনই এমন কি দরকারী কথা মনে পড়ে গেল?'

'বলছি। মন দিয়ে শোন্।'

ধীরে ধীরে—বেশ একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই—পুলকের কথাটা খুলে বললে বিমল। সঙ্কোচ এই জন্যে যে—মণির মনোভাবের যে পরিচয় এতক্ষণ সে পেলে তাতে

কথাটা না বলাই উচিত। এতক্ষণ কতকটা সেই কারণেই কথাটা পাড়ে নি—অনেকক্ষণ মনের অবচেতনে লড়াই করেছে সে নিজের সঙ্গে। অথচ না বললেও নয়, এমন সুযোগ হয়ত আর আসবেই না।

সব কথা শুনে মণি একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে বললে, 'তা আমাকে কি করতে হবে?'

'রবিবার ক'রে মধ্যে মধ্যে এক-আধ-দিন যদি একটু আধটু সময় দিতিস—ও তোর বাড়ীতে গিয়ে বুঝে আসত। পারবি না? এ একটা স্পেশ্যাল কেস্ ব'লেই বলছি, আর বড় বিচিত্র কেস্।'

মণি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে কি ভাবল। বললে, 'সপ্তাহে একটা দিন ছুটি, তাও বিকেলের দিকে কোথাও না কোথাও রিহার্স্যাল থাকেই। এক সকালটা। আবার বই-খাতা নিয়ে বসা—ভাবলেই গায়ে জ্বর দেয়। তাছাড়া ও-সব পড়া ত ভুলতেই বসেছি। হাউ এভার, তোর কথা শুনে আমারও একটু কৌতূহল হচ্ছে। সত্যিই স্ট্রেঞ্জ কেস্। আচ্ছা, আসছে রবিবার তোর বাড়ীতে যাবো। আমার ভাই দুখানা ঘরে বাস—শোবার জায়গা, তাই মেলে না। ওখানে বসে পড়া হবে না। আমিই যাবো। তবে প্রত্যেক রবিবারে নয়, এক হপ্তা অন্তর। কিম্বা মধ্যে অন্য ছুটি পড়লেও যেতে পারি। খুব ছোট ছেলে নয়, এই একমাত্র সান্ত্বনা, তা' ছাড়া সাযান্সে এখনও একটু ইণ্টারেস্ট আছে। এই জন্যই রাজী হচ্ছি!'

'বহু ধন্যবাদ। বাঁচালি ভাই।' বিমল ওকে একেবারে জড়িয়ে ধরে।

দুজনে উঠে রাস্তায় এসে পড়ে। মণি ওর সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে যায়। বিদায় নেবার মুখে বলে, 'আমার কথাটা মনে রাখিস একটু—বলা ত যায় না—যদি কোন যোগাযোগ হয়ে যায় কোন ফিল্ম্ কোম্পানীর সঙ্গে। কমিক পার্ট নেবো না—সিরিয়াস পার্ট, মানে কাজ দেখাবার মত যদি কিছু থাকে ত—ছোট পার্টও নিতে রাজী আছি। বুঝলি?

যেতে যেতেও আর একবার ফিরে দাঁড়ায়।

'সামনের শুক্রবার স্টার বোর্ডে একটা অফিস ক্লাবের প্লে আছে, আমি নামব। আয় না, কেমন করছি আজকাল—দেখে যাবি।'

বিমলের আদৌ উৎসাহ ছিল না। কিন্তু মণির মুখের দিকে চেয়ে আর 'না'

বলতে পারলে না। বললে, 'নিশ্চয়ই যাবো। কিন্তু ঢুকতে দেবে ত?'

'আলবৎ দেবে। কার্ড পাঠাবো। হ্যাঁ—তোর ঠিকানাটা? আসলেই যে ভুল হয়ে যাচ্ছিল।'

পকেট থেকে একটা কাগজ বার ক'রে রাস্তার আলোতে দাঁড়িয়েই ঠিকানাটা লিখে দিলে বিমল।

১৭

অফিসে পা দিতেই খবর দিলেন এক সহকর্মী, 'শুনেছেন বিমলবাবু, খবরটা?'

'কি জানি। কী খবর বলুন ত?' কতকটা নিরাসক্ত-কণ্ঠেই উত্তর দেয় বিমল। এঁদের খবরের ওপর ওর কখনই খুব আস্থা নেই। অত্যন্ত তুচ্ছ কথাতেও এঁরা উত্তেজিত হন।

'জোর খবর। জয়ন্তী চৌধুরী বিয়ে করছেন।'

'ও, এই খবর।'

'আরে শুনুনই শেষ পর্যন্ত। বরটি কে জানেন কি? আমাদের শশিবাবু। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব স্বয়ং।'

এবার, অন্তত মনে মনেও, বিমলকে মানতে হ'ল যে খবরটা জোরই বটে। শশিবাবুর মোট দুটি-বছর আর আছে চাকরীর, অর্থাৎ সরকারী ভাবেই তিপ্পান্ন বছর বয়স হয়েছে। হয়ত আসল বয়সটা আরও বেশী। সম্প্রতি বছর-খানেক আগে বিপত্নীক হয়েছেন। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। বড় ছেলেটি এম-এ পাশ ক'রে চাকরীতে ঢুকেছে—সেও আজ বছর-কতকের কথা।

আর জয়ন্তী চৌধুরী?

ওদের অফিসের সবচেয়ে সুশ্রী মেয়ে ত বটেই, সবচেয়ে শৌখিনও। ভাল দামী প্রসাধন-সামগ্রী ছাড়া ব্যবহার করে না, নিত্য নূতন শাড়ী পরে অফিসে আসে। রুচিজ্ঞান প্রখর—সে সম্বন্ধে প্রায়ই উপদেশ দেয় সহকর্মিনীদের। ফুরফুরে মেয়ে

জয়ন্তী, দেখলেই মনে হয় লতার মত ভঙ্গুর ও কোমল, প্রজাপতির মত সুখবিলাসী।

সেই জয়ন্তী বিয়ে করেছে শশিবাবুকে?

মুখ দিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা—'যোগাযোগটা হ'ল কী ভাবে? বাপ-মা—?'

'ক্ষেপেছেন আপনি? ঐসব মেয়ে বাপমার তোয়াক্কা রাখে? নিজে-নিজেই সম্বন্ধ করেছেন ঠাকরুণ।··কদিন ধরেই শুনছি অফিসের পর শশিবাবুর সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছে, একদিন আমার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল, নিউ এম্পায়ারের বক্সে বসে দেখছেন ওরা দুটি। মানে আরও দুখানি টিকিট কিনে নষ্ট করেছেন শশিবাবু। তারপরে এই খবর একেবারে। পাবেন, পাবেন—আপনিও খবর পাবেন। শুনছি পার্টি দেবে গ্রেট-ইস্টার্নে।'

বিমল আর কথা না বাড়িয়ে নিজের সিট্-এ গিয়ে বসল।

কিন্তু তখনই কোন কাজে মন দিতে পারলে না। বাংলা দেশে—শুধু বাংলা দেশে কেন -সব দেশেই এমন হাজার হাজার মেয়ে চিরকাল প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের লালসার খোরাক হচ্ছে—কিন্তু সে বাধ্য হয়েই। প্রয়োজনে—বাপ-মায়ের অভাবের তাড়নায়। কিন্তু জয়ন্তীর কি এমন দরকার পড়ল? সে নিজে চাকরী করে, দেখতেও সুশ্রী। তার ত কোন প্রয়োজন ছিল না এত তাড়াতাড়ি ঐ বৃদ্ধের কাছে আত্মসমর্পণ করার। শশিবাবু, রোগা একহারা শ্যামবর্ণ—নিতান্তই শ্রীহীন চেহারা। একটাও দাঁত নেই—বাঁধানো পাটি দুটোও খাপ্ খায় নি ঠিক, কথা বলবার সময় অনবরতই মনে হয় খুলে পড়ে যাবে। সেজন্য একটা বিশ্রী শব্দ হ'তে থাকে, কতকটা হাঁসের প্যাঁক-প্যাঁকানির মত। তার পাশে জয়ন্তী—ছিঃ।

বিমল জোর ক'রে পাশের লাল-পেন্সিল-চিহ্নিত ফাইলটা টেনে নিলে।

কিন্তু এ-ই বা তার অকারণ কী চিত্তক্ষোভ। বিমলের নিজেরই হাসি পেল খানিক পরে। তার এতে আপত্তির আছেই বা কি? যার সব চেয়ে আপত্তি করবার কথা, সে যদি নিজেই এ কাজে অগ্রণী হয়ে থাকে ত কার কি বলবার আছে। এ গায়ের জ্বালার কি তাহ'লে এই অর্থ যে জয়ন্তী চৌধুরী সম্বন্ধে তার নিজেরও কিছু দুর্বলতা ছিল?

না-না। প্রবলবেগে ঘাড় নাড়ে বিমল নিজের মনেই। ঐ ধরণের প্রজাপতি-মার্কা মেয়েদের ঘৃণাই করে সে। যা খুশী করুক জয়ন্তী চৌধুরী—তার কি ?

বিমল জোর ক'রে ফাইলে মন বসায়।

অফিস বসবার পুরো পঁয়তাল্লিশটি মিনিট পরে পূর্ণিমা এসে পৌঁছল।

দরদর ক'রে ঘামছে সে। ঘামে ওর গোটা ব্লাউজটাই ভিজে উঠেছে, ছোট্ট একটুখানি মেয়েলি রুমাল সপ্‌সপ্‌ করছে ভিজে। আসনে বসে সেটাতে একবার মুখ মোছবার বৃথা চেষ্টা ক'রে সে সোজাসুজি আঁচলেই মুখ এবং গলা মুছে নিলে।

সেদিকে চেয়ে কী একটা বলতে গিয়েও চেপে গেল বিমল। মনে হচ্ছে বেচারী যেন ছুট্‌তে ছুটতে এসেছে। এর পর আর কিছু বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু সে কিছু না বললেও পূর্ণিমা তার অকথিত প্রশ্নেরই জবাব দিলে, 'আজও লেট—এই বলবেন ত। পর পর তিন দিন লেট্‌ হয়ে গেল। কিন্তু কী করব, মাথা খুঁড়ে মরা ছাড়া ত আর কোন উপায় দেখছি না। আজও বাবার এমন বাড়াবাড়ি—এক হাতে রান্না করা, ডাক্তারের বাড়ী যাওয়া—সব। ডাক্তার এনে ইন্‌জেকশন্‌ দিইয়ে তবে বেরোতে পারলুম। স্নান বা খাওয়ার কোন চেষ্টাই তবু করি নি। কিন্তু হ'লে কী হবে, ডাক্তারও বিজি, নটার পর তিনি এলেন। তাও আমার প্রতি দয়া ক'রেই। বাস এবং ট্র্যাম—কোনটাতেই উঠ্‌তে পারলুম না, সে-ও মিনিট দশেক বৃথা কেটে গেল। তারপর সোজাসুজি হেঁটেই—প্রায় ছুট্‌তে ছুটতে আসছি। আর কি করতে বলেন আপনি ?'

কণ্ঠে যেন তার রীতিমত অভিযোগ।

'আমি কিছুই করতে বলি না মিস্‌ রায়—আর বলবই বা কেন ? ওপরও'লারা কিছু না বললেই হ'ল! ·'

'সে ত তাঁরা বলবেনই। নিত্যই বলছেন। কিন্তু কী করি আমি। কোনমতে মরতে পারতুম ত বেশ হ'ত!'

দুই চোখে তার জল ভরে আসে।

সেদিকে চেয়ে বিমল যেন হঠাৎ একটু কোমল হয়ে আসে। কথাটা ঘুরিয়ে

দেবার জন্যই বলে, 'এদিকে খবর শুনেছেন—আপনার এক সহকর্মিনীর বিয়ে ?'

'কার—জয়ন্তীর নাকি ?' সামান্য একটু কৌতূহল কণ্ঠে ফুটলেও চমকে ওঠে না সে। বরং বেশ স্বাভাবিক সুরেই বলে, 'শশিবাবুকে গেঁথে তুলল শেষ পর্যন্ত। না কি আর কেউ ?'

'শশিবাবুর সঙ্গে ব'লেই ত শুনলুম। আপনি জানতেন নাকি ?'

'হ্যাঁ। ও ত আমরা কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি। আপনি শোনেন নি ?'

'না। কিন্তু মাপ করবেন—অপরের ব্যাপারে নাক-গলানো হয়ত অন্যায় —but why শশিবাবু ?'

'তাছাড়া উপায় কি ছিল বলুন ? মানুষটা একটু শৌখিন—দেখেছেন ত ? বিলাস ভালবাসে বললে ভুল হবে—বিলাস এখন ওর প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। ওর বাবা ছিলেন বড় অফিসার, মেয়েকে সেই ভাবে মানুষ করেছিলেন। ছোট বেলা ওর জন্যেই তাঁর দুশ' আড়াইশ' টাকা খরচ হ'ত। ঝপ্ ক'রে মারা গেলেন ভদ্রলোক—একটি পয়সা রেখে যেতে পারেন নি, উল্‌টে বিস্তর দেনা রেখে গেছেন। একটি ভাই আছে, সেও সবে চাকরীতে ঢুকেছে। ছোট সংসার—কোনমতে চলে যায় তাই, কিন্তু ভাল দেখে বিয়ে হবে সে আশা কম। কে বিনা পয়সায় করে বিয়ে করবে—তাই ব'লে বসে থাকবে কতদিন। কে-ই বা উদ্যোগী হয়ে দেবে বলুন ? এক এই অফিসের কোন ছেলে জুট্‌তে পারত কিন্তু তাতে ওর পোষাত না। সে-ই ত দারিদ্র্য। চাকরী ও করতে চায় না কোনদিনই। তার ওপর ওর চাই এক গাদা হাত-খরচ। শশিবাবু ছাড়া অপর কে সে খরচ জোগাবে ? শশিবাবুর শুনেছি পৈতৃক দু-তিনখানা বাড়ী আছে কলকাতাতে। টাকা-পয়সাও আছে ঢের। এ চাকরী করেন উনি কতকটা শখ ক'রেই।'

বিমল স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

বিস্ময়ের বুঝি শেষ নেই। জয়ন্তী চৌধুরী যা করেছে, পূর্ণিমা রায় তা সমর্থনই করছে—বরং বলা চলে জয়ন্তীর হয়ে ওকালতি করছে।

'কিন্তু কিন্তু তাই ব'লে শশিবাবু ! Old enough to be her father ! কোন তরুণ ছেলে, মনের মত ছেলের সঙ্গে দারিদ্র্য ভাগ ক'রে নেওয়াও কি এর চেয়ে ভাল ছিল না ?'

একটু চুপ ক'রে থাকে পূর্ণিমা, ব্লটিংটার ওপর কলম বোলায় অন্যমনস্ক ভাবে। তারপর বলে, 'আমরা মেয়েরা সাংসারিক বিষয়ে ঢের বেশী প্র্যাক্‌টিক্যাল—তা জানেন ত ? আমার মনে হয় জয়ন্তী ভালই করেছে। রোম্যান্টিক একটা কিছু করতে গেলে ভুলই করত। কিন্তু ঐ সে নিজেই আসছে—'

বিমল তাড়াতাড়ি মুখ তুলে তাকাল। সত্যিই জয়ন্তী আসছে। সাদা মূল্যবান ঢাকাই সাড়ী এবং উৎকৃষ্ট প্রসাধনে ফুটন্ত পদ্মফুলের মতই দেখাচ্ছে তাকে। কিন্তু কাছে আসতে এটাও চোখে না পড়ে উপায় থাকে না—ঐ সমস্ত প্রসাধন আর বেশভূষার মধ্যে আসল ফুলটি যেন কিছু ম্লান। জয়ন্তীর চোখ-দুটোতে কেমন একটা অস্বাভাবিক রকমের দৃষ্টি, কিছু উদ্ধত- কিছু অশ্রুভারনত। মুখেচোখেও অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ। অহরহ যেন সে কার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে চলেছে—সেই সংগ্রামেরই ক্লান্তি তার সর্বদেহে—উদ্ধত স্পর্ধা তার দৃষ্টিতে।

জয়ন্তী চৌধুরী সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যত বিরূপ মনোভাবই থাক্—এই মুহূর্তে ওর মুখের দিকে চেয়ে বিমল একটা বেদনা এবং সহানুভূতি বোধ না ক'রে পারল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে তার স্বভাব-বিরুদ্ধ একটু কোমল-কণ্ঠেই অভ্যর্থনা জানাল, 'আসুন আসুন মিস্ চৌধুরী। শরীরটা খারাপ নাকি আপনার ?'

জয়ন্তী ওর পাশের চেয়ার-খানাতে এক রকম ধপ্ ক'রেই বসে পড়ে। তারপর ভূমিকা-মাত্র না ক'রেই বলে, 'শুনেছেন ত সব ? আমার বিয়ে।'

'হ্যাঁ, একটা কানা-ঘুষো শুনছিলাম বটে। অস্বীকার ক'রে কোন লাভ নেই। যাই হোক্—let me congratulate you first !'

সেই আধা-স্পর্দিত আধা-ছলোছলো চোখ-দুটো তুলে তাকায় জয়ন্তী ওর মুখের দিকে, খাপছাড়া ভাবে বলে, 'আর—আর আমি পারছিলুম না, এই ড্রাজারী আর পোষাচ্ছিল না আমার। সে ক্ষেত্রে কীই বা করতে পারতুম! মুক্তির ত আর কোন উপায়ই দেখলুম না। অন্যায় করেছি কি ?'

'অন্যায় করবেন কেন মিস্ চৌধুরী। যাকে ভাল লেগেছে তাকে বিয়ে করছেন। এর মধ্যে অন্যায় আর কি আছে ? এটা নিতান্তই আপনার ব্যক্তিগত পছন্দের কথা। তবে যদি নিজের মনের সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'রে থাকেন ত সে আলাদা কথা।'

'তাই বা কেন? কিসের আলাদা কথা? আত্মরক্ষার জন্য সব কিছুই করা যায়—এমন কি আত্মপ্রবঞ্চনাও।'

একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই বলে জয়ন্তী। তারপর বোধ করি উত্তর এবং সেই সঙ্গে সমর্থনেরও আশায় ব্যাকুল হয়েই চায় ওর মুখ পানে।

বিমল এসব প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে মুখে একটু আনন্দ টেনে আনবারই চেষ্টা করে, 'তা শুভ-কার্যটা কবে?'

জয়ন্তী মাথা নামিয়ে বলে, 'রেজেস্ট্রী হয়ে গেছে গত শুক্রবারই। আসছে শনিবার একটা পার্টি দিচ্ছি গ্রেট-ইস্টার্নে। যাবেন কিন্তু।'

সে ব্যাগের মধ্যে থেকে কতকগুলি দামী বিচিত্র বর্ণে মুদ্রিত কার্ড বার করলে।

'তুইও যাস ভাই পূর্ণিমা।'

'অবশ্য যাবো।' বিমল বলে, 'কিন্তু দামী উপহার যদি না দিতে পারি ত ক্ষুণ্ণ হবেন না।'

'ছি ছি! কী যে বলেন! কী আনন্দের কাজ যে দামী উপহার দেবেন!'

ব'লে ফেলেই যেন চমকে ওঠে একটু - চুপ ক'রে যায় সে।

পূর্ণিমা এতক্ষণ একেবারে চুপ ক'রে ছিল। এবার সে আস্তে আস্তে বললে, 'শশিবাবুর ত ও-পক্ষের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আছে শুনেছি—যে জন্যে একাজ করলে জয়ন্তী দি—'

জয়ন্তী নড়ে চড়ে বসে একটু। তারপর গলাটা নামিয়ে বলে, 'কারুর ওপরই কোন অবিচার হ'তে দিই নি, সেই সঙ্গে নিজের ওপরেও না। উনি আগের ছেলেমেয়েদের কতক কতক বিষয় ভাগ ক'রে, একেবারে লেখাপড়া ক'রে দিয়েছেন। আমার ওপরও একটা সেট্‌ল্‌মেণ্ট করেছেন—একখানা বাড়ী আর ত্রিশ হাজার টাকার ইন্সিওরেন্স। তাছাড়া যদি বেশী দিন বাঁচেন ত পেন্‌সনও ত রইল।'

'কিন্তু খুব বেশী দাম পেলেন কি—আফ্‌টার অল?' কণ্ঠের বিদ্রূপ এবার আর বিমলের চাপা থাকে না, 'ছেলেপুলে যদি হয় এবং পেনসন যদি না থাকে ত তাদের মানুষ করবার পক্ষে ও ক-টা টাকা খুব বেশী নয়।'

'ছেলেপুলে!' যেন হঠাৎ কী একটা বেঁধে জয়ন্তীর গায়ে, 'না না বিমলবাবু। সব দিক হয় না। ছেলেপুলের শখ আর নেই। ওসব ঝঞ্ঝাটে যাবো না, আপনি

নিশ্চিন্ত থাকুন।'

ম্লান হেসে উঠে দাঁড়ায় সে।

'চলি। আরও ক-জনকে বলতে হবে।'

জয়ন্তী চৌধুরী চলে গেলে দুজনেই অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর যেন আর থাকতে না পেরেই ব'লে উঠ্‌ল পূর্ণিমা, 'ইস!···এ কী করলে জয়ন্তীদি, এ কী করলে! কী সামান্যর জন্যে কত কী দিলে!'

'Sins of the fathers!'—বিমল বললে ধীরে ধীরে, 'এ ওর বাবার পাপ। তিনি যখন অকারণ বিলাসের মধ্যে ওকে মানুষ করেছিলেন, সে বিলাস যখন ওর মজ্জাগত করিয়ে তাকে প্রয়োজন ক'রে তুলেছিলেন তখন একবারও ভেবে দেখেন নি যে কখনও ওকে বাস্তব জীবনের মুখোমুখি এমন ক'রে দাঁড়াতে হবে। কতটুকু তাঁর ক্ষমতা, ভবিষ্যতেও এই অভ্যাস বজায় রাখার মত যথেষ্ট টাকা তিনি রেখে যেতে পারবেন কিনা তা কি একবারও ভেবেছিলেন? এখনকার অধিকাংশ বাপ-মাই এই সর্বনাশ করেন ছেলেমেয়েদের। আগেকার দিনে মেয়েদের বাপ-মার কাছে পদে পদে শুনতে হ'ত—দুদিন বাদে পরের বাড়ী যেতে হবে, সেখানে না নিন্দে হয় কিংবা খোয়ার হয়। অমুকটা করিস নি, অমুকটা করতে নেই। কত কি বিধি-নিষেধ মানতে হ'ত তাদের ছেলেবেলা থেকে। এখনকার বাপ-মারা—যাঁরা খুব গরীব, তাঁরাও ব'লে থাকেন শুনি, দুদিন পরে ত পরের বাড়ী যাবেই, যতদিন আমার কাছে আছে একটু আরাম ক'রে নিক্। কিন্তু সেই আরাম এবং প্রশ্রয় যে তার স্বভাবটাই মাটি ক'রে দেয় তা বোঝেন না। হঠাৎ লড়াই করতে গেলে কেউ করতে পারে না, তার জন্যে চাই দীর্ঘদিনের ড্রিল বা অভ্যাস। কষ্ট করা অভ্যাস থাকলে কষ্ট বোধই হয় না যে!'

পূর্ণিমার চোখ দুটি ছলছল করতে থাকে। বোধকরি জয়ন্তী স্বেচ্ছায় যে ভুল করল তারই পরিমাণ আর পরিণাম ভেবে। বিমলের কথাগুলো বোধ হয় সব তার কানেও যায় না।

জয়ন্তী অনুষ্ঠানে পূর্ণবাবুর আর কিছু সুবিধা না হোক—আত্মীয় ভাগ্যটা একটু ফিরে গিয়েছিল। অর্থাৎ ওঁর যে আত্মীয়রা ওঁকে সম্পূর্ণ ভুলে বসেছিলেন—কখনও ওঁর খবর নেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নি, তাঁরাই এবার যেন সচেতন হয়ে উঠলেন। সাধারণের তরফ থেকে চাঁদা তুলে সভা ক'রে যাঁর জন্মোৎসব করা হয়, তাঁকে অবহেলা করার বা আত্মীয় ব'লে স্বীকার না করার কোন কারণই নেই—এটা তাঁরা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। আত্মীয়রা দু-একজন ক'রে প্রতিদিনই খবর নিতে আসতে লাগলেন। যে ভাগ্যের প্রাসাদে হেলান দিয়ে ওঁর মেটে-ঘরের চালাটি কোনমতে আত্মরক্ষা ক'রে ছিল—সেই ভাগ্যেই উদ্যোগী হয়ে নতুন খুঁটি এবং গোলপাতার ব্যবস্থা ক'রে ঘরটাকে আত্মনির্ভর ক'রে দিলেন। মাসিক পাঁচটাকা ক'রে দিতেন তিনি এর আগেও, এখন সেটা বন্ধ ক'রে দিলেন বটে, তেমনি তার বদলে চাল আটা ও চিনি—একেবারে মাসকাবারি যতটা লাগে—হিসাব ক'রে পাঠাতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ঘরে একাধিক বাহাওয়ালপুরী গাই ছিল, তিনি দৈনিক এক পোয়া ক'রে দুধেরও ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

এতে সুখী না হোন—কতকটা নিশ্চিন্ত হবারই কথা। কিন্তু পূর্ণবাবু তা হ'তে পারলেন না। বরং একটা অস্বস্তিই বোধ করতে লাগলেন। কেমন একটা অকারণ কুণ্ঠা এবং সঙ্কোচ। সেটা কাউকে বোঝাতে পারা ত দূরে থাক্, মুখ ফুটে বলতেই পারেন না। এটুকু পার্থিব জ্ঞান তাঁর আছে—তিনি জানেন যে আসল কথাটা শুনলে সকলেই হাসবে।

আর হাসবারই ত কথা।

বিমলের সঙ্গে আলোচনা হবার পর থেকে সেই যে তার মাথার মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে সেই সংশয়েই তাঁকে না দিচ্ছে স্থির থাক্‌তে, না দিচ্ছে আত্মীয়দের এই সম্মান ও প্রীতিকে সহজে গ্রহণ করতে।

তাঁর কেবলই মনে হয়—এই যে সম্মান এরা তাঁকে দেখাচ্ছে এর তিনি যোগ্য নন। এর মূলেই যে ফাঁকি থেকে গেছে। যেটাকে তিনি কর্তব্য ব'লে এতকাল

আঁকড়ে ধরে রইলেন, নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবার চেষ্টা করলেন প্রাণপণে—সেইটেই যদি কর্তব্য না হয় ত এদের কাছ থেকে সে নিষ্ঠার পুরস্কার গ্রহণ করবেন কোন্ অধিকারে ?

তিনি কি ভুলই করেছেন তাহ'লে এতকাল ?

আগাগোড়া ভুল বুঝেছেন আর বুঝিয়েছেন ?

এইটেরই মীমাংসা করতে পারেন না তিনি। ভেতরে ভেতরে ছট্‌ফট্‌ করেন আর কৃশ দেহটাকে কৃশতর ক'রে তোলেন।...

এই যখন অবস্থা তখন হঠাৎ ওঁর এক নাৎনী এসে পড়ল শ্বশুর বাড়ী থেকে। নাৎনী অর্থাৎ তাঁর এই অদ্বিতীয় ধনী ভাগ্নের মেয়ে অরুণা। অরুণাকে পূর্ণবাবু একটু বেশী ভালবাসতেন, তার কারণ শৈশব থেকেই অরুণা তাঁর বড় ন্যাওটো ছিল—নাতি-নাৎনীদের মধ্যে ও-ই একমাত্র। ওঁদের দারিদ্র্যকে সে আমল দেয়নি—বরং অধিকাংশ দিনই সে ইস্কুলের ফেরৎ প্রিয়ম্বদার কাছে ঝোল ভাত বা দুধ ভাত খেয়ে যেত। এর জন্যে গোপনে যে ওর ওপর কিছু শাসন চলে নি এমন মনে করবারও কোন কারণ নেই। তবু অরুণা ওদের বাড়ী এবং আদর কোনটাই ছাড়তে পারে নি।

অরুণার, বলতে গেলে সম্প্রতি, বছর চারেক হ'ল বিয়ে হয়ে গেছে। পাত্রটি ভাল, বিহারে কী এক নতুন-পত্তন করা সরকারী কারখানায় মোটা মাইনের চাকরী করে। সাতাশ-আটাশ বছর বয়স, এরই মধ্যে প্রায় সাড়ে চারশ' টাকা মাসিক বেতন পায়, দেখতেও রূপবান। এক কথায় অরুণার বরাত ভাল।

বলাবাহুল্য বাপের বাড়ী পৌঁছেই অরুণা ছুটে এল দাদুর কাছে। জয়ন্তীর কথা সে-ও শুনেছে বৈকি। খুশী হয়েছে সে-ই সবচেয়ে বেশী। দাদুকে তার মা-ও সমীহ করছেন আজকাল, এতে অরুণার আনন্দের সীমা নেই। তোমরা আজ যাকে চিনছ অরুণা তাঁকে বহুদিন আগেই চিনেছে—তার মুখের তৃপ্ত হাসিতে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অরুণাকে দেখে পূর্ণবাবুও এবার বিশেষ ক'রে খুশী হয়ে উঠলেন। দামী শাড়ী, ঝলমলে অলঙ্কারের মধ্যে স্বাস্থ্যবতী মেয়েটিকে লাবণ্যবতীও মনে হচ্ছিল। কাছে বসিয়ে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে পূর্ণবাবু অনেক আশীর্বাদ করলেন। কয়েক মাস

ধরে মনে মনে উনি নিরন্তর যে পীড়া অনুভব করছিলেন তা যেন এই স্বাস্থ্য-যৌবন-লাবণ্য-আনন্দের মূর্তিমতী প্রতিমাখানিকে সামনে পেয়ে কিছু কালের জন্য ভুলে গেলেন। শুধু বাইরে নয়—অন্তরেও ওর সমস্ত চৈতন্য বার বার আশীর্বাদ করতে লাগল মেয়েটিকে।

অরুণা ওঁর পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'ইস, এ কী চেহারা ক'রে তুলেছেন দাদু! আপনি মোটেই ভাল থাকছেন না নিশ্চয়।'

ছেলেমানুষের মতই পূর্ণবাবু বললেন, 'তুই ঠিকই বলেছিস দিদি, আমার শরীর মন বড়ই খারাপ যাচ্ছে। আজকাল যেন কেমন দিনরাতই ক্লান্তি বোধ করি!'

'আপনি এবার আমার সঙ্গে ওখানে চলুন—দিন-কতক বেড়িয়ে আসবেন!

'দূর পাগলী, তা কি হয়।'

'কেন হবে না। বা-রে! আমি বুঝি কেউ নই? আমার কাছে গিয়ে ক'টা দিন থাকতে পারেন না?'

'জামাই-বাড়ী গিয়ে থাকব—না না, সে ভারি লজ্জার কথা।'

'জামাই-বাড়ী ত ঠিক সেটা নয়। কর্মস্থান। প্রকাণ্ড কোয়ার্টার আমাদের, পড়েই থাকে। আমার শ্বশুর শাশুড়ী কেউই ত সেখানে থাকেন না। শ্বশুরের অত বড় বাড়ী কারবার ফেলে তিনি যাবেনই বা কি ক'রে? চলুন দাদু, লক্ষ্মীটি!'

প্রিয়ম্বদাও সে অনুরোধে যোগ দেন, 'রুণু অত ক'রে বলছে, ঘুরেই এসো না। শরীর তোমার ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ছে একেবারে—এখনও গেলে হয়ত খানিকটা সাম্‌লে যেতে পারো।'

তবু পূর্ণবাবুর সঙ্কোচ ঘোচে না, 'জামাই কী মনে করবেন বল্ ত!'

'ইস। ওর আবার মনে করাকরির কী আছে। আর আমিই বা তার কি ধার ধারি। আমি সেখানে গিন্নি না?'

প্রিয়ম্বদার মুখের দিকে চেয়ে পূর্ণবাবু বলেন, 'তুমি একা থাকতে পারবে?'

'খুব পারব। এ ত কটা দিন।'

তারপর একটু ম্লান হেসে বলেন, 'বেশী দিন না থাকতে হয় যাতে—সেই জন্যেই ত যেতে বল্‌ছি।'

পূর্ণবাবু অসহায় ভাবে একবার অরুণার মুখের দিকে আর একবার প্রিয়ম্বদার

মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'আখো—তোমরা যা ভাল বোঝ। কুটুমের কাছে নিন্দে না হ'লেই বাঁচি। তোমার বাবা মা কিছু ভাববেন না ত ভাই রুণু ?'

অরুণা জোর ক'রেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

স্বাস্থ্যকর জায়গা। কারখানা হবার আগেও অপরিচিত ছিল না স্থানটা। তখনও বহু লোক এখানে আসত—স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে। বাইরে যাবার মধ্যে পূর্ণবাবুকে বার-কয়েক কাশী যাওয়া-আসা করতে হয়েছিল, তখন কয়েকবার এই দিক দিয়ে গেছেন কিন্তু সে সময় এসব জায়গা নেহাৎই অরণ্য ছিল। এখন এর চেহারা ফিরে গেছে, কারখানাটিকে কেন্দ্রে রেখে চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত শহর উঠেছে গড়ে। বড় বড় চওড়া রাস্তা বেরিয়েছে। সে রাস্তায় জ্বলছে শুভ্র বড় বড় নতুন ধরণের বিজলী বাতি। দুদিকে সুন্দর সুন্দর কোয়ার্টার, তাদের সামনে একটু ক'রে বাগান। এর ভেতর ইস্কুল, ক্লাব, খেলার মাঠ, সিনেমা—সব রকমই আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিম্‌ছাম্ শহর।

পূর্ণবাবু এখানে এসে ভারি খুশী হ'লেন।

শুধু সেই নর্দমা এবং ধোঁয়াকে পেছনে ফেলে এসেছেন, সেই ভাঙ্গাবাড়ী এবং অপরিসীম দারিদ্র্যকে পেছনে ফেলে এসেছেন তাই নয়—অপরিসীম আত্মগ্লানি, উচিত অনুচিতের প্রশ্ন, বিমলের সমস্যা—সব কিছুই পেছনে ফেলে এসে বেঁচেছেন যেন।

নাত্‌জামাই সোমেশের কোয়ার্টারটি ভাল। তিনখানা বড় বড় ঘর, রান্নাঘর চাকরের ঘর, দুটি বাথরুম—কলকাতার হিসেবে বেশ বড় গৃহস্থের থাকবার মত জায়গা। থাকে এরা দুটি প্রাণী, অরুণার একটি শিশু এবং এক চাকর। কয়লা নাকি কিনতে হয় না, তাই সব সময়েই প্রায় উনুন জ্বলে। বাথরুমে গরমজলের কলে দিনরাত এবং বারোমাসই গরম জল মেলে। সরকার থেকে পাখা, রেডিও অনেক কিছুই দিয়েছে—আসবাবপত্র ত বটেই।

এত স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাচুর্য্যের মধ্যে পূর্ণবাবু তাঁর এই দীর্ঘ জীবনে একটি দিনও কাটান নি। সুতরাং প্রথম প্রথম ভারি একটা আরাম বোধ করলেন।

কিন্তু দিনকতক পরেই সত্যটা আরব্য রজনীর দৈত্যের মত সামনে এসে দাঁড়ায় তার বিকট চেহারা নিয়ে। তাহ'লে ত বিমলের কথাটাই ঠিক হয়। এই সুখ এবং বিলাস—এ ত কারখানারই অঙ্গ; ব্যবস্থা হয়েছে যাদের জন্য, তাদের কারুর জীবনে 'ভীত্যর্থানাং ভয়হেতু' কোন কাজে আসবে না কোন দিন!

সোমেশও আই-এস-সি পাশ ক'রে কোন্ এক কারখানার পাঠশালায় পড়ে এখানে এসেছিল চাকরী করতে। আর সেই জোরেই এত টাকা মাইনে পাচ্ছে, লেখাপড়ার জোরে নয়।

ভারি অস্বস্তি হয় পূর্ণবাবুর। বিলাসের এই সহস্র উপকরণ তাঁকে যেন নিরন্তর বেঁধে।

একটু অন্যমনস্ক হবার সুযোগ খোঁজেন।

সোমেশকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি খবরের কাগজ নাও না দাদুভাই?'

সোমেশ একটু অপ্রতিভ হয়। মাথা চুলকে বলে, 'না। মানে কাগজ পৌঁছয় সেই সন্ধ্যায়। তার আগে রেডিওতে তিনবার খবর শোনা হয়ে যায়। মিছিমিছি বাজে খরচ ক'রে লাভ কি?'

'তা বটে।' চুপ ক'রে যান পূর্ণবাবু।

কিন্তু কোন বইও নেই এদের বাড়ী। অবশ্য পড়বার সময়ও নেই খুব। সোমেশ পৌনে সাতটায় চাকরের ঘরে এলার্ম দেওয়া থাকে ঘড়িতে—সে উঠে চা ক'রে ঘুম ভাঙ্গায়—ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে। ঘুম থেকে ওঠে—সাড়ে সাতটার ভেতর দাড়ি কামিয়ে স্নান ক'রে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়তে হয় তাকে। দুপুরে লাঞ্চ নিতে আসে কিন্তু সে আধঘণ্টার জন্য। বিকেল চারটেয় ছুটি হবার কথা—পাঁচটার আগে কোনদিনই ফিরতে পারে না, এক একদিন আরও দেরী হয়। এসে চা খেয়েই ছোটে ক্লাবে। ভারি খেলাধুলোর শখ ছেলেটির—টেনিস, গল্ফ, বিলিয়ার্ড—সব রকমই জানে। ক্লাব থেকে বাড়ী ফিরতে নটা সাড়ে-নটা বাজে—তখন ক্লান্তিতে দেহ ভেঙ্গে আসে। খেয়েই শুয়ে পড়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

অরুণার অবশ্য অখণ্ড অবসর। কিন্তু সে পড়তে ভাল বাসে না। বোনা এবং কাপড়ে ফুল-তোলায় তার ঝোঁক বেশী। এ ছাড়া মেয়ে আছে, রেডিও আছে, সিনেমা আছে—প্রতিবেশীরা আছেন। সন্ধ্যার দিকে পালা ক'রে আড্ডা বসে

পাড়ায়। তাছাড়াও মেয়েদের একটি প্রতিষ্ঠান আছে এখানে, অরুণা আবার তার সহ-সম্পাদিকা। কাজও কম নয় খুব তার।

পূর্ণবাবু তবু সসঙ্কোচে একদিন বইয়ের কথাটা তুললেন।

সোমেশ ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'তাইত, ইনস্টিটিউটে মাসে মাসে চাঁদা দিচ্ছি, বই আসেও না কেন জানি না। দু'খানা বই আমার পাবার কথা। ওগো শুনছ, আজই লছমনকে পাঠিয়ে ভাল বই আনিয়ে দিও ত দাদুকে। সত্যি, ওঁবই বা সময় কাটে কি ক'রে?'

'ইঞ্জিনিয়ারিং বই কিছু পাওয়া যায় এখানে দাদুভাই?'

'ইঞ্জিনিয়ারিং? সে ত অফিস লাইব্রেরীতেই আছে। কিন্তু'—বিস্ময় আপনিই ফুটে ওঠে তার কণ্ঠে, 'কিন্তু সে আপনি—। মানে আপনার কি ও বিষয়ে পড়া আছে কিছু?'

অপ্রতিভভাবে পূর্ণবাবু বলেন, 'না না। ওটা আমার ধৃষ্টতা ছাড়া কিছু নয়। কিছুই বুঝি না। পাতা ওলটাতেই ভাল লাগে। ও একটা হবি আর কি।'

অরুণা মাথা নেড়ে বলে, 'উঁহু। আমি জানি, আপনি ত মধ্যে মধ্যে পাড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের কাছ থেকে বই এনে পড়তেন!'

'তাই নাকি? স্ট্রেঞ্জ!...আচ্ছা আমি এনে দেব এখন অফিস থেকে কিছু!'

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে পড়ে সোমেশ। আটটায় হাজরে, এতটা পথ যেতে হবে। আর মোটে পনেরোটি মিনিট সময় আছে।

পাড়াতে প্রবীণ লোকও দু' চারজন আছেন। তাঁদের কেউ কেউ যেচে-এসেই পূর্ণবাবুর সঙ্গে আলাপ করেন। কোথাও বা অরুণাই নিয়ে যায় তাঁকে। এভাবের সামাজিকতায় তিনি ঠিক অভ্যস্ত নন--তবুও তিনি যান সমস্ত রকম সঙ্কোচ কাটিয়ে। বহুদিন যেন শামুকের মত একটা খোলার মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রেখে ছিলেন—একটু বাইরের হাওয়া লাগানো সত্যিই দরকার। কিন্তু আশে-পাশের যত কোয়ার্টারেই যান—প্রায় সর্বত্রই ঐ একটা জিনিস লক্ষ্য করেন পূর্ণবাবু—বইয়ের বালাই নেই। দু' এক জায়গায় গৃহিণীরা লাইব্রেরী থেকে বই আনান

বটে—কেনা-বই কারুর বাড়ীতে দেখা যায় না। অথচ প্রচুর পয়সা খরচ করেন প্রত্যেকেই, অনাবশ্যক বিলাস দ্রব্যে অর্থব্যয়ের কার্পণ্য নেই একটুও। ফেরী-ওয়ালার দল দুপুরে বা বিকেলে এই সব কোয়ার্টারে উজাড় ক'রে দিয়ে যায় নানা-বিধ পণ্য। ডাকেও আসে কত কি জিনিস। শুধু বই-ই আসে না কারুর বাড়ী।

বৃদ্ধদের সঙ্গে বসে গল্প ক'রেও খুব তৃপ্তি পান না পূর্ণবাবু।

অধিকাংশ আলাপ-আলোচনাই পারিবারিক জীবনের পথ ধরে চলে। ছেলে-মেয়েদের অকৃতজ্ঞতা, বর্তমান যুগের মতি গতি, গৃহিণীদের নির্বুদ্ধিতা—এই সব। তা নইলেও বৈষয়িক কথাবার্তা বেশী।...শিক্ষিত লোকও আছেন এঁদের মধ্যে। তাঁদের কাছে পূর্ণবাবু সাহিত্য বা দর্শনের কথা তুলতে চেয়েছেন, দু-একজনের সঙ্গে এ সব বিষয়ে আলাপ ক'রে আনন্দও পেয়েছেন কিন্তু সেদিকে তাঁদের মন না থাকায় কিছুতেই সে পথে আলোচনাটাকে ধরে রাখতে পারেন নি। পূর্ণবাবুর কেমন একটা ধারণা ছিল যে বৃদ্ধ হ'লেই মানুষের মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়—সে ভুলটাও এবার ঘুচল। দু-একজন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেন বটে, কিন্তু সেই পাঠের অহঙ্কার ছাড়া তাঁদের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। সে সব বইয়ের ভেতরে তাঁরা ঢুকতে পারেন নি।

এদের চেয়ে পথের ধারে দু একজন মজুরের সঙ্গে কথা ক'য়ে তবু আনন্দ পেয়েছেন পূর্ণবাবু। জীবন সম্বন্ধে ধারণা এদের খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট। এরা বিবেককে বেশী ভয় করে, ঈশ্বরকে বেশী ভালবাসে—ঐ সব তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের চেয়ে। কিন্তু এদের সঙ্গে বেশী মিশতে আবার পূর্ণবাবুর সাহসে কুলোয় না—কী জানি, অফিসার নাত-জামাই, সে আবার কি ভাববে। হয়ত সে পছন্দ করবে না এই ধরণের মেলামেশা।

পূর্ণবাবু আবারও গুটিয়ে নেন নিজেকে। সোমেশ দু একখানা ইঞ্জিনিয়ারিং বই এনে দিয়েছে অফিস থেকে, সেইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। এগুলোর মধ্যেই তবু আজও কিছু শান্তি আছে!

১৭

পূর্ণিমা সেদিন এসে পর্যন্তই কেমন উসখুস করছিল। সেটা বিমলের চোখে পড়বার কথা নয়, কারণ সাধারণতঃ সে যখন কাজ করে একমনেই করে এবং যখন করে না, তখন অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে। আর সে 'অন্য'টা ঠিক পার্শ্ববর্তিনীদের কেউ নয়—তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেদিন বিমলের টেবিলে কাজ ছিল কম, মনটাও ছিল অনেক দিন পরে কিছু হালকা। তাই কয়েকবারই সে মাথা তুলে পূর্ণিমার দিকে তাকাল এবং প্রত্যেকবারই লক্ষ্য করল যে পূর্ণিমা তার দিকে কেমন এক-রকম ভাবে চেয়ে আছে। অর্থাৎ যেন কিছু বলতে চায়—অথচ ঠিক ভরসা ক'রে বলতে পারছে না।

অকস্মাৎ বিমলের মনটা কোমল হয়ে উঠল। সে নিজের কাছে অকারণেই স্বীকার করল যে পূর্ণিমা মেয়েটি মোটের ওপর মন্দ নয়। সাধারণ মেয়েদের মতই হয়ত ওরও কিছু বুদ্ধির অভাব আছে কিন্তু আন্তরিকতার অভাব নেই। খাটতে সে চায়, খাটেও। কাজে ভুল হয়, তবে ফাঁকি দেয় না। তাছাড়া পূর্ণিমাই অন্তত তার সেকশনের একমাত্র মেয়ে—সংসার চালানোর জন্য চাকরী করতে হচ্ছে বলে যে অনুযোগ করে না।

মনের এই একটি বিশেষ তরল অবস্থায় বিমলের কণ্ঠস্বরটা আশ্চর্য স্নিগ্ধ শোনায়। সে প্রশ্ন ক'রে বসে, 'কী ব্যাপার আজ আপনার—মিস রায়?...ফাইলে যে একেবারেই মন বসছে না।...আপনারও কী জয়ন্তী চৌধুরীর হাওয়া গায়ে লাগল না কি?'

পূর্ণিমা নিমেষে রাঙা হয়ে ওঠে। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে একটু প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের সুরই বেজে ওঠে। সে আস্তে আস্তে বলে, 'ওসব চিন্তাবিলাসের অবস্থা আমার নয় বিমলবাবু, সে ত আপনি জানেনই।'

বিমলও বোধ করি কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সচেতন হয়ে পড়েছিল। সে তাড়াতাড়ি অনুতপ্ত স্বরে বললে, 'কিছু মনে করবেন না মিস রায়, কথাটা বলা আমায় ঠিক হয় নি। আপনাকে অন্যমনস্ক দেখছিলুম বলেই—'

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই বিমল একটা 'জরুরী'-মার্কা ফাইল টেনে নেয়।

কিন্তু পূর্ণিমা যেন নিজেও বিব্রত হয়ে পড়ে। তার বড় টেবিলটার অপর প্রান্তে রেখা বসে, সে আজ আসে নি। তারই শূন্য চেয়ার-খানার দিকে চেয়ে সে কলমটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করে শুধু—কাজে মন দিতে পারে না কিছুতেই। বিমল সেটা ঠিক চোখে না দেখলেও অনুভব করতে পারে কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করে না, বা ওর দিকে তাকায়ও না। একবারের শিক্ষাই যথেষ্ট, অনধিকার চর্চা সে আর কোন-মতেই করবে না, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞাই করে বার বার।

এ যেন কী একটা হয়ে গেল। পূর্ণিমার মুখে এই ভাবটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তৎক্ষণে। যে সুরে এই মাত্র ওদের কথোপকথন হয়ে গেল—সেটার ঠিক উল্টো সুরে কথাটা কী ক'রে শুরু করা যায়, এই কথাটাই ত ভেবেছে পূর্ণিমা—বলতে গেলে সারা সকাল ধরে। তার যেন কান্না পায় অদৃষ্টের এই অকরুণ এবং অকারণ পরিহাসে। চোখ-দুটো ছল ছল করতে থাকে।

অনেকক্ষণ পরে, বোধ হয় প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় ক'রেই—কতকটা কাঁদো কাঁদো গলাতে সে খুব চুপি চুপি প্রশ্নটা করে, 'আমার ওপরে কী রাগ করলেন আপনি ?'

কণ্ঠস্বরটা ভুল বোঝবার উপায় নেই। চমকে মুখ তোলে বিমল, বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করে, 'সে কী! আমি রাগ করব কেন মিস রায়। রাগ ত আপনারই করবার কথা! আমার অনধিকার চর্চা শুধু না—ধৃষ্টতায়।·· কিন্তু আপনি কি বসে বসে এখনও সেই কথা ভাবছেন না কি ? ছি ছি, আপনি বড্ড ছেলেমানুষ!'

এবার আর চোখের জল বাধা মানে না। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে রুমাল বার ক'রে চোখ দুটো মুছে নেয় পূর্ণিমা। তারপর ধরা ধরা গলায় বলে, 'আমার বরাতটাই মন্দ, যা করতে যাই উল্টো হয়ে যায়। দেখুন না, সকাল থেকে ভাবছি আপনার মনটা ভাল থাকলে সময় বুঝে একটা অনুরোধ করব—অথচ আপনাকেই রাগিয়ে বসে রইলুম।'

'কী বিপদ!' এবার বিমলের বিব্রত হবার পালা—'আমি রাগ করলুম এটাই বা ধরে নিচ্ছেন কেন ? আমি সত্যিই রাগ করি নি। বরং লজ্জিত হয়েছি নিজের অসতর্ক কথায়।· আমার বরং জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে আপনার শরীরটা খারাপ লাগছে কি না। যে রকম উসখুস করছিলেন—। সত্যিই শরীর

খারাপ হয় নি ত ?'

'না না। আসলে আপনার কাছে একটা কথা পাড়বার জন্য সাহস সঞ্চয় করছিলুম। বার বার চেষ্টা করছিলুম—কিন্তু ভরসায় কুলোচ্ছিল না।'

বিমল বিস্মিত হয়ে বলে, 'কেন ? কী এমন কথা ? অসম্মানজনক কিছু ? গালাগাল দিতে চান ?'

'কী যে বলেন—!' হেসে ফেলে এইবার পূর্ণিমা, 'সে সব কিছু নয়।'

তারপর আরও একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'কাল আমি নিজে হাতে একরকম পিঠে করেছিলুম, গোকুল পিঠে। মা দেখিয়ে দিয়েছিলেন অবশ্য—কিন্তু করেছি সব নিজে। আপনার জন্য গোটা-দুই এনেছিলুম, খাবেন কিনা এইটে প্রশ্ন করতেই সাহস হচ্ছিল না।'

এক নিঃশ্বাসে, যেন মরীয়া হয়েই ব'লে ফেললে পূর্ণিমা। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কাতে মুখ ওর বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ততক্ষণে।

বিমল মুখে একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে বলে, 'ও হরি, এই কথা !···তা এত ভয় কেন বলুন ত, আমি কি এতই ভয়ানক লোক যে একটু মিষ্টি খাবার কথাও বলা যায় না ?'

'কী জানি বলুন—এক কাপ চা খাওয়াতে চাইলেই আপনি কত কথা বলেন ! হয়ত বলে বসবেন যে আপনাকে এর বদলে যখন মিষ্টি ক'রে খাওয়াতে পারব না —তখন আপনার কাছে খাবোও না !'

অন্যদিকে মুখ ক'রে বললেও পূর্ণিমা বেশ স্পষ্ট ক'রেই বলে কথাগুলো !

'বা, আপনারও ত বেশ স্পাইট্ আছে দেখছি। সেদিন থেকে মনে ক'রে রেখেছেন কথাটা।···আচ্ছা, আর বলব না। দিন, কী পিঠে করেছেন দেখি—'

নিজের হাতব্যাগটা থেকেই তাড়াতাড়ি ছোট্ট একটা টিফিন-কৌটো বার ক'রে দেয় পূর্ণিমা। বিমল একটা পিঠেতে কামড় লাগিয়ে বলে, 'বাঃ ! চমৎকার হয়েছে ত ? এ কী সত্যিই আপনি করেছেন ?

'হ্যাঁ মশাই। বিশ্বাস না হয় মাকে জিজ্ঞাসা করবেন চলুন।' পূর্ণিমা কিন্তু ঐটুকু প্রশংসাতেই যেন খুশীতে ঝল্মলিয়ে ওঠে।

'না সত্যিই বড় ভাল হয়েছে।' তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে,

'আমাদের বাড়ীতে কত কাল যে এসব হয় নি। স্বাদই ভুলতে বসেছি।...আর হবেই বা কি ক'রে, ডালভাতের যোগাড় করতেই প্রাণান্ত, এসব আহার ত এখন আমাদের কাছে বিলাস।'

'আমাদের অবস্থাও আপনাদের চেয়ে খুব ভাল নয়। নিহাৎ আমার উৎসাহ দেখেই—নতুন শিখছি বলে—মা বাধা দিতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর মুখ শুকিয়ে উঠেছে। অন্য অনেক খরচ থেকে বাঁচিয়ে এটা পূরণ করতে হবে। তাই ত বেশী করতে পারি নি। গুনে-গেঁথেই করতে হয়েছে!'

বিমল কৌটোটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, 'ধুয়ে দিয়েছি এক দফা—তবু দিতে সঙ্কোচই হচ্ছে। মেজে দেবার ত কোন উপায় নেই।'

'পাগল হয়েছেন আপনি। আমাকে গিয়ে ত বাসনের পাঁজা নিয়ে বসতেই হবে।'

তারপর কতকটা ছেলেমানুষের মতই বলে, 'আপনার কথা আমি মিথ্যে প্রমাণ করবই। জানেন—আজ চোদ্দ দিন ঝি আসছে না, তার মেয়ের কলেরা। দু'বেলা সব বাসন আমি নিজে মাজি। তাছাড়া রাত্রের রান্নাও রোজ রাঁধি। মাকে কিছুতেই রান্নাঘরের দিকে আসতে দিই না। আর তাও যেমন তেমন ক'রে নয়—মা কাল স্বীকার করেছেন যে—এবার আমার কাজ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। আমার হাতে হেঁসেল ছেড়ে দিতে আগে যতটা ভয় করত এখন আর তা করে না!'

বিমল কিছুক্ষণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, 'এই বাড়তি খাটুনির জন্যে কিন্তু আমাকে দায়ী করবেন না। আপনারা যা, আমি তাই বর্ণনা করেছি—অন্যরকম হ'তে বলি নি। সে ধৃষ্টতাও আমার নেই। তবে সত্যি কথা বলতে কি এতে কোন ক্ষতি হয় নি আপনার, বরং কতকটা ফ্রেশই দেখাচ্ছে এই কদিনে।'

লজ্জায় খুশীতে আরও রাঙা হয়ে ওঠে পূর্ণিমা। অপাঙ্গে দ্রুত একবার নিজের হাত-পা গুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, 'কে জানে। অত লক্ষ্য করি নি। তবে খারাপ কিছু লাগছে না, এটা ঠিক।'

অফিসের ফেরৎ বিমলের একটা চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। সাধারণত এ ধরণের নিমন্ত্রণে সে যায় না, কিন্তু আজ ওর না গেলেই নয়। কুমুদীশ ওর বহুকালের বন্ধু। কলেজ জীবনে যে ক-টি ছেলের সঙ্গে ওর সত্যকার সৌহার্দ্য হয়েছিল কুমুদীশ তাদেরই একজন। ছাত্র সে খুব ভাল ছিল না কোনদিনই কিন্তু মানুষটা ভাল ছিল। কোন মতে এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাসটা পেয়ে গেল, তার ওপর বাবাও একটা কী বড় চাকরী করেন যেন—তাই তদ্বিরের জোরে এক বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছে। বেতন বেশী নয়, এখন থেকেই টিউশনী শুরু করতে হয়েছে, তবু কুমুদীশ সুখী। সে ইচ্ছে করলে সরকারী চাকরী পেত কিন্তু তার নাকি এইতেই আনন্দ। ঐ কাজ পাবার পর যেদিন প্রথম দেখা হয়, সেদিন বিমলও একটু অনুযোগ করেছিল। তার জবাবে কুমুদীশ বলেছিল, 'না ভাই আমার বহুদিনের শখ, বেশ থাকি আমি ছেলেদের মধ্যে। সরকারী অফিসের ফাইল ঘাঁটার চেয়ে এ ঢের ভাল। আর সম্মান কত। যখন অনেক ছাত্র হয়ে যাবে—তখন যেখানেই যাবো, কেউ না কেউ এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে। ভাবতেই আমার ভাল লাগে। আর কী হবে, সরকারী চাকরীতেই বা এমন কি রাজা হতুম। পৈতৃক বাড়ী আছে, বাবা যা জমিয়েছেন তাতে তাঁর শেষ বয়স কেটে যাবে ভাল ভাবেই। আমার সংসারটা আমি চালিয়ে নিতে পারব না?'

বিমলের ভালই লেগেছিল কথাগুলো। পড়াতে ভাল লাগে বলে পড়াতে যায় এমন মানুষ আজকাল ত পাওয়াই শক্ত।

সেই কুমুদীশের বাড়ী নিমন্ত্রণ। উপলক্ষটা কুমুদীশ বলে নি। বলেছে, 'চা খেতে বলছি চা খেতে আসবি। অত কারণে দরকার কি? কারণ বললেই—তা যত তুচ্ছ কারণই হোক্—উপহার কিনতে দৌড়োদৌড়ি। উপহার দেওয়াটা মধ্যে ছিল ফ্যাশন, এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যাধি। ক্ষমতা থাক বা না থাক—মোটা টাকা দিয়ে উপহারের জিনিস কিনতে হবে। তাতে শেষ মাসে পয়সার অভাবে বাজার না হয় সে-ও ভাল। না, কারণ দরকার নেই। দয়া ক'রে অকারণেই যেও।'

অবশ্য উপলক্ষটা বিমল অনুমান করতে পারে।

চাকরী পাবার পরই কুমুদীশের বিয়ে হয়েছিল। মাস-ছয়েক আগে ছেলে

হয়েছে। সম্ভবত, সেই ছেলেরই অন্নপ্রাশন। কিন্তু কুমুদীশ যখন কারণ বলতে চায় না—ওরই বা গরজ কি? তাছাড়া—সত্যিই, উপহার কিনতে গেলে ওর পক্ষে যাওয়াই সম্ভব হ'ত না।

কুমুদীশের বাড়ী গিয়ে দেখলে নিমন্ত্রণের পরিধিটা খুব বিস্তৃত নয়। ওর কলেজের অধ্যাপক জন-সাতেক, বিমল আর তাদের আর একজন সহপাঠী এবং কুমুদীশের শালা। মোট এই ক-টি লোক। উপলক্ষটা কেউ-ই জানে না—অন্তত সরকারী ভাবে। কুমুদীশ তার ছেলের কথাটা উল্লেখই করলে না—সামনে কেউ নিয়েও এল না। বোঝা গেল যে এ বিষয়ে তার কড়া নির্দেশ আছে। কেউ পাছে উপলক্ষটা অনুমান ক'রে নিয়েও অপ্রতিভ হয়, সেই জন্যেই এত সতর্কতা।

অনেকদিন পরে এই পার্টিতে এসে ভারি ভাল লাগল বিমলের। কুমুদীশের রুচিজ্ঞান আছে, আহার্যের আয়োজনটা দু' তিন দফায় এসে পৌঁছতে লাগল, তার সঙ্গে প্রতিবারই এক প্রস্থ ক'রে চা। গল্প-গুজবের সঙ্গে কিছু কিছু খাওয়া—এটা যে কোন বিশেষ উপলক্ষে ভোজের আয়োজন তা কারুরই মনে হ'ল না। বহু রাত্রি পর্যন্ত যে কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল তাও কেউ বুঝতে পারল না।

এই মজলিশে বসে একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'ল বিমলের।

কুমুদীশ নিজে কলা-বিভাগের ছাত্র। সেই বিভাগেই সে অধ্যাপনা করে। যে সব সহকর্মীদের সে নিমন্ত্রণ করেছে তারাও বেশীর ভাগ ঐ বিভাগেরই লোক। কেবল একজন মাত্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর নাম নির্মলবাবু, কেন যে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছে দলের বাইরের লোক হওয়া সত্ত্বেও, তা পরিচয়ের সময়ই কুমুদীশ বলে দিলে, 'ভারি আপরাইট লোক, আর তেমনি নিয়মনিষ্ঠ। ফাঁকি বলে কোন শব্দ ওর অভিধানে নেই। খুব শ্রদ্ধা করি আমি ওকে।'

কিন্তু প্রাথমিক আলাপের পর নির্মলবাবু একেবারে চুপ ক'রে বসেছিলেন। তাঁর সহকর্মীদের উচ্চ-কণ্ঠ আলোচনার মধ্যে কোন অংশই নেন নি। ওঁরা যে সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাস—এবং বাঙ্গালীর যা সবচেয়ে প্রিয়-প্রসঙ্গ—কর্মজীবন নিয়ে যখন তাঁরা কথার তুবড়ি ছুটিয়ে যাচ্ছেন—এমন কি ঝড় ওড়াচ্ছেনও বলা চলে—তখন তাঁদেরই এক পাশে বসে ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে একখানা বিলাতী মাসিকের পাতা ওলটাচ্ছিলেন নয়ত বিমলের কোন প্রশ্নের উত্তরে

অতি সংক্ষিপ্ত দু-একটা উত্তর দিচ্ছিলেন।

ফলে বিমলের ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে উনি অত্যন্ত মিতভাষী গম্ভীর প্রকৃতির লোক।

কিন্তু হঠাৎ সে ভুলটা ভেঙ্গে গেল অভাবনীয় ভাবে।

অধ্যাপকদের মধ্যে কে একজন ইতিমধ্যে য়্যাটমবোমার কথা তুলেছিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে ভুলক্ষেত্রে 'য়্যাটম' শব্দটির প্রযোগ করেছিলেন।

অকস্মাৎ নির্মলবাবু যেন বোমার মত ফেটে পড়লেন, 'ওটা য়্যাটম নয়, আইসোটোপ!'

এবং তারপরই তিনি সবিস্তারে ও সোৎসাহে বোঝাতে লাগলেন আণবিক বোমার বিচিত্র কার্য-কারণ রহস্য। তিনি যে এত দ্রুত এত কথা বলতে পারেন তা বিমল এতক্ষণ ধারণাই করতে পারে নি। বিজ্ঞানের জটিলতা বেশ দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে উঠল। অর্থাৎ ভদ্রলোক সাধারণ ভাসা-ভাসা লেখাপড়া করেন নি—বেশ ভাল ভাবে তার গভীরেও ডুবেছেন। হজম করেছেন পুঁথির পাঠগুলো।

সে শুধু বিস্মিত হ'ল না—তার একটা জ্ঞানও হ'ল আজ। বর্তমান শিক্ষার আর-একটা দিকও দেখতে পেলে। যারা বিজ্ঞান পড়ে, তারা বিজ্ঞানের বাইরে আর কিছু জানে না,—যারা আর্ট্‌স্‌-এর ছাত্র তারা বিজ্ঞানের সাধারণ খবরগুলোও রাখে না। অথচ এঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, সব কজনই অধ্যাপক। মানুষের জীবনে যে সব তথ্য জানা আজ একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে, প্রতিনিয়ত যাদের কথা শুনতে হচ্ছে—সেই সব তথ্য বা সেই সব বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেও এঁরা অনায়াসে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ব'লে চলে যাচ্ছেন। এটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে নিশ্চয়ই খুব গৌরবের কথা না।

শেষের দিকটা এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বিমল, নির্মলবাবুর পুরো কথাগুলো তার কানেও যায় নি।

শুধু আর্টস্‌ বা সায়ান্সের মোটা বিভাগটাই বা কেন? একটু আগে অমিয়-বাবু, জিতেনবাবু যে সব কথা আলোচনা করছিলেন—তারই কি সবটুকু ওর বোধগম্য? অথচ সেও আর্ট্‌স্‌-এর ছাত্র, বেশ ভাল রকম শিক্ষিত বলেই সে

দাবী করে নিজেকে—তার পিসীমার ভাষায় চার-চারটে পাস করেছে সে।…এ পাস করার প্রকৃত মূল্য আরও একবার বোঝা গেল আজ!

এঁদের আলোচনা থেকে একটা খবর শুনল সে। সরকারী শিক্ষা বিভাগ টেক্‌নিক্যাল বিদ্যা-সংস্থাগুলিতে হিউম্যানিটি বলে একটা বিভাগ খোলবার ব্যবস্থা করছেন। সে বিভাগে নাকি সাহিত্য, শিল্পের একাধিক বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা থাকবে। ইচ্ছামত আবশ্যিক বিষয়গুলির সঙ্গে এরও একটা নিতে পারা যাবে। কিন্তু তাতেই কি খুব লাভ হবে? করুণাময় বাবু একটু আগেই বিদ্রূপ ক'রে যা বলছিলেন, 'অর্থাৎ কতকগুলি লোককে মোটা মাইনে দিয়ে পোষবার ব্যবস্থা হচ্ছে আর কি। যাকে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারী' শিখে ভবিষ্যৎ জীবনে ক'রে খেতে হবে, বিলিতী কাব্য বা ছবি আঁকা তার কি উপকারে আসবে বাপু?' কথাটা খুব মিথ্যা না। তবে আর কি করবার আছে তাও ত ভেবে পায় না।

এটা সে বুঝতে পারে—বিশেষত আজ আরও ভাল ক'রে বুঝতে পারলে—হাই স্কুলের পাঠক্রমটাই প্রসারিত ক'রে এমনভাবে তার পাঠ্যতালিকা তৈরী করা দরকার যাতে সেইখানে যারা লেখাপড়া শেষ করবে, তারা যেন বর্তমান যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। দুনিয়ার খবর যাতে তাদের কাছে হিব্রু বা গ্রীকের মত দুর্বোধ্য না ঠেকে। কিন্তু আর পাঠ্যতালিকা বাড়ালেও চলবে না এটাও সে বোঝে, বর্তমান যা আছে তাই ঢের বেশী। ঢেলে সাজতে হবে এ পাঠ্যসূচী। কিন্তু কী ভাবে, তা অবশ্য ওর বোঝবার বা জানবার কথা নয়। যাঁরা ভাবতে পারেন, যাঁরা পথ দেখাতে পারেন তাঁরা ত নির্বিকার। গতানুগতিক পথেই খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাহবা পেতে চান।

নির্মলবাবুর বক্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। লাভের মধ্যে ওঁর কথাগুলো শোনা হ'ল না। কী সব খাবারও এসে গিয়েছিল। এই শেষ-প্রস্থ বোধ হয়। অধ্যাপকরাও ওঠবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

পূর্ণ মাষ্টার মশাইয়ের মত লোক যদি ক'জন থাকত দেশের শাসনব্যবস্থার মধ্যে!

নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই হেসে ওঠে বিমল।

মণি তার কথামত ঠিক পরের রবিবারই পুলককে পড়াতে এসেছিল। খুবই বিরক্তির সঙ্গে এসেছিল তাতে সন্দেহ নেই—সেটা সে পরে একদিন নিজের মুখেই স্বীকার করেছিল বিমলের কাছে। এমন কি, যদি ঠিক তার দু'দিন আগেই বিমল ওর অভিনয় দেখতে না যেত এবং অভিনয়ের শেষে অমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে না আসত ত, সুবিধামত কথাটা ভুলে যেতেও বোধ করি ওর বাধত না। নিছাৎ আটচল্লিশ ঘণ্টার আগের ব্যাপার বলেই ভোলার সুযোগ পাওয়া গেল না। তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্রের কাছে প্রশংসা পাওয়ার মাদকতা খুব কম নয় আজও—যতই কেন না মণি মুখে উড়িয়ে দিক ডিগ্রিটাকে –, আরও কিছু প্রশংসা শোনবার লোভও বোধ করি তার ছিল।

সে যাই হোক—পড়াতে বসে খুব কিন্তু খারাপ লাগল না ওর। বরং মণি একটু বিস্মিতই হ'ল নিজের মনোভাব দেখে। তার যেন কেমন ভালই লাগল অভিজ্ঞতাটা। আসলে মেধাবী ও মনোযোগী ছাত্রকে পড়ানোতে শিক্ষকেরও যে একটা সুখ আছে—সেটা এতদিন অনুভব করবার কোন সুযোগ-সুবিধাই হয় নি ওর। এই প্রথম ওর সে অনুভূতি হ'ল। সে উঠে আসবার সময় হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ব'লে এল—'এই বুধবার আমার ছুটি আছে–তোমার কারখানারও ত ছুটি? আমি সে দিনও আসতে পারি হয়ত।'

পুলকের বিস্ময় এবং আনন্দের সীমা রইল না। সম্ভব হ'লে খুশীর চোটে সে খানিকটা লাফালাফিই ক'রে নিত হয়ত। তখন বিমল বাড়ী ছিল না, ফিরে আসতেই প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাকে সংবাদটা দিলে। বিমলও যে একটু চমকে উঠল তা বলা বাহুল্য। সে পুলকের মাথায় একটা হাত রেখে বললে, 'এ যে তোর কতবড় ট্রায়াম্ফ্, তা তুই জানিস না পুলক। যে কোন জেনারেলের একটা বড় যুদ্ধ জেতার চেয়েও কঠিন কাজ—শিক্ষায় বীতশ্রদ্ধ একজন হার্ডহার্টেড্ শিক্ষককে শিক্ষাদানে উৎসাহিত করা।'

মণি অবশ্য ঝোঁকের মাথায় কথাটা ব'লে ফেলে একটু অনুতপ্তই হয়েছিল।

এবং সন্ধ্যানাগাদ নিজের মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল যে সে 'হয়ত' বলেছে—পুরোপুরি যাকে 'কথা দেওয়া' বলে—তা সে দেয় নি। সুতরাং প্রতিশ্রুতিভঙ্গ বা—পালনের কোন প্রশ্ন এখানে উঠ্‌তেই পারে না। আর সে ত মাইনে নিয়ে পড়াচ্ছে না—পুরোপুরি প্রতিশ্রুতি দিলেও সেটা এমন কিছু অপরাধ বলে গণ্য হ'ত না।···সে মন স্থির ক'রেই ফেললে যে বুধবার সে যাবে না—পরের রবিবারেও না। যেমন আগে কথা ছিল মাসে দুদিন—তাই যাবে সে। অত কিসের?

কিন্তু বুধবার সকালে বাজার-হাট চুকিয়ে, চা-জল খাবার খেয়ে সিগারেট দেশলাই এবং পাশের-ঘর-থেকে-চেয়ে-আনা খবরের কাগজখানা নিয়ে যখন নিশ্চিন্ত হয়ে বসল সে, তখন যেন আর ভাল লাগল না। কেমন একটু উসখুস করতে লাগল মনটা। কোন এক অজ্ঞাত কারণে বিনাপারিশ্রমিকের ঐ ছাত্রটি তাকে বেশ একটু প্রবলভাবেই আকর্ষণ করতে লাগল। অবশেষে সে মনকে বোঝাল যে আজ সকালে হাতে কাজ কম আছে—এর পরের দুই রবিবারই হয়ত এমন কাজ পড়বে যে পাঁচ মিনিটও ফুরসুৎ পাওয়া যাবে না। পর পর দুদিন গিয়ে যদি সে তিনটে রবিবারও না যায় ত কারুরই কিছু বলবার থাকবে না। বর' আজ যখন এক রকম 'কথাই' দেওয়া হয়েছে তখন আজ যাওয়াই ভাল। তাতে কথার ঠিক রাখার গৌরবটাও পাওয়া যাবে।

এবং মনকে বোঝানোর পালাটা ভাল ক'রে শেষ হওয়ার আগেই সে এক সময় জামাটা গলিয়ে আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

তার পরের রবিবারও মণি গেল। তার পরের রবিবারও।

মনকে আর বোঝাতে হয় না। সে এবার নিজের মনের কাছেই স্বীকার করেছে যে এটা যেন তাকে এক নতুন নেশায় পেয়ে বসেছে। নিহাৎ অভিনয়ের নেশাটা আরও বড, নইলে সে হয়ত বিকেলেও যেত। প্রায় প্রত্যেক ছুটির দিনেই বিকেলে কোথাও না কোথাও রিহার্স্যাল থাকে, তাই ওখানটায় আর কিছু করা যায় না।

ওর কাণ্ডকারখানা দেখে বিমলও অবাক হয়ে যায়। এক একদিন পড়াবার সময় সেও বসে থাকে কাছে। মণিকে যে এটা নেশায় পেয়ে বসেছে তা সে

নিজেও বুঝতে পারে। প্রচুর পারিশ্রমিক পেলেও কোন প্রাইভেট টিউটার এমন পরিশ্রম করেন কিনা সন্দেহ। বস্তুত শুদ্ধমাত্র পারিশ্রমিকের জন্য ঠিক একাজ বোধ হয় সম্ভব নয়। বিমল নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র নয়—তবু এটা সে বোঝে যে ল্যাবরেটরী ছাড়া বিজ্ঞান পড়ানো প্রায় অসম্ভব, বিশেষ ক'রে যেখানে ল্যাবরেটরী কী বস্তু সে সম্বন্ধে ছাত্রের কোন ধারণা পর্যন্ত নেই। অথচ সেই অসম্ভবই সম্ভব করছে মণি, শুধু নিজের কথার দ্বারা সেই সমস্ত অভাব পূরণ ক'রে পুলককে সে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে জিনিসটা। বিমল কৃতজ্ঞ হয়, অভিভূত হয়। তবে এটাও সে বোঝে যে এটা নিছক বন্ধুকৃত্য নয়। এর কৃতিত্ব পনেরো আনাই পুলকের প্রাপ্য।

কিন্তু এইখানেই এ পর্বের শেষ হয় না। এ নেশা ধীরে ধীরে মণিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে যে সে স্কুল সম্বন্ধেও ক্রমশঃ সজাগ হয়ে ওঠে। স্কুলের কাজটাও যে তার পড়ানোর—সে কথাটা যেন নতুন ক'রে মনে পড়ে ওর। সে একটু একটু পরখ ক'রে দেখতে শুরু করে। মন দিয়েই পড়ায় এক একদিন। আরও আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে যে ফল ভালই হয়। ছেলেগুলির বেশীর ভাগই যে খুব বোকা এবং 'মীসচিভাস্' নয়—এটাও ক্রমশ অনুভব করে সে। আর তারপর থেকে যেন কাজটা অত বেশী খারাপও লাগে না।

এ সম্বন্ধে সে তার সহকর্মীদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়েছিল বৈকি। কিন্তু ক্ষেত্র কঠিন, কাজটা অত সহজ হ'ল না। তাঁরা উড়িয়েই দিলেন ব্যাপারটা। শুধু তাই নয়, বেশ একটু হাসাহাসিই পড়ে গেল ওঁদের ভেতরে।

ফণীবাবু বললেন, 'মরেছে রে। গরীবের ঘোড়ারোগ ধরল বুঝি। ও মণি ভাই, এসব আবার মাথায় ঢোকালে কে হে তোমার? বাবা, টিউশনী ক'রে খেতে হবে। ইস্কুল ছাড়া হাঁফ ছাড়বার জায়গা কোথায় বলো দিকি? ওসব কেতাবী কথা-বার্তা ছাড়ো দিকি বাপু!'

অপরেশ বাবু বললেন, 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল করলে তাঁতি এঁড়ে গরু কিনে! তাই হয়েছে তোমার···কেন ঘ্যানোর ঘ্যানোর করছ বলো ত বাবা! ···যার যা, টিউশনী না পেলে ত আমাদের হাঁড়ি রইল শিকেয় তোলা; অত বার-

ফট্রাইতে দরকারটা কি? ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন বরং পণ্ডিত মশাই, ওঁর টিউশনীর বালাই নেই!'

হেড্ পণ্ডিত মাথা নেড়ে বললেন, 'জোটে হে জোটে। আমাদেরও জোটে। কেমন হে নিকুঞ্জ বলি নি তোমাকে—সেই যে সেদিন যে ছেলেটি ভর্তি হ'তে এল—গেল হপ্তায়? বললুম যে ছেলেটা শাঁসে জলে আছে, ক-টা ভাল টিউশনীর মওকা এল। তুমি ত আমার সঙ্গে তর্ক করলে খুব, বললে ক-টা আবার। বাপ ট্রামে এসেছে, সে আবার ক-টা মাষ্টার রাখবে। বড় জোর পঞ্চাশ টাকার একটা মাষ্টার খুঁজবে, বলবে সব সাব্জেক্ট্ পড়াও।...তাকে কী রকম ঘায়েল করেছি জানো? আমি পড়াবো সপ্তাহে তিন দিন সংস্কৃত—চল্লিশ। অটলকে ঠিক ক'রে দিয়েছি ইংরেজী আর অঙ্ক, রোজ পড়াতে হবে, একশ কুড়ি। তা ছাড়া সমরেশ আছে হিস্ট্রী, সেও সপ্তাহে তিন দিন—চল্লিশ। পুরো দুশোটি টাকা।'

'বলেন কি?' নিকুঞ্জর চোখ দুটো জলে ওঠে, 'কী করে বাপটা? গাড়ী কেনে নি কেন?'

'ঐ জন্যেই কেনে নি। দুটি ছেলেমেয়ের পেছনেই নাকি ওর সাড়ে চারশ পাঁচশ টাকা চলে যায়। বারোশ টাকা মাইনে পায়, ফাটা প্যাণ্ট পরে এসেছিল। বলে—ঐ আমার সাধনা পণ্ডিত মশাই, ওরা মানুষ হয়ে উঠুক—আমি নবাবী ক'রে কী করব?...চোখ মুখ দেখে মানুষ চিনতে হয় হে, শুধু কি পোষাক দেখলে চলে?'

তারপর একটু থেমে, মণির মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'কী বলছিলে—ফাঁকি? ফাঁকি আমি বড়-একটা দিই নে ভাই। তবে হয়ত আরও একটু খাটলে দুটো একটা ছেলে আর একটু উৎরে যেত—কিন্তু কী জানো ভায়া, টিউশনী বেশী নেই সত্যি কথা, তেমনি যজমানী আছে যে। শাঁকে ফুঁ কানে ফুঁ—দুটোই চালাতে হয়। তার ওপর আছে নোট লেখা। সব রকমই বজায় দিতে হয় রে ভাই। নইলে কি আর ছেলেমেয়ে মানুষ করতে পারতুম, না বালিগঞ্জে বাড়ী করতে পারতুম। ঐ সব ক'রে আর শরীর বয় না।'

উত্তর দিতে গিয়েও থেমে যায় মণি। বলা চলত যে—ওসব ক'রেই যখন বেশী আয় হয় তখন একাজটুকুর ওপর মায়া করার দরকার কি। ছেড়ে দিলেই হয়।...কিন্তু সে কথার উত্তর মণিই জানে বেশী। এটুকু না থাকলে টিউশনী,

নোট লেখার কাজ কিছুই জুটবে না। এটাই উপলক্ষ। মণির নিজেরও ত তাই। সে থেমে যায়, বেশী বলতে গেলে প্রমাণ হয়ে যাবে যে—ওদের আয় বেশী বলে মণি ঈর্ষিত।

অগত্যা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করতে হয় তাকে।

ইতিমধ্যে আরও একটি বিনা মাইনের টিউশনী মণির ঘাড়ে এসে পড়ল—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে।

বিমলের মা বিমলকে খোঁচাচ্ছিলেন বহুদিন থেকেই। কিন্তু বিমল এক কথা ব'লেই বার বার তাঁকে জবাব দিয়েছে—'ওর সে উপায় নেই মা, মিছিমিছি মুখ নষ্ট করাই সার হবে। তাছাড়া এ বিয়েতে লাভই বা কি? আরও কষ্টের মধ্যে পড়বে হয়ত!'

'তা পড়ুক রে! তবু সে শ্বশুরবাড়ী। বাপের বাড়ীই বা কি সুখভোগে আছে। নিজের বাড়ী গিয়ে ঝি-গিরি করাতেও সুখ!'

তবু বিমল রাজী হয় নি কথাটা পাড়তে। অবশেষে একদিন ওর মা নিজেই পাড়লেন। ওঁদের ঘরের সঙ্গেই রাস্তার দিকে একটুকরো ফালি বারান্দা ছিল, অপেক্ষাকৃত সেইটুকুই নির্জন স্থান গোটা বাড়ীটার মধ্যে। মণি এলে সেইখানে বসেই পুলক পড়ত। এই সূত্রে মণির সঙ্গে এদের পরিবারের একটা ঘনিষ্ঠতা হতে বাধ্য এবং হয়েও ছিল। বিমলের মা ইদানীং প্রায় প্রত্যহই ওর জন্য কিছু না কিছু খাবার—নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু জাতীয়—তৈরী রাখতেন। পড়ানো শেষ হ'লে ঘরে ডেকে এনে খাবার ও চা খাইয়ে ছাড়তেন। সেদিন সেই সুযোগে কথাটা তুললেন ভদ্রমহিলা, 'হ্যা বাবা তা তুমিও কি ঐ বিমুর মত চিরকাল থুব্‌ড়ো থাকবে, বিয়ে-থা করবে না?'

মণি একটু অন্যমনস্ক হয়েই নারকেল নাড়ুতে কামড় দিয়েছিল, হয়ত এইমাত্র পুলককে পড়ানো পাঠ্যের কথাই চিন্তা করছিল—বেশ একটু চমকে উঠল এই প্রশ্নে, আমতা আমতা ক'রে বললে, 'না—মানে কারণটা ত ঐ একই মাসীমা।… ইচ্ছা থাকলেই বা উপায় কি বলুন!'

'বিমুর ঘাড়ে যে তিন-তিনটে আইবুড়ো বোন বাবা, তোমার ত সে ভাবনা নেই। তোমার ছোট বোন ত নিতান্তই ছোট, তার বিয়ের কথা ভাববার এখনও ঢের দেরী।'

'হ্যাঁ তা ঠিক—কিন্তু সংসারও যে ঢের বড়। এ ত তবু মেসোমশাই যা-হোক দু-পাঁচ টাকা রোজগার করছেন ঘরে বসে-বসেও; খোকাও আপনার তার হাত-খরচার মত কিছু কিছু পাচ্ছে—আমার যে এই একমুখো রুদ্রাক্ষী। বিধবা বোন, তার ছেলেমেয়ে—না মাসিমা, এই অভাবের মধ্যে আবার খরচ বাড়াতে সাহস হয় না। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, এটা মানেন ত?'

'তা কি সব সময় বলা যায় বাবা। শুনেছি যারা লড়াই করে সরকার বাহাদুর শুধু তাদের খাওয়া-দাওয়াই নয়, আমোদ-আহ্লাদের দিকেও নজর রাখেন। ছাউনিতে ছাউনিতে বায়স্কোপ থিয়েটার দেখানোর ব্যবস্থা করেন।...এখনও জোয়ান বয়স, তাই এই ভাবে খাটতে পারছ। এরপর ক্লান্তি আসবে। একটু আরাম, একটু স্বাচ্ছন্দ্য—একটুখানি সেবা-যত্ন চাইবে মন। জীবনে সাধ-আহ্লাদকে গলা টিপে মারলে নিজেরও যে দম আটকে আসে বাবা।...তোমরা ভয় পাচ্ছ কিন্তু মুটে-মজুররাও ত বিয়ে করে!'

'হ্যাঁ মাসিমা, তা করে। কিন্তু তাদের জীবন আর আমাদের জীবন আলাদা। তাদের বোঝা তাদের গলগ্রহ নয়—স্বামী স্ত্রী দুজনেই খাটে—খায়। তাতে তাদের লজ্জাও নেই, আপত্তিও নেই। আমাদের এই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ঘরে মেয়েরা জানে বিয়ে করা মানেই বসে-খাওয়ার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা। বিয়ের পরের দিনই ভাত কাপড়ের ভার নিলুম বলে দিব্যি গালিয়ে নেন আপনারা। তারা ঘরে থাকবে, ছেলে মেয়ে দেখবে, দুপুরে ঘুমুবে—বড়জোর রান্নাবান্না করবে। তাও, যাদের ওরই মধ্যে একটু মাঝারি আয় তারা সে কাজটাও করতে চায় না। রাঁধুনী রাখার খরচ জোটে না, কম্বাইন্ড হ্যাণ্ড রেখে নিশ্চিন্ত।...কিছুই করতে চায় না আমাদের মেয়েরা। সংসারের ভেতরের দায়িত্বটাও সহজে নিতে চায় না, ...অথচ আর কোন জাতে এমন নেই। মুটে-মজুরের কথা কি বলছেন? পশ্চিমে দেখেছি স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে দোকানদারী করছে। বেশ বড় সম্ভ্রান্ত দোকান

বিলক্ষণ দু'পয়সা আছে, কিন্তু চাকর না রেখে দুজনেই দোকান চালাচ্ছে। 'আমার সঙ্গে বড়-বাজার চলুন—স্বামী স্ত্রী বসে ভাগাভাগি ক'রে সারাদিন নাগ্‌রা জুতো তৈরী করছে দেখিয়ে দেবো। তাদের দারিদ্র্য সত্ত্বেও বিয়ে করা শোভা পায় মা, আমাদের সাজে না!'

'সব মেয়েই কিছু পরিশ্রম-বিমুখ নয় বাবা, সারা জীবন খাটছে এবং হাসিমুখে খাটছে, খোঁজ করলে এমন মেয়েও পাবে বৈকি। আর তাদের ঘরে নিয়ে গেলে সুবিধেই হবে, অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে। লোকের ত দরকারই, মা তোমার বুড়ো হয়েছেন—তুমিই ত বলছ অর্দ্ধেকদিন উঠতে পারেন না। বোন একা। তাছাড়া সে বোনেরও ছেলেমেয়ে আছে, তারা একদিন মানুষ হয়ে উঠবে, তখন সে চাইবে আলাদা সংসার পাততে, ভাই বোন বড় হয়ে শেকল কাটবে একদিন—তখন তুমি কোথায় থাকবে বাবা?

চুপ ক'রে থাকে মণি। খানিক পরে বলে, 'কী জানি। ভাবি ত, ভেবে যেন কূলকিনারা পাই না।'

বিমলের মা গলাতে একটু জোর দিয়েই বলেন, 'আমি বাবা খুব নিঃস্বার্থভাবে কথাটা বলি নি, তেমনি মিছে কথাও বলি নি এটা ঠিক। কথাটা ভেবে দেখো—যা বলছি তার দাম বুঝতে পারবে।…আমার কনুকে তুমি নাও না বাবা। ওকে নিয়ে তুমি অসুখী হবে না এটা জোর ক'রে বলতে পারি। আমার মেয়ে আমি ত বলবই—কিন্তু তুমিও ত দেখছ!'

কনু—অর্থাৎ বিমলের বড় বোন কণিকা!

চমকে ওঠে মণি।

হ্যাঁ, দেখেছে বৈকি। প্রায়ই দেখেছে। লাবণ্যবতী না হোক্ স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে, প্রথম যৌবনের লালিত্য আর নেই কোথাও, পরিশ্রমের চিহ্ন হাতের উঁচু-হয়ে-ওঠা শিরায়, পায়ের চামড়ার কর্কশতায় এবং মুখের তামাটে রঙে পরিস্ফুট—তবু, মেয়েটিকে ভালই লাগে মণির।… আজকাল পথ চলতে চলতে মাঝে-মাঝেই কণুর কথা মনে হয় ওর। কিন্তু তাই ব'লে ঠিক এ ভাবে—না, এসব কথা তার কখনও মনে হয় নি।

তাকে অন্যমনস্ক এবং নিরুত্তর দেখে বিমলের মা ধীরে ধীরে বললেন, 'থাক্

বাবা, এখনই তোমাকে মন ঠিক করতে বলি নি। ভেবে দেখো কথাটা। ভেবেই উত্তর দিও, ইচ্ছে না হয় উত্তরও দিও না। হঠাৎ কথাটা ব'লে ফেললাম। তাই ব'লে ভয় পেয়ো না, উত্ত্যক্ত ক'রে তুলব না!'

মণি নিঃশব্দে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে অপ্রতিভ ভাবে হাসে।

'না, না—তা নয়। তবে—'

কথাটা শেষ না ক'রেই উঠে পড়ে সে।..

বিমল ফিরে এসে মায়ের মুখে সংবাদটা শুনে বলে, 'কেন বলতে গেলে মা? মিছিমিছি হয়ত মনে করবে সেই জন্মেই ওকে তুমি যত্ন করো।'

'ওরে, অত শত ভাবতে গেলে আর আমাদের চলে না। গরীবের আবার অত চক্ষুলজ্জা কি?'

মুখে বলেন বটে কিন্তু তার পরের রবিবার মণি আসতে তিনিও যেন আর লজ্জায় ওর সামনে বেরোতে পারেন না। কণিকা ত ত্রিসীমানায় আসে না। মেজ বোন মণিকা এসে আরক্ত মুখে চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে দিয়েই পালায়। সেদিন মণিও বিশেষ কথাবার্তা বলে না। পড়ানো শেষ ক'রেই তাড়াতাড়ি উঠে চলে যায় গম্ভীর মুখে। তার সে গাম্ভীর্যকে বিরক্তি ব'লেই মনে করেন বিমলের মা, তাঁর লজ্জা ও পরিতাপের শেষ থাকে না। বিমলের মুখের দিকে তিনি যেন তাকাতে পারেন না। বিমলের কথাই ঠিক। মিছিমিছি 'মুখ নষ্টই' সার হ'ল। ছিঃ ছিঃ!

বিমলের মা যেটাকে গাম্ভীর্য বা বিরক্তি মনে ক'রে সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন, আসলে সেটা মণির চিন্তাক্লিষ্টতা।

মণি সেদিনের সেই সামান্য কথা ক-টাতেই যেন বড় বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বিচলিত এবং চিন্তান্বিত।

বহু সময় দেখা যায় কেউ কোন একটা অসুবিধা ভোগ করতে থাকলেও সে সম্বন্ধে তার কোন অনুভূতি থাকে না। কিন্তু পরের কথায় হঠাৎ এক সময়ে যখন সচেতন হয়ে ওঠে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে—তখন যেন অসহ্য বোধ হয়।

মণিরও তাই হয়েছিল। 'একদিন ক্লান্তি আসতে পারে' এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই একসময়ে অনুভব করল—ইতিমধ্যেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর সে ক্লান্তির যেন সীমা-পরিসীমা নেই।

অনেক কথাই ভাবল সে। কয়েকদিন ধরে দিনরাতই ভাবল। সে বিজ্ঞানের ছাত্র, সুবিধা অসুবিধা নানাদিকই হিসাব ক'রে দেখল। ভাবপ্রবণতায় বিচলিত হবে না সে, এ তার প্রতিজ্ঞা। অথবা সামান্য একটু সুবিধার লোভে ভবিষ্যতের অনেক অসুবিধাকেও ডেকে আনবে না। যতই বয়স হোক্ তার, বিয়ের বয়স একেবারে পার হয়ে যায় নি। এমন কি পাঁচ-সাত বছর পরেও অসম্ভব শোনাবে না ও প্রস্তাব। সুতরাং আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারে সে অনায়াসে। তবে—

এই 'তবে'টাই যেন অনেকখানি।

কণিকাকে দেখছে সে। প্রথম কৈশোরের স্বপ্ন দেখা মানসী সে নয়। কিন্তু সে সব স্বপ্নও ত আর নেই তার মনের ধারে-কাছে কোথাও। এখন কণিকাকে তার পাশে-পাশে কল্পনা করতে এতটুকুও খারাপ লাগে না আর। জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই মেয়েটি পারে—এবং করেও। ওদের বাসন মাজবার ঠিকে-ঝিও নেই, তাও লক্ষ্য করেছে মণি একদিন। ইস্কুল-মাষ্টারের ঘরণী হবারই উপযুক্ত মেয়ে। এর চেয়ে ভাল মেয়ে সে আশা বা কল্পনা করেনা। বস্তুত এ সম্বন্ধে ত চিন্তাই করে নি দীর্ঘকাল। শুধু ক্লান্তিটাই যেন বড় বেশী অনুভব করে সে।...

পনেরোদিন ধরে ভাবল মণি। আর একটা রবিবার এসে পড়ল। এর আগের রবিবার ওদের সাধ্যমত এড়িয়ে গেছে সে। আজ আবারও যেতে হবে ও-বাড়ীতে। প্রত্যহ কিছু ঐভাবে এড়ানো যাবে না। জবাব চাই একটা।

কিন্তু হঠাৎই একসময় সে মন স্থির ক'রে ফেলে। বাড়ী থেকে রওনা হয়ে ওদের বাড়ী যাবার পথে হাঁটতে হাঁটতেই। আর মন স্থির করার সঙ্গে-সঙ্গেই সে অনেকটা নিশ্চিন্ত ও প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। প্রস্তাবটা একটু অদ্ভুত শোনাবে? তা হোক—ওর আর উপায় নেই।...

সেদিন পুলককে আর পড়ানো হয় না। চিন্তা গেছে—উত্তেজনা যায় নি। সেই উত্তেজনা ওকে স্থির থাকতে দেয় না। সে পুলকের টাস্ক্-গুলো কোনমতে

দেখে দিয়ে বলে, 'আজ এই পর্যন্তই থাক্ ভাই।...আমার...আমার শরীরটা আজ ভাল নেই।'

পুলক ব্যস্ত ও লজ্জিত হয়ে উঠে পড়ল। মণি খানিকটা সেইখানেই চুপ ক'রে বসে থেকে মণিকাকে ডাকল, 'মনু, মাসিমাকে একবার ডেকে দেবে?'

আশা ও আশঙ্কায় বিমলের মা'র বুক ঢিব্ ঢিব্ করতে থাকে। কী না জানি বলবে মণি। হে ঠাকুর, হে মা কালী—সুমতি কি হবে ওর?

চা তখনও চাপে নি। সেটা মনুকে আনতে ব'লে অপ্রতিভতা ঢাকতে তিনি তাড়াতাড়ি কতকগুলো মুড়ি গোটা-মশলা দিয়ে মেখে এনে বসলেন।

মণি কিন্তু কুণ্ঠা বা সঙ্কোচের ধার দিয়ে গেল না। সরাসরি প্রশ্ন করলে, 'মাসিমা, কনু—মানে কণিকা কতদূর পড়েছিল?'

'ঐ মেয়েটাই যা হয় তবু একটু পড়তে পেয়েছিল বাবা। ক্লাস এইট, না নাইনেই উঠেছিল বুঝি। হ্যাঁ নাইনে উঠতেই ওর চোখটা গেল, আর পড়া হ'ল না। সে যে কী দুঃখ ওর। বরাবর ও ফার্স্ট সেকেণ্ড হ'ত ওদের ক্লাসে।'

'নাইন হ'লে ত ভালই হয়।... শুনুন মাসিমা, আপনার কথাটা আমি এই ক'দিন ধরেই ভেবেছি। আজ সকাল অবধি ভেবেছি। বিয়ে আমি কণিকাকে করতে পারি—কিন্তু এক সর্তে। ওকে পাশ করতেই হবে একটা। ক্লাস নাইনে যখন উঠেছিল, তায় ভাল মেয়ে বলছেন—একেবারে সব কিছুই ভুলে যায় নি নিশ্চয়। সামনের পরীক্ষাটায় অবশ্য হবে না। পরেরটার এখনও পুরো চোদ্দ মাস দেরী। এই চোদ্দ মাস যদি ভাল ক'রে পড়ে ত পাশ করতে পারবে। আমি ওকে পড়াতে রাজি আছি। আপনাদের ঘরে বসে, আপনাদের সামনেই পড়াবো—আপত্তির কোন কারণ থাকা উচিত নয়। বই-টই আমি যোগাড় ক'রে দেব। পাস করার পর ওকে বিয়ে করতে রাজী আছি। তবে ওকেও চাকরী করতে হবে। সে চাকরী জোগাড় করার ভার আমার। মোদ্দা গলগ্রহ হয়ে থাকা চলবে না। সে অবস্থা আমার নয়। জীবনের সব সুখ-দুঃখ-দায়িত্ব সমান ভাগ ক'রে যে নিতে পারে তাকেই আমি স্ত্রী মনে করি। সে-ই অর্ধাঙ্গিনী। আপনি ভেবে দেখুন কথাটা। মেসোমশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করুন, বিমলকেও বলুন। মেয়েকেও ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা করুন। বিনা মাইনেতে সাধারণ ঝিয়ের মত যে খাটতে পারে

—অর্থ উপার্জনের জন্য অন্য ধরণের খাটুনিতে তার ভয় পাবার কথা নয়। তবু, তাকেই কথাটা ভেবে দেখতে হবে সবচেয়ে বেশি। আমাদের ঘরের বাঙ্গালী মেয়েরা বিবাহিত জীবনের যে ছবি দেখে তাতে দুপুরে বই বুকে ক'রে ঘুমোনো এবং সপ্তাহে অন্তত একদিন সিনেমা দেখা—এইটুকু স্বাচ্ছন্দ্যের কথাই আঁকা থাকে। আমি তাতে রাজী নই।'

মণি আর বসে না। বিস্ময়াভিভূত বিমলের মা কোন কথা খুঁজে পাবার আগেই সে উঠে চলে যায়।

কণিকা প্রস্তাবটা শুনে তখনই কোন উত্তর দিতে পারে না কিন্তু অপ্রত্যাশিত মুক্তির কল্পনাতে যে তার দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং মুখ উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে সেটা তার মা লক্ষ্য করেন শুধু। বিমলের বাবা সেকেলে মানুষ—তিনি খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলেন। এ-সব সর্ত-ফর্ত আবার কি? এর পর, মানে পাস করবার পর সে যদি বিয়ে না করে? চাকরী যদি না জোটে? এই সব নানা প্রশ্ন তুললেন।

কিন্তু বিমল কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠল। মণি সামনে থাকলে সে হয়ত তার পায়ের ধুলোই নিত। তারই প্রবল সমর্থনে তার বাবার ক্ষীণ আপত্তি ভেসে গেল। সে বললে, 'পাশ করবার পর যদি না-ই বিয়ে করে, ক্ষতি কি বাবা? পাসটা ত হয়ে যাবে। তখন ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে অন্তত, বিয়ের বাজারেও কিছু দর হবে। এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব ত আর কিছুই হ'তে পারে না। এমনিতেই ত কিছু হচ্ছে না, কোন চেষ্টা পর্যন্ত আমরা করতে পারছি না। এ ত একটা বড় মুক্তির পথ! এ কথাটা আমারই ভাবা উচিত ছিল, যতদিন ধরে হঠাৎ-একটা-কিছু ঘটবার অপেক্ষায় আছি, ততদিনে হয়ত ওরা এক-একটা পাশ করতে পারত।'

'হ্যাঁ, পারত! সময় কোথা? সংসারের গাধা-খাটুনী খাটবে না পড়বে! টাকা-পয়সা চাই না?' অবিশ্বাস ও সংশয়ের সুর তাঁর কণ্ঠে।

'মণি ত সে ভারও নিতে চেয়েছে শুনলাম। তবে আর আপত্তি করছেন কেন?...আর সময়, যেমন ক'রেই হোক ক'রে নিতে হবে!'

সে মনে মনে প্রায় তখনই প্রতিজ্ঞা করে, ছোট বোন দুটোকেও সে নিজে একটু একটু পড়াবার চেষ্টা করবে। তার খুব সময় নেই হাতে সত্য কথা—তবু যতটা হয়। আরও একজনের সাহায্য নিশ্চয় পাওয়া যাবে—সে পুলক। সে যা শিখেছে তাতে ওদের এখন খানিকটা সাহায্য করতে পারবে—এবং বিমলের মুখ চেয়ে করবেও, এটুকু বিশ্বাস তার আছে।

সে পরের দিন ভোর-বেলাই গিয়ে মণিকে ডেকে তুললে, ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাতে। জড়িয়ে ধরে বললে, 'ভাই তুই দেবতা!'

মণি হাসি-হাসি মুখে বললে, 'ওরে ছাড়, ছাড়। আয় বাইরে আয়। এখানে গোল করিস নি, এখনই আমি বাড়ীতে এ সব কথা জানাতে চাই না। ওরা ভুল বুঝবে হয়ত, তা ছাড়া ইট ইজ টু আর্লি। কি দরকার।··তা হ'লে তোরা য্যাপ্রুভ্ করেছিস আমার স্কীম?'

'য্যাপ্রুভ্! বলিস কি। তোকে আমার মাথায় ক'রে নাচতে ইচ্ছে করছে।'

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে প্রসন্ন মুখে মণি বললে, 'তোর বোনের কিন্তু পয়ও আছে রে। কাল মন স্থির ক'রে মাসিমার সঙ্গে আলোচনা ক'রে ফিরছি, দেখি বাড়ীতে কিলম্যারণক কোম্পানীর একটি বাবু বসে। বলে আলমগীরে রাজসিংহ করতে হবে। আলমগীর করবে ওদের বড় বাবু—শখ হয়েছে অথচ অভিনয়ে একেবারে গরেট। একটা ভাল লোককে পাশে না রাখলে বইটা ঝুলে যাবে, এই সব খোসামুদে কথা। হঠাৎ কী মনে হ'ল—বলে ফেললুম, রাজী আছি—তবে পঞ্চাশটি টাকা নেব। এক কথায় লোকটা রাজী হয়ে গেল। মায় পচিশ টাকা য্যাড্ভান্সও দিয়ে গেল!'

তারপর গলা নামিয়ে বললে, 'তোর কাছে মিছে কথা বলব না—এর আগেও দু-এক জায়গায় টাকা নিয়েছি—মফস্বল অঞ্চলে, তবে সে পনেরো বিশের বেশী নয়। একেবারে এত টাকা—আনথিংকেব্‌ল্! এ ত পাবলিক থিয়েটারের বড় বড় অভিনেতার চার্জ রে!'

খুশীতে ঝলমল করতে থাকে মণি।

'আসিস দেখতে—সামনের শুক্রবারের পরের শুক্রবার। তোর নাম লিখে দিয়েছি, কার্ড পাঠাবে।'

পূর্ণিমা বিমলের সামনে শব্দ ক'রে ফাইলটা ফেলে বললে, 'এবার আমাকে কী খাওয়াবেন খাওয়ান। অসাধ্য সাধন করেছি।'

বিমল হাসিমুখ তুলে তাকাল, 'কী রকম? হঠাৎ কী এমন ক'রে বসলেন?'

'বড়বাবুর কাছ থেকে কাজের সার্টিফিকেট পেয়েছি। আজ নিজে থেকেই স্বীকার করেছেন যে আমার কাজে আর বড় একটা ভুল হচ্ছে না। ঐ যে অরুণা ব'লে মেয়েটি—তাকে ডেকে আমার কাজের দৃষ্টান্ত দিলেন। বললেন, 'এই ত এঁরও আগে আগে কত ভুল হ'ত—তারপর নিজেই কাজ বুঝে নিলেন একটু একটু ক'রে, এখন ত কৈ আর ভুল হয় না। চোখ বুজে ওঁর কাজে সই করা যায়। আপনি ত ওঁর চেয়েও বেশী দিন আছেন—আপনার আজও এতটুকু উন্নতি হ'ল না। বেচারী মুখ চুন ক'রে চলে গেল একেবারে।'

বিমল একটু চিম্‌টি কেটে বললে, 'ও, তাহ'লে আপনার প্রশংসাই শুধু নয়—আবার আর একটি মেয়ের লাঞ্ছনা। এইটেতেই বোধ হয় বেশী খুশী হয়েছেন, না!'

'যান। আপনি ভারি ইয়ে।' পূর্ণিমার মুখ এতটুকু হয়ে যায়, 'আনন্দ ক'রে একটা খবর দিতে গেলুম—'

'বসুন বসুন। অত চটবেন না। যেটা স্বাভাবিক তাই বলছিলুম। এটা আপনিও নিশ্চয় মানবেন যে মেয়েদের লাঞ্ছনা ও অপমানে মেয়েরা যত খুশী হয় এমন পুরুষে কখনও হয় না। মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু মেয়েরাই।'

'তা হয়ত হবে। হ্যাঁ—কতকটা তাই বটে। কিন্তু তা ব'লে, আপনি বড্ড সব তাইতে—'

'ছি। একটা তামাসা করছিলুম বৈ ত নয়। অত বিচলিত হবেন না। কিন্তু খাওয়াবেন ত আপনি, আমি খাওয়াবো কেন?'

'আপনি যে খেতে চান না। নইলে আপনাকেই ত খাওয়ানো উচিত। গুরুদক্ষিণা গুরুর প্রাপ্য।'

'কী দক্ষিণা ?'

'সত্যি বলছি বিমলবাবু, আপনি আবাব হয়ত এখনই আমার কথার উল্টো ব্যাখ্যা কববেন—আপনাব কথাব চাবুকে চাবুকেই আমি খানিকটা কাজ-চলার মত মানুষ হয়েছি। এব যদি কোন ক্রেডিট থাকে ত সে আপনাবই প্রাপ্য।'

'এই দেখুন। এবাব সত্যিই আমাকে অপ্রতিভ কবলেন। মানুষ করার মত কোন যোগ্যতা থাকলে নিজেই হতুম আগে। মিছিমিছি এসব কথা বললে ঠাট্টাব মত শোনায !'

'আমি কিন্তু মোটেই ঠাট্টা কবছি না—বিশ্বাস করুন ! আমি জানি আপনাব শক্তি কতটা—'

'প্লিজ প্লিজ মিস বায—ও প্রসঙ্গ থাক। তাব চেয়ে ববং আপনাব অতিথি হওয়া সোজা—'

'সত্যি ? কথা দিচ্ছেন ?' আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পূর্ণিমাব মুখ।

বিমল তাডাতাডি অপব কথা পাডে। বলে, 'আপনাব বন্ধু জয়ন্তী দেবী এসেছিলেন যে খানিক আগে।

'তাই নাকি ? কখন ? কোথায় গেল সে ? কতকাল যে তাকে দেখি নি। কেমন দেখতে হয়েছে ? কী কবছে কি আজকাল ?'

'দাঁডান দাঁডান। একে একে প্রশ্ন করুন।···এসেছিলেন সকালেব দিকেই। আপনি তখন পেন্‌সনেব ঘবে। দাঁডাতে পাবলেন না—বললেন অনেক কাজ ! তাব ঠিকানা বেখে গেছেন, বিশেষ ক'বে আপনাকে যেতে বলেছেন। দেখতে ভালই—as lovely as ever। আব কবছেন ? এক কোম্পানী কবেছেন—ফিল্‌ম্ তুলবেন।'

'সর্বনাশ। ডুববে যে। এ বুদ্ধি আবাব কে দিলে।'

'দেবাব লোকেব অভাব কি ? কে যেন ওঁকে বুঝিয়েছে যে হাজাব-কতক টাকা হ'লেই ছবি তোলা শুরু হবে—তাবপব টাকা দেবাব লোকেব অভাব নেই, ডিস্ট্রিবিউটারবা আছে। ওঁকে নাযিকা কববে তাবা। এ ছবি যদি সাক্‌সেসফুল না-ও হয, ওঁব একটা ওপ্‌নিং পাবেন, চিবদিনেব মত কেবিযাব হযে যাবে। ওঁকে তারা বুঝিয়েছে, উনি প্রবীণ স্বামীকে বুঝিয়েছেন—কথাটা ত খুবই সোজা!

শশীবাবুর কী সব দামী শেয়ার টেয়ার ছিল, তাই বেচে পনেরো হাজার টাকা দিয়েছেন। উনি এখন মহাউৎসাহে তোড় জোড় ক'রে বেড়াচ্ছেন। সেই উপলক্ষেই আপনাকে খুঁজতে এসেছিলেন, যদি আপনিও কেরিয়ার ক'রে নিতে যান ত চলে যান সোজা—সাইড্ রোলের নাকি অভাব নেই। এমন কি উনি আমাকেও আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে—আমিও যদি ধর-পাকড় করি, দু-একটা খুচ্রো কাজ আমাকে দিতে পারেন। পাঁচ দশ টাকা তাতেও পাবো তবে শুটিং শুরু হ'লে মাঝে মাঝে গিয়ে খবর নিতে হবে।

'ইস্-স্!' মুখে শুধু একটা আওয়াজ করে পূর্ণিমা। তারপর খানিকটা স্তব্ধ হয়ে থেকে বলে, 'আমার এক মামাতো ভগ্নিপতি ঐ ক'রে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। বাপ মরতে তিনচার লাখ টাকা পেয়েছিলেন—তাছাড়া জমিজমা অনেক কিছু ছিল। তিন চার খানা ছবি তুলে সব ডুবিয়ে এখন শুনছি কালীঘাটের কোন্ গলিতে বিস্কুট লজেন্সের দোকান খুলেছেন। ঐ ত ক-টা টাকা জয়ন্তীদির, কী-ই বা থাকবে। যে টাকার জন্য নিজের এতবড় সর্বনাশ করলে সেই টাকাও যদি না থাকে—'

বিমল বললে, 'আপনার মামাতো ভগ্নিপতির রূপযৌবন ছিল না, তাছাড়া তিনি স্ত্রীলোকও নন। মাপ করবেন—এটা জয়ন্তীদেবীর মস্ত বড় অ্যাসেট্। হয়ত ওদিক দিয়ে সত্যিই কিছু সুবিধে ক'রে নিতে পারেন।'

'সে সুবিধের ত বিশ্রীরকম মূল্য দিতে হয় শুনেছি। তাছাড়া ছবি শেষ হ'লে—দেখানো হ'লে, তবে ত ওর নাম হবে। আমার ভগ্নিপতির মুখেই শুনেছি, পরের টাকার ভরসায় বহু ছবিই খানিকটা তোলা হয়ে পড়ে আছে। শেষ হয়নি।' মাথা হেঁট ক'রে পূর্ণিমা বলে।

'কিন্তু এ ছাড়া ওঁর যে উপায় ছিল না মিস্ রায়। যখন খুব অভাব ছিল, তখন ভেবেছিলেন শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই ওঁর যা-কিছু কষ্ট। কিন্তু সেটার যখন অভাব রইল না তখন দেখলেন যে অভাব যেমন নেই তেমনি জীবনে আর কোন রসও নেই। না আনন্দ, না উত্তেজনা, না আশা। সন্তান হবে না, প্রৌঢ় স্বামী—থাকল শুধু প্রসাধন ও বেশভূষা, তা প্রসাধন দেখবারও লোক নেই একজন। যে নারী বেশভূষা করতে ভালবাসে তার পক্ষে পুরুষের সপ্রশংস দৃষ্টি ছাড়া বাঁচাই

অসম্ভব যে। ··তাছাড়া এধারেও দেখুন, সংসারে কোন পরিজন নেই, ঝি-চাকর আছে, হাতে কোন কাজ-কর্মও নেই। একা একা কর্মহীন দিনরাত্রি কাটানো—সে যে কী সাংঘাতিক dull এবং একঘেয়ে জীবন তা আপনারা কোনদিন ভাবতেও পারবেন না। এমনি এক-আধজনকে দেখবার সুযোগ হয়েছে আমার—কর্মাভাবে তাঁরা যে কী অকর্ম না করেন তার ঠিক নেই। শুধু ঐ monotony ভাঙ্গবার জন্যে! তাও তাঁদের কারুরই জীবন জয়ন্তীদেবীর মত বিবর্ণ বা আশাহীন নয়। এ যে ওঁকে করতেই হবে। ওঁর নির্বুদ্ধিতার এই-ই স্বাভাবিক পরিণতি। এ পথে অর্থ না থাক—উত্তেজনা ত আছে।···আমরা খুব বেঁচে গিয়েছি মিস্ রায়, গরীবের জীবনে সব কিছুর অভাব আছে—উত্তেজনার অভাব নেই। নষ্ট করবার মত কর্মহীন প্রচুর অবসরও নেই। আপনি সহজে ওঁর দুঃখ বুঝতে পারবেন না।'

সে একটু হেসে কাগজের টুকরোটা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'এই নিন—ওঁদের নতুন অফিসের ঠিকানাটা। বেলা তিনটে থেকে সাতটা অবধি উনি নিজেই থাকেন।'

'ধন্যবাদ। তবে ও ঠিকানার বোধ হয় কোন দরকার হবে না।'

পূর্ণিমা অন্যমনস্ক হয়ে বসে বসে বহুক্ষণ পরে কাগজটাকে গুটি পাকিয়ে এক সময় পায়ের কাছে রাখা ঝুড়িটায় ফেলে দিলে। তারপর একটা ফাইল টেনে নিয়ে জোর ক'রে কাজে মন দিলে।

বিমলের সামনে ফাইল খোলাই ছিল কিন্তু সে আরও বহুক্ষণ কাজে মন বসাতে পারলে না। বেচারী জয়ন্তী, ওকে দেখলেই কে জানে কেন বিমলের ফুটন্ত ফুলের কথা মনে পড়ে যায়। কোথায় ওর মুখে চোখে একটা নিষ্পাপ শুভ্র পবিত্রতার ভাব আছে, শত প্রসাধন এবং বিলাসিতাতেও যেটা চাপা পড়ে না। হয়ত এর সবটাই ওর অনুমান অথবা কল্পনা—অথবা অকারণ পক্ষপাত। তবু আজও, লাল শাড়ী এবং মূল্যবান প্রসাধনে, তাকে অভিজাত শ্রেণীর গোলাপের মতই মনে হচ্ছিল।

এ কী পথে গেলে জয়ন্তী, কেন গেলে!

মন থেকে একটা ক্লান্তি এবং পরিতাপ যেন কিছুতেই যায় না বিমলের।

ছুটির পর সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে পূর্ণিমা পিছন থেকে কথাটা মনে করিয়ে দিল, 'আপনি আজ আমার অতিথি, মনে আছে—কথা দিয়েছেন ?'

আজও বিব্রত বোধ করে বিমল কিন্তু কে জানে কেন কোন রূঢ় বা কঠিন জবাব দিতে পারে না। বরং সবিনয়ে বলে, 'আজ থাক্ না—আর একদিন হবে। কথা ত আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি না। তার চেয়ে বরং চলুন একটু মাঠে গিয়ে বসি, অনেকদিন বসা হয় নি। ভাগ্যে যদি থাকে ত চাইকি চানাচুর আর কলসীর চা-ও জুটে যেতে পারে একটু।'

পূর্ণিমা আর আপত্তি করল না। লক্ষ্য করলে বরং দেখা যেত যে বিচিত্র এবং অজ্ঞাত কোন কারণে একটা সুখেরই আবেশ লাগে তার চোখে মুখে, কপোলে ঈষৎ রক্তোচ্ছ্বাসই দেখা দেয়।

রেস্তোরাঁ কি কোন খাবারের দোকানের ভীড়ের মধ্যে কোন রকমে খাওয়াটাই হ'তে পারে, সেখানে সাহচর্য এমন কি সান্নিধ্যের আনন্দটাও পুরোপুরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। মাঠের এই বিপুল প্রসারতার মধ্যেই কেমন একটা অন্তরঙ্গতার হাওয়া আছে। বহুলোকের মধ্যেও অনায়াসে সেখানে দুই তিন বা চার জনে ঘনিষ্ঠ হতে বাধে না। সেই অবারিত অন্তরঙ্গতায় অপরাহ্ণের এই অবসন্ন আলোতে দু'জনে সামনাসামনি বা পাশাপাশি বসে গল্প করার সম্ভাবনাতেই সে খুশী হয়ে উঠল। শুধু এই টুকুর জন্যেই ওর মন আজকাল যে উন্মুখ হয়ে থাকে সেটা ওর নিজের কাছেও আর অজানা নেই—এই কাছাকাছি বসে একান্তে একটু গল্প করার জন্যই। অথচ আজকাল এটাও যেন দুর্লভ হয়ে উঠেছে।...

বেছে বেছে একটা পরিষ্কার জায়গা দেখে ওরা বসল। পাশাপাশি নয়, সামনাসামনি। পথে আসতে আস'তে ছোলাভাজা কিনেছে বিমল, ছোলাভাজা আর লঙ্কাবাটা মিশোনো নুন কাগজে ক'রে। নিজের রুমালখানা ঘাসে পেতে ছোলাভাজাগুলো তাতে ঢেলে দিলে সে।

'নিন, চালান। একটা চা-ওলা দেখতে পেলে বলবেন, ডাকব। ঐ যে যারা কলসী ক'রে চা বেচে।'

'ওগুলো বিষ।'

'কে বললে আপনাকে ? ঐ যে চৌরঙ্গীর ওপর বড় দোকান—যার বয়রা

ফরসা জামা পরে এসে দাঁড়ায়—তাদের চা তৈরী করা দেখেছেন কখনও? এক পাতা ক-বার ফুটোয় তারা, এবং কাপগুলো কেমন ভাবে ধোয়?···চা ক'রে ছেঁকে নিয়ে এরা সেটা দীর্ঘকাল ধরে গরম করছে—এছাড়া এদের কোন অপরাধ নেই। ভাঁড়ে দেয়, ওদের কাপের চেয়ে ঢের ভাল।'

একটু থেমে হেসে বললে, 'বা রে, আমি বক্তৃতা করছি আর আপনি দিব্যি ছোলাভাজা চালিয়ে যাচ্ছেন!'

পূর্ণিমাও হাসল। মিষ্টি প্রাণভরা হাসি। বললে, 'মন্দ বলেন নি। এ যেন সেই দুই সতীনের গল্প। জানেন সে গল্প? এক থালায় ছাতু মেখে দুই সতীনে খেতে বসেছিল। বড়টা চালাক, খেতে শুরু ক'রেই ছোটটাকে বললে, ও সতীন, কেম্‌নে মলা বাপ? তোমার বাবা কেমন ক'রে মারা গেলেন? সে বেচারী সহানুভূতিশীল শ্রোতা মনে ক'রে মহা-উৎসাহে হাত পা নেড়ে বলছে। বলতে বলতে তার কান্না পেয়ে গেছে, কাঁদছেও। এদিকে বড়টি খপ্‌খপ্‌ ক'রে খেয়ে যাচ্ছে···শেষে ছোট সতীন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে যখন পাল্টা প্রশ্ন করলে তখন বড় কিন্তু সে দিক দিয়েই গেল না, শুধু বললে—ফুলল আর ম'ল।···এই দেখুন, আমি আবার আপনার চেয়ে বেশী কথা বলে ফেললুম। ঠকলুম আমিই—আপনার কম খাওয়াটা পুষিয়ে গিয়েও বেশী খেয়ে নিলেন।'

দুজনেই হেসে উঠল আবার। বেশ সরব হাসি।

ইতিমধ্যে এক কলসীওয়ালাকে দেখা গেল দূরে। বিমল উঠে গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এল। দু' ভাঁড় চা নিয়ে জাঁকিয়ে বসে বললে, 'ছোটখাটো পিকনিক্ একটা—কী বলেন?'

'তা বটে।' পূর্ণিমা চারিদিকে তাকিয়ে বললে, 'আমরা রুচির জাত বলে গর্ব করি—কিন্তু এই মাঠটাকে ক বছরের মধ্যেই কী বিশ্রী ক'রে ফেললুম বলুন ত! যুদ্ধের সময়ও এত নোংরা হয় নি এবারটা।'

'রুচিবোধেরও একটা শিক্ষা আছে মিস রায়। সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত—এসবও বুঝতে গেলে যেমন কিছু কিছু শিক্ষা লাগে—তেমনি সুন্দরভাবে বাঁচব, রুচিসম্মত পরিবেশে বাস করব—এই মনোবৃত্তিও শিক্ষা-সাপেক্ষ। শুধু তাই নয়, কোন্‌টা সুন্দর ও রুচিসম্মত তাও শেখা দরকার। ইংরেজরা বহুদিন অভাবের হাত থেকে

মুক্তি পেয়েছে, বহুকাল ধরে স্বাধীন ভাবে মাথা উঁচু ক'বে মানুষেব মত বেঁচেছে তাদেব এসব শিক্ষার অবসর ছিল। আমাদেব কী ঐতিহ্য তা ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

'তা শুনব না বিমলবাবু, এবই মধ্যে ঠাকুর পবিবাব এদেশে জন্মেছেন।'

'ওটা ভগবানেব আর্ষ-প্রযোগ।'

এমনি চলে দু' একটা খুচবো আলাপ। পশ্চিম আকাশ থেকে শেষ বশ্মি বিদায় নেয। জেগে থাকে শুধু একটা বক্তাভা। চৌবঙ্গীব পথে আলোগুলো উজ্জ্বল হযে উঠতে থাকে ক্রমশঃ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হযে যায একটু একটু ক'বে।

তবু পূর্ণিমাব উঠতে ইচ্ছা করে না। এ যেন একটা দুর্লভ অবসব। কেন দুর্লভ তা সেও জানে না। এই যা আলাপ ওদেব হচ্ছে, তা অফিসেও হয প্রত্যহ —অপ্রত্যাশিততা নেই কোথাও। তবু ভাল লাগে ওব।

অবশেষে বিমলই মনে কবিযে দেয়, 'আপনাব ত আবাব ঘরকন্না আছে— উঠতে হবে ত?

'হ্যাঁ হবে।...তবে কদিন থেকে ঝি আসছে, বাসনটা নিযে হযত বসতে হবে না আব।...এক রান্নাটা...দেবী দেখলে হযত মা-ই চডাবেন।...উঠি এবাব।... প্রতিদিনই ঘডি ধবে দিন-বাত ছুটোছুটি, এ কী আব ভাল লাগে? তাই এক-আধদিন এমনি ফ্রেঞ্চ্ লীভ নিতে হয।...আপনাবও ত টিউশনী আছে?'

'আছে বৈ কি! না থাকলে কি আব চলে। ওটা বোধ হয় আমবণ থাকবে—'

দুজনেই উঠে দাঁডায়। চলতে চলতে হঠাৎ পূর্ণিমা বলে, 'আমাকে একটা টিউশনী দেখে দিতে পাবেন? খুব ভালোতে আমাব লোভ নেই, মাঝাবী গোছেব একটা পেলেই বেঁচে যাই। আপনাবা ত নিয়মিত কবেন—নিশ্চযই মধ্যে মধ্যে খোঁজ খবব আসে। দিন না একটা দেখে। নিচেব ক্লাসেব ছেলেও ত পডাতে পাবি—'

'হঠাৎ এ খেয়াল আবাব ঘাডে চাপল কেন? একটু আগেই ঘডি ধবে ছুটোছুটি কবাব কথা বলছিলেন না?...এ ত আবও বাডবে। ববং সরকাবী চাকরী বা গৃহস্থালী কাজে ফাঁকি চলে, গড়িমসিও চলে কিন্তু এঁবা যে কী চীজ তা জানেন না—এই প্রাইভেট ছাত্রের অভিভাবকরা।'

'কিছু কিছু জানি বৈ কি। তাই ত এতদিন প্রাণপণে এড়িয়ে চললুম কিন্তু আর যে চলছে না। বাবা একেবারেই ইন্‌ভ্যালিড হয়ে পড়েছেন। তাঁর যা কষ্ট, চোখে দেখাও যায় না। অসুখ সারবে না তা জানি—তবু কতকটা রিলিফ দেবার জন্যেও ডাক্তার ডাকতে হয়—নিয়মিত ওষুধে ডাক্তারে যে কত পড়ছে তা শুনলে পাগল বলবেন আমাকে, অত খরচ করেছি ব'লে। অথচ কীই বা করি তাও ত বুঝছি না। মার বাক্সে বোধ হয় সোনার একটা কুচিও নেই। এবার বাসনে টান পড়বে। দাদা গত পূজোয় তিন মাসের বোনাস পেয়ে ত্রিশটি টাকা দিয়েছিলেন—সেই যা বাড়তি আয়। তাঁরও নাকি সংসার চলছে না।· মালুটা রোজগার করতে শুরু না করলে বিন্দুমাত্র হাঁফ ছাড়তে পারব না।· সত্যি, দেখবেন একটু খোঁজ-খবর ক'রে? কোথাও আমার এমন কেউ নেই, যে এটুকুও করে। আমি কোথায় নিজে নিজে চেষ্টা করি বলুন ত।'

ততক্ষণে ওরা এস্‌প্লানেডের মোড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। বিমল অনেকক্ষণ পরে এইবার পূর্ণিমার মুখের দিকে চেয়ে দেখল। সে কেমন একটা বিহ্বল শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পথের দিকে। মেট্রোর বহু-বাতির উজ্জ্বল আলোটার প্রতি-ফলন এসে পড়েছে ওর মুখে। সেই আলোতে ওকে বড় করুণ—বড় ম্লান লাগল। সেই সঙ্গে—এই প্রথম বিমলের মনে হ'ল—সুন্দরও। চোখ দুটো ভাল ক'রে দেখা না গেলেও বেশ বোঝা যায় যে সে দুটো জলে ভরে এসেছে। হয়ত সেই জন্যেই সে বিমলের দিকে চাইতে পারছে না—চোখে চোখ পড়লে এখনি হয়ত ভেঙে পড়বে—

অকস্মাৎ বিমল যেন ওর প্রতি অপরিসীম একটা মমতা বোধ করল। অসহায়, নিতান্ত বেচারী মেয়েটি।···

সে যে কী করছে তা বোঝবার আগেই পূর্ণিমার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সামান্য একটু চাপ দিয়ে বিমল ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠে বললে, 'নিশ্চয়ই—আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব মিস রায়। প্লীজ, প্লীজ, বি ব্রেভ।'

তারপরই—সম্ভবত নিজের এই আকস্মিক হৃদয়াবেগের চেহারাটা নিজের কাছে ধরা পড়েই—যেমন হঠাৎ ওর হাতখানা ধরেছিল, তেমনি হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে—বলতে গেলে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়ল সে।···

পূর্ণিমা সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল—বহুক্ষণ ধরে। কী যে হয়ে গেল তা যেন সে বুঝতেও পারলে না, শুধু একটা অসহ্য পুলক-বেদনায় সারা দেহটা রিন রিন করতে লাগল। হাতের যেখানটা বিমল হাত দিয়ে ধরেছিল সেখানটা দপ্ দপ্ করছে, অদ্ভুত একটা উষ্ণতা সেখানে। তার তাপ কোন এক বিচিত্র উপায়ে সে নিজেই যেন অনুভব করছে। তবু কী যে ঠিক পারছে আর কী যে পারছে না—তাও সে সবটা জানে না। দাঁড়িয়েই রইল সে—তেমনি অভিভূত হয়ে। অনেকক্ষণ পরে কেউ কেউ ওর মুখের দিকে বিস্মিত এবং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে এইটে অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ওর সম্বিৎ ফিরে এল।

বিস্ময়ের কারণটা আবিষ্কার করতেও দেরী হ'ল না। গালে হাত দিয়ে দেখল জল—চোখ দিয়েই পড়েছে, হয়ত তখন থেকেই পড়ছে। সেই বিমল চলে যাওয়ার সময় থেকেই। অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি নিজের আঁচলেই চোখটা মুছে ট্রামের দিকে এগিয়ে গেল সে।

ট্রামের ভীড়ে কোলাহলে ঠেলাঠেলিতে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হ'ল পূর্ণিমা। বাড়ীতে গিয়েও আর বিন্দুমাত্র অবসর রইল না নিজের চিন্তায় নিজে ডুবে থাকার। চিন্তাও বিলাস হ'য়ে ওঠে সময়ে সময়ে—কিন্তু তার জন্য নির্জন অবসর চাই। বহুকাল পরে মা'র সেই কলিকটা উঠেছে, বাবাও একটু বেশী বিগড়েছেন আজ। মালু তাঁদের নিয়েই বিব্রত। ঝি উনুনে আঁচ দিয়ে চলে গিয়েছিল, সেটা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। নতুন ক'রে আঁচ দিতে হ'ল। বাবার নিষ্ফল উষ্মা ও মা'র খেদোক্তি—এগুলো অঙ্গের ভূষণ হয়ে গেছে; কিন্তু আজ দুটোই যেন নতুন ক'রে আঘাত করল ওকে—নিজের অবস্থা সম্বন্ধে আবারও সচেতন ক'রে দিল। ওর এ সব সাজে না। অবসর নেওয়ার অবসর নেই।

তারপর যথারীতি এক হাতে কুটনো বাটনা রান্না রোগীর সেবা। মা'র গরম জলের ব্যাগ, বাবার পুরোনো ঘিয়ের মালিশ। তাঁর পথ্যও চাই ঠিক ন-টার মধ্যে। একেবারে অবসর মিলল রাত এগারোটার পর। মা ঘুমিয়ে পড়েছেন একটু। বাবা আর শুতে পারেন না—বালিশে ঠেস দিয়ে তিনিও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছেন। মালু

টেবিল-ল্যাম্পটা আড়াল দিয়ে বসে নিঃশব্দে অঙ্ক কষছে। এইবার ওর ছুটি।

খাওয়া হয়নি। খেতে অবশ্য হবেই—কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে ইচ্ছা করছে না। পূর্ণিমা আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ছাদে যেতে পারলে খুশী হ'ত কিন্তু ছাদটা বড়ই নোংরা হয়ে আছে। ভাড়াটেদের ব'লে ব'লে কিছুতেই পারে না—এর চেয়ে বেশি বলতে গেলে ঝগড়া করতে হয়।

খানিকটা ইতস্তত ক'রে ওপরে ওঠবার একটা সিঁড়িতেই এসে বসল সে। সকলকার চোখের বাইরে, কোলাহলের বাইরে একটুখানি অবসর ওর চাই-ই। জীবনে কোন অপ্রত্যাশিত আনন্দদায়ক ঘটনা ঘটে গেলে প্রত্যেক মানুষই চায় অন্তত খানিকক্ষণ ধরে মনে মনে সেই বিস্ময় ও আনন্দানুভূতির রোমন্থন করতে। সে-অবসর যে পায় না—তার মনে হয় যেন কিছু একটা বড় রকমের লোকসান ঘটল। পূর্ণিমারও আজ সেই মনোভাব, তার তাই আজ একটুখানি নিঃশব্দ নির্জন অবসর চাই-ই। বেশি দেরি হ'লে যেন হারিয়ে যাবে এই বৈচিত্র্য, এই অভাবনীয়তার আস্বাদ। রাত পোহালে চলবে না।

অথচ এই অভাবনীয়তাটা যে কী, তা নিজের মনের কাছেও প্রশ্ন ক'রে স্পষ্ট জবাব শোনবার যেন সাহস নেই তার। সে কি বিমলের সহানুভূতি, সে কি ওর ঐ হাতের সামান্য স্পর্শটুকু,—সবটা জড়িয়ে—? না কি আরও কিছু? তা সে জানে না। জানতেও চায় না। শুধু আজ এই প্রথম জানল যে তার দুঃখের কথা শোনবার, তার ব্যথাবেদনায় সহানুভূতি জানাবার একটি মানুষ আছে পৃথিবীতে এবং সে ঠিক সাধারণ যে-কোন মানুষ নয়। জীবনের সব কিছু সমস্যায়, সব কিছু জটিলতায়, সব কিছু সংঘাতে যে লোকটির ওপর নির্ভর করতে চায় সে—এ সেই লোক। মানুষ দুঃখে দৈন্যে বিপদে নিজের কথা জানাতে চায় কাউকে, সহানুভূতি চায় কারুর কাছ থেকে। সে রকম যে-কাউকে পেলেই খুশী হয়, কিন্তু বিশেষ কাউকে পেলে সে খুশীর সীমা থাকে না—অন্তর উপ্‌চে ওঠে আনন্দে। বরং অনেক সময় বহুলোকের সহানুভূতি পেয়েও তার তৃপ্তি হয় না—বিশেষ একটি লোকের সান্ত্বনার অভাবে জীবন তার বিষাক্ত হয়ে যায়।

বিমল পূর্ণিমার সেই বিশেষ লোক। কেন—তা সে জানে না। এ-ও সে

স্পষ্ট জানে না যে এতকাল এই লোকটিকে খুশী করতে, তার সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সে একরকম প্রাণপণ সাধনাই করেছে।

জানে না বলেই ঘটনাটার অপ্রত্যাশিততা তাকে এত বিচলিত এবং অভিভূত করেছে। তাই তার চমকে সারা দেহে-মনে ওর এই অদ্ভুত বিচিত্র এক অনুভূতি —তাই সে স্মৃতির রোমন্থনে ওর এই রোমাঞ্চ।…

অনেকক্ষণ পরে সেদিন সেই স্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে নিজের মনোভাব সম্বন্ধে একটা দারুণ সংশয় ওর মনেও হয়ত দেখা দিয়েছিল!

কিন্তু অবচেতনার অতলান্ত সমুদ্র থেকে সে সংশয় পরিষ্কার কোন রূপ পরিগ্রহ করার আগেই কঠিন শাসনে তাকে সেই অন্ধকারেই ফিরিয়ে দিলে সে।

বিমল অসাধারণ। বিমলকে সে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে। তার বেশি কিছু নয়।

দুর্বাসা প্রসন্ন হয়েছেন, পাথরের দেবতা পূজা গ্রহণ করেছেন, তাইতেই সে এত খুশী, তাইতেই তার এত আনন্দ!

২০

বেয়ারা এসে খবর দিলে, এক বুড়োবাবু বড় গেট্‌টার কাছে অপেক্ষা করছেন, ছুটি হ'লে বিমলবাবু যেন তাঁর খোঁজ করেন।

বিমল যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হ'ল, একটু উৎকণ্ঠিতও হ'ল। বুড়োবাবু? কে বুড়োবাবু? বাবা নয় ত? কোন বিপদ-আপদ—?

সে বললে, 'কেমন দেখতে সে বাবু? নাম কি বললেন? এখানে নিয়ে এলে না কেন শ্রীনাথ?'

শ্রীনাথ বেয়ারা মুখটা বিকৃত ক'রে বললে, 'কালো-মত, খুব রোগা এক বাবু।'

'চোখে চশমা আছে? দেখতে পান চোখে?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ! দেখতে পান বৈ কি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফটকে লটকানো নোটিশ-

গুলো পড়ছেন।···আমি ত বললুম আসতে···তিনি কিছুতে এলেন না। বললেন, অফিসের কাজের সময় বিরক্ত করা ঠিক নয়। আমি দিব্যি বেঞ্চিতে বসে থাকব, কোন কষ্ট হবে না। দেরি হ'লেও এমন কিছু ক্ষতি হবে না। তুমি বাবা গিয়ে একটু খবর দাও, মানে অন্য কোন দোর দিয়ে না বেরিয়ে যান।'

কতকটা আশ্বস্ত হ'ল। বাবা নন। এমন কি অভিলাষ বাবুও নন নিশ্চয়ই—অফিসের সময় সম্বন্ধে তাঁর অত বিবেচনা থাকত না, তিনিও কেরাণী।

কৌতূহলের শেষ থাকে না তার। আজই একটা খুব জরুরী কাজ হাতে রয়ে গেছে—এখনই শেষ ক'রে দিতে হবে। দিল্লী থেকে বড় কর্তা এসেছেন, কন্‌ফারেন্স আছে। এই ফাইলটা লাগবে তাতে। সুতরাং এখন উঠে যাবার কোন উপায় নেই। অগত্যা সে কাজের ওপরই ঝুঁকে পড়ে। সাড়ে চারটে বেজে গেছে, ছুটিরও খুব বেশি দেরি নেই। হাতের কাজ শেষ হ'লেই উঠে পড়তে পারবে।

কাজ যতই জরুরী হোক্—মনের একটা অংশ সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত পরিচিত বৃদ্ধ ব্যক্তির নামের তালিকা রচনা ক'রে যেতে লাগল। এমনও সন্দেহ হ'ল, কোন ঘটক নয়ত? সে শুনেছে বুড়ো ঘটকরা এইভাবে অফিসে অফিসে পাত্রদের তাড়া ক'রে বেড়ায়। কিন্তু অনুমানের পিছনে পিছনে বহুদূর অবধি তার মন ছুটেই বেড়াল শুধু, কোন মীমাংসাই হ'ল না। শুধু হাতের কাজটাতেই দেরি হয়ে গেল মিনিট কতক, বড় সাহেবের লোক এসে দু'বার ঘুরে গেল।

অবশেষে এক সময় কাজ শেষ হ'ল—ছুটির সময়েরও বেশ খানিকটা পরে। কোনমতে খাতাপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে বেশ একটু দ্রুত পদেই নেমে এল বিমল। কিন্তু নেমে এসে যাঁকে দেখতে পেল সে—এতক্ষণের এত অনুমানের ধারে-কাছেও তিনি ছিলেন না।

পূর্ণ মাষ্টার মশাই!

তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে প্রণাম ক'রে বিমল বললে, 'কী ব্যাপার মাষ্টার মশাই, হঠাৎ এমন সময়ে, এখানে? এমন ভাবে?'

পূর্ণবাবু একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ—মানে কাল রাত্রেই এসেছি। নাতনীর ওখানে কাটিয়ে এলুম অনেক-ক'মাস। তিন চার মাস।'

'তা আমাকে খবর দিলে ত আমিই যেতে পারতুম। আপনি আবার এই শরীরে এতখানি পথ বাসে ট্রামে কেন আসতে গেলেন ?'

'না, শরীরটা আমার ওখানে গিয়ে বেশ সেরেছে। সাবে নি ? আমি ত বেশ জোব পেয়েছি।···তা ছাড়া—ব্যাপারটা হ'ল কি জানিস বাবা, এত কথা বলবার আছে তোকে যে এখানে পৌছে আর যেন একটুও অপেক্ষা করতে পারলুম না। সকালেই যেতুম, তোব বাড়ীব ঠিকানাটা ঠিক জানি না ব'লেই—। যে দিন থেকে মনে ঠিক-পেলুম কথাটাব, ঠিক বিশ্বাসটি জন্মাল, সেদিন থেকে ক-টা দিন বলতে গেলে ছট্ ফট্ করেছি। এই চাব পাঁচ দিন যে কী ক'বে কাটিয়েছি তা আমিই জানি।···মনে হ'ত যে ছুটে চলে আসি। রুণু আরও এক মাস থাকবার জন্যে খুবই পেড়াপীড়ি করেছিল কিন্তু আমি কিছুতেই থাকতে পারলুম না। তোকে না বলা পর্যন্ত স্থির হ'তে পারছি না।'

বিমল হাসল। বললে, 'কী এমন কথা ?···তা চিঠিতে লিখলেই ত হ'ত। আর কিছুদিন ওখানে থেকে শরীরটা ভাল রকম সারিয়ে এলেই ভাল করতেন। মিছিমিছি—'

'এই বয়সে আর কত সারবে বাবা। তাছাডা জামাই-বাড়ী, একমাস একমাস ক'রে কতদিন হয়ে গেল। আব কি ভাল দেখায়।···তবে কি জানিস, চিঠি লেখার কথাটা মনে পড়ে নি। খুবই অবসর ছিল, লিখলে লেখা যেত।'

ততক্ষণে পথে বেরিয়ে পডেছেন ও'রা। পূর্ণবাবু বললেন, 'একটু কোথাও বসতে হবে বাবা বিমল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।'

'চলুন, ঐ মাঠটায় গিয়ে বসি। তা ওপরে যান নি কেন ?'

'না, না। সে ভাল নয়। অফিসের কাজেব সময় গিয়ে, কাজে বাধা সৃষ্টি করব কেন। আমি ত অফিসের কাজে যাই নি, এমন কোন জরুরী কাজও নেই। মিছিমিছি ক্ষতি করা বৈ ত নয়—'

বিমল হাসল একটু, বলল, 'অফিসের কাজ সম্বন্ধে আপনার মত শ্রদ্ধা যদি আমাদের থাকত মাষ্টার মশাই !'

তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আপনি ইদানীং কোন সরকারী অফিসেব মধ্যে গিয়ে বসেন নি—না ?'

পূর্ণবাবু বিস্মিত হলেন একটু, 'কেন বল্ত ? না, সেই ইস্কুল ছাড়বার পর থেকে আব যাই নি! তখন মাঝে মাঝে যেতে হ'ত ইন্‌স্পেক্টারের অফিসে। তাও অবিশ্যি যাকে অফিসেব ভেতব যাওযা বলে তা কখনও যাই নি। স্লিপ পাঠিয়ে ওঁব খাস কামরাব বাইবে অপেক্ষা কবতুম, ডাক পড়লে যেতুম।'

বিমল বলল, 'ও তাই। আপনি মনে করেন আমবা সবাই একমনে ঘাড় গুঁজে কাজ ক'রে যাই, না? অত মনোযোগ দিয়ে কর্তব্য পালন কবলে আর ভাবনা ছিল না মাষ্টাব মশাই। শুধু সবকাবী অফিস কেন—প্রায সব অফিসেই—আমবা কদিন পুবো সময কাজ কবি বলুন ত। মাসে সাত-আটটা দিন হয় ত ঢেব। আড্ডা এমনিই এত চলে অফিসেব মধ্যে যে এক-আধ দিন এক-আধ জন এলে গেলে কোন ক্ষতি হয় না। লোকে কি আব খুব মিথ্যা দুর্নাম দেয়? এ-ত প্রায সবাই জানে যে, সবকাবী কাজেব মা-বাপ নেই।'

ততক্ষণে ওরা পথ পেবিয়ে একটু ঘাসেব খোঁজ পেয়েছে। পূর্ণবাবুর কষ্ট হচ্ছে দেখে বিমল সেইখানেই বসে পড়ল। অফিস-ফেবৎ বাবুর দল দু একজন একটু অবাক হয়ে তাকাল কিন্তু ওদেব দুজনেব কারুরই সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। কৌতূহলটাই বিমলেব সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে সেটা অস্বীকাব করার কোন উপায় নেই। সে বসে পড়েই প্রশ্ন কবল, 'তাবপব? ব্যাপাবটা কি বলুন ত? এমন অস্থিব হয়ে চলে এসেছেন, এমন কী জরুবী কথা?'

'বলছি।' পূর্ণবাবু যেন দম নেবাব জন্যই স্থিব হয়ে বসলেন। কিছু দিন আগে বিমলের শক্ত কথাগুলো যেমন তাঁব হৃদযাবেগে আলোড়ন জাগিয়েছিল, আজও তিনি তেমনি একটা আলোড়ন অনুভব কবছেন। বহু দিনেব বিস্মৃত বেদনা যেন আজও আব একবাব সুপ্তি-সমুদ্র থেকে বেবিযে আসতে চাইছে, স্মৃতির দুযাবে পড়ছে ঘা। হঠাৎ তখনই কথা কইতে পারলেন না পূর্ণবাবু।

বিমল স্থিব হযে বসে বইল। তাব এই দবিদ্র অবহেলিত মাষ্টাব মশাইকে শুধু সে শ্রদ্ধাই কবে না—ভালও বাসে। তাই সে তাঁব চবিত্রেব সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং বহস্য জানে। কোন এক কাবণে তাঁব অন্তবেব মর্মমূল আহত হয়েছে, তাই এভাবে ছুটে এসেছেন। আঘাত এবং আবেগ সামলাতে সময় দিতে হবে।

মিনিট কতক পরে পূর্ণবাবু চোখ খুললেন। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে

বসলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'সেই সেদিন—মানে যেদিন ওরা 'আমার ঐ—' বলতে বলতে থামলেন এক মুহূর্ত, বোধ করি নিজের সম্বন্ধে 'সংবর্ধনা' শব্দটা উচ্চারণ করতেই বাধছিল তাঁর, 'ঐ সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছিল, সেদিন তুই যে কথাগুলো বলে এসেছিলি—মনে আছে? তারপর থেকে আর সে কথাগুলো ভুলতে পারি নি রে। কদিন না পেরেছি ভাল ক'রে খেতে, না পেরেছি ঘুমোতে। অহোরাত্র শুধু ঐ কথাগুলোই ভেবেছি।'

বিমল হাত বাড়িয়ে ওঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, 'সে আমার অমার্জনীয় ধৃষ্টতা হয়েছিল মাষ্টার মশাই, আমার সেটা অপরাধ।'

পূর্ণবাবু এবার মুখ তুলে চাইলেন। হাসলেনও একটু। বললেন, 'ধৃষ্টতা বললি, অপরাধ বললি—কিন্তু ভুল বলতে পারলি না। আমি জানি তুই তোর জ্ঞান-বুদ্ধি-বিশ্বাসের ওপর জোর রেখে সত্যি জেনেই বলেছিলি কথাগুলো। তাই ত আমি অত অস্থির হয়েছিলুম।...তুই ত জানিস, কোন কাজ কি আচরণ ভুল বলে বা অন্যায় বলে বুঝলে তার সংশোধন কি প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত আমি স্থির থাকতে পারি না। তোর কথা সত্যি হ'লে আমার সমস্ত জীবনটাই যে ভুল হয়ে যায়!'

আবারও কয়েক মুহূর্ত থামলেন তিনি। হয়ত বা সেই সাংঘাতিক সম্ভাবনার পূর্ণ গুরুত্ব কল্পনামাত্র ক'রেই, শিউরে উঠলেন। তারপর বললেন, 'ভাবনার যেন কোন কূলকিনারা ছিল না। মনে মনে জানা অজানা কত কথাই তোলাপাড়া করেছি, সমর্থন খুঁজেছি নিজের আচরণের। কিন্তু আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই—মনে কোন জোরই পাই নি। মনে হয়েছে তোর কথাই ঠিক। যে লেখাপড়া শেখাটা মানুষের জীবনে সব চেয়ে দরকারী কাজ বলে মনে হয়েছে—বুঝি তার সত্যিই কোন মূল্য নেই। যে জীবন তাকে যাপন করতে হবে সেই জীবনের উপযোগী হাতিয়ার সংগ্রহই তার দরকার। অন্নবস্ত্রের কথাটাই সবচেয়ে বড় কথা! কিন্তু ওখানে গিয়ে সে ভুল আমার ভেঙ্গেছে! আমি নিজের মনে জোর পেয়েছি। আজ আমি নিশ্চিন্ত।'

পূর্ণবাবু বিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কিন্তু বিমল কোন উত্তর দিলে না—তাঁর দিকে বিস্মিত চোখ মেলে নিরবে চেয়ে রইল শুধু।

খানিকপরে পূর্ণবাবুই আবার বলতে শুরু করলেন, 'ভুলটা আমার হঠাৎই ভাঙ্গল। নাত-জামাইয়ের পাশের কোয়ার্টারে একটি ছেলে পড়াতে আসে তার সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। সে ছেলেটির বই কেনবার নেশা আছে, সে আমাকে একখানা ইংরেজী মাসিক পড়তে দিয়েছিল। তাতেই হঠাৎ খবরটা পড়লুম। হিসেব দিয়েছে কোন্ দেশে শতকরা কত লোক লেখাপড়া জানে, আর সে অনুপাতে কত বই বিক্রী হয়। তাতেই জানলুম, আমেরিকাতেই সব চেয়ে বেশি লোক শিক্ষিত—অথচ সে হিসেবে সব চেয়ে ওদেশেই বই কম বিক্রী হয়। এই তোর টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার মূল্য বাবা। ওতে শুধু মানুষকে পয়সা রোজগার করতেই শেখায়, তার চেয়ে বড় কিছু দেয় না। যে শহরে আমি ছিলুম, সেখানে কারখানার কর্মচারীদের জন্যে কত ব্যবস্থাই না করেছে। ইন্দ্রপুরীর মত শহর, ভাল ভাল কোয়ার্টার,—রাস্তাঘাট, আলো, ইলেকট্রিক্, জলের কল—কিছুর অভাব নেই। ক্লাব, সিনেমা, ইস্কুল—সব আছে। অল্প বয়সে কাজ শিখে ওখানে ঢুকে মোটা মোটা মাইনে পাচ্ছে। না আছে খাওয়া পরার কষ্ট, না আছে বসবাসের কোন অসুবিধে। কিন্তু বাবা—বড় বড় মোটা মাইনের অফিসারদের বাংলো থেকে টাইম টেবল্ আর বুড়ো মা দিদিমা থাকলে একখানা পাঁজি, এ ছাড়া আর একটা বইও বার করতে পারবি না। সরস্বতী একেবারেই বিদায় নিয়েছেন।'

বিমল আজ আর উত্তেজিত হ'ল না। বরং আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'সরস্বতীকে বিদায় দেওয়াই যে একটা শোচনীয় ঘটনা এটাই যদি আমি না মানি? আপনি আমার মূল বক্তব্যটা ভুলে যাচ্ছেন মাস্টার মশাই। লক্ষ্মী থাকাটাই আসল কথা—সরস্বতী না থাকলেও চলবে।'

'কিন্তু এতে ক'রে লক্ষ্মীকেই কি ধরে রাখতে পারবি?...ইংরেজের রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না। কিন্তু সে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য কারা গড়ে তুলেছিল? তারা কেউই টেক্‌নিক্যাল ট্রেনিং-এর ধার ধারত না। সামান্য ইংরেজী, তার সঙ্গে যদি দু'পাতা ল্যাটিন গ্রীক শিখতে পারল ত সে মহা-পণ্ডিত ব'লে গণ্য হ'ত সেকালে। তোদের এখনকার মত চৌকস টেকনিক্যাল ট্রেনিং ছিল তাদের কল্পনারও বাইরে। কিন্তু সেইসব মূর্খের দল যা করে রেখে গিয়েছিল আজ শিল্পবিজ্ঞানে পারদর্শী ইংরেজ সব বিলিয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে বসল। বলতে পারিস বিমল—আমেরিকানেরা

পৃথিবীর মধ্যে কোথায় কি সুবিধে করতে পেরেছে? পৃথিবীর উপকার করে বেড়াচ্ছে আর সর্বত্রই মার খাচ্ছে! সব জায়গাতেই সে উপহাসাস্পদ। বোকা জমিদারদের ছেলের মতই তার অবস্থা।...যখন এত কল-কারখানার ছড়াছড়ি ছিল না, তখন ইউরোপীয়ান পণ্ডিতরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীকে যতটা সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন—ততটা এখন কেউ পারছেন কি? শুধু মারণাস্ত্রই তৈরী হচ্ছে রং-বেরংএর!'

'না তা ঠিক নয় মাষ্টার মশাই। পৃথিবী আজ এত এগিয়ে গেছে যে সাধারণ চলাটা আপনার হয়ত চোখে পড়ছে না—ছুটে চলা ছাড়া কোনটাকেই চলা বলে মনে হচ্ছে না আপনার।'

'তা হয়ত হবে। কিন্তু বাবা আমাদের দেশের কথা আমি ভাল ক'রেই ভেবে দেখেছি। ইংরেজের লিবারেল এডুকেশন না পেলে আমাদের খুবই ক্ষতি হ'ত। বাংলা দেশের দিকে তাকিয়ে ত্যাখ—ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে বাঙ্গালী কি ছিল? ভাঁড়ুদত্ত আর মুরারি শীল—এই হ'ল আগেকার সাধারণ বাঙ্গালীর নমুনা। আর একটু এগুলে রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, বড় জোর নন্দকুমার। নবদ্বীপের দু' একজন পণ্ডিত আর মহাপ্রভুকে বাদ দিলে সোজা এগিয়ে আসতে হবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। রামমোহন বিদ্যাসাগর ভূদেব মাইকেল রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ যার কথাই বল না কেন, ইংরেজের লিবারেল এডুকেশন ছাড়া কেউই বিকশিত হ'তে পারতেন কি?'

বিমল প্রশ্ন করল, 'কিন্তু রামকৃষ্ণ?'

'বীজ ভাল ক্ষেত্রে না পড়লে ত ফসল ভাল হয় না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সপ্তদশ শতকে জন্মালে কেউ তাঁকে চিনত না। নতুন আলো আর হাওয়ার মধ্যে এসে পড়েছিলেন বলেই বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। দেশের নব-জাগরণের শুভলগ্নটিতে তিনি জন্মাতে পেরেছিলেন, এটা আমাদের কাছেও সৌভাগ্য বৈকি! আর বিবেকানন্দ। ইংরেজের শিক্ষা ছাড়া বিবেকানন্দ তৈরী হ'ত বলে আমি মনে করি না। এঁদের কথা বাদ দে, তোদের রাজনীতিক নেতারাও সুরেন বাঁড়ুয্যে, সি আর দাশ—সবই ঐ যুগের মানুষ, ঐ ক্ষেতের ফসল। সে যুগের বৈশিষ্ট্য শেষ হয়ে গেল বোধ হয় নেতাজীতে। আমাদের বাল্যকালে—

তার অনেক পরেও—সুভাষবাবু যখন ছেলেমানুষ তখনও—কিশোর ছেলের. স্বপ্ন দেখত তারা সন্ন্যাসী হবে, বিবেকানন্দ হবে, দেশের সেবা করবে। আজকের কিশোরেরা স্বপ্ন দেখে তারা বিড়লার মত শিল্পপতি হবে নয়ত ফিল্মের অভিনেতা হবে। ঠিক কি না বল—যদিও মাষ্টারী ছেড়েছি, ছেলেদের সংসর্গ ত্যাগ করি নি। পথের ধারে বসে থাকি, সব কথাই কানে যায়।...এ দুটো আদর্শে অনেক তফাৎ। এখনই ত সরকারী অফিসের কথা বলছিলি, দেখতেও ত পাচ্ছি নেতাদের কত শুভ সংকল্প নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শিব গড়তে বানরে পরিণত হচ্ছে শুধু উপযুক্ত কর্মীর অভাবে। যত দিন যাবে এ অভাব বাড়বে বাবা। সেবা কথাটাই উঠে যাচ্ছে দেশ থেকে—এটা যে কত বড় ক্ষতি, একদিন তোরা বুঝবি।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বিমল বললে, 'আপনি কি তাহ'লে বলতে চান—আমরা পিছু হটব?'

'পিছু হটবার কথা বলব কেন বাবা। এগোর—তবে ভুল পথে নয়—এইটেই আমি বলতে চাই। শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত—এগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু খাওয়া-পরা-থাকার সাধনাটাই যে মানুষের বড় সাধনা এইটে আমি কিছুতে মানতে রাজি নই। আর ওগুলোকে যদি বাদ দিতে না চাই, তাহলে সাধারণ শিক্ষাকে বাদ দিতে পারব না। সংস্কৃত পড়ে চাকরী পাবো না হয়ত, তবু ওটা দরকার, যেহেতু কালিদাসকেও আমাদের দরকার। ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়ে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে পৌঁছব, বিশ্বের কাব্য-দর্শন ইতিহাসে প্রবেশ করব বলেই তাদের গ্রামারও মুখস্থ করব!'

'খাওয়া-পরাটার প্রশ্নটাও বড় প্রশ্ন মাষ্টার মশাই! দেহটাও উপেক্ষণীয় নয়।'

'তা জানি বাবা কিন্তু খাওয়া-পরাটা নিয়ে আমাদের কতটা মাথা ঘামানো উচিত সেটা কোন দিন ভেবে দেখেছিস? ওর কোন সীমা রেখা নেই। সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি—টানলে ক্রমাগতই বেড়ে যাবে। একশবছর আগেকার মজুররা এখনকার ঐ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনকেই সাক্ষাৎ স্বর্গ বলে মনে করত। এত সুবিধার কথা স্বপ্নে দেখবারও উপায় ছিল না তাদের। আজকের কেরাণীদের অর্ধেক সুবিধা পেলে তখনকার কেরাণীরা সুখে অজ্ঞান হয়ে যেত। কিন্তু আজই কি তাদের তৃপ্তি আছে? নাৎজামাইয়ের ওখানে শুনে এলাম ধর্মঘট আসন্ন। আজও

পৃথিবীতে এমন দেশ আছে—স্বাধীন দেশ—যেখানে মজুরদেব হাসিমুখে দৈনিক এগারো ঘণ্টা খাটতে হয়। প্রতিবাদ করার উপায় নেই। আমাদেব দেশের লোক আট ঘণ্টা খেটেই বুকেব বক্ত দিচ্ছে মনে কবে। তাবা খাটবাব সময়টা আবও কমাতে চায়। আমাব তাবাপদ পণ্ডিত মশাইযের কুড়িগুণ মাইনে পান যে সব শিক্ষকবা, তাদেব অসন্তোষ তাবাপদ বাবুব চেয়ে ঢেব বেশি! আমি এঁদেব দোষ দিচ্ছি না, বিদ্রূপ ত কবছিই না। শুধু বলছি যে প্রযোজনবোধটাকেও ইচ্ছা করলে সংহত ও সীমাবদ্ধ কবা যায়। তাহ'লে এই যে-জীবনেব দিকে আমবা ছুটে চলেছি, সে জীবনটাকে আব এত একান্ত আবশ্যক বা মূল্যবান বলে মনে হবে না।'

'আজ সারা পৃথিবীই যে এই দিকে ছুটে চলেছে মাষ্টার মশাই। তাবা কি সকলেই নির্বোধ?'

'গান্ধীজিই কি খুব নির্বোধ ছিলেন? তোবাই ত তাঁকে জাতিব জনক বলিস, তাঁব দৌলতেই তোবা স্বাধীনতা পেলি বলে বেড়াস! অতবড় দু'দে সাম্রাজ্য-বাদীদের সঙ্গে লড়াই ক'বে যে জিতল সে কি তাদেব চেনে নি?...এই সভ্যতাব আসল চেহাবাটা ঠিকই তাঁব চোখে পড়েছিল। সেই জন্মে তোবা যাকে বলিস ইন্‌ডাস্ট্রিযালিজেশন্—তিনি তাব এত বিবোধী ছিলেন। আমাদেব গ্রামেব জীবনকে ধ্বংস কবে এ এমন এক নাগবিক জীবন এনে দিচ্ছে যা আমাদেব পক্ষে আদৌ শ্রেয় না। আমি এই ক'দিনে কথাটা খুব ভেবে দেখেছি বাবা বিমল, এই কলকাবখানা পৃথিবীব এমন কোন উপকাব কবে নি—কিন্তু অপকাব কবেছে ঢেব। মালেব প্রোডাকশন যেমন বেড়েছে, অমনি দবকাব হয়েছে তাব জন্য বিস্তৃত বাজাব। সেই জন্মেই প্রয়োজন হযেছে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য অধিকাব কবা। ইংবেজ আব ফবাসী, আগে ভাগে অর্ধেক দুনিয়াটা দখল কবে নিযেছিল বলেই জার্মানী আর জাপানেব এত বাগ ওদেব ওপব। ইংবেজবা খোলা প্রতিযোগিতায কোন দিন পেবে ওঠে নি এদেব সঙ্গে—নিজেদেব রাজত্বে জোব ক'বে দাবিয়ে বেখেছিল শুধু। ইম্পিরিয়াল প্রেফাবেন্স অনেকেবই চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল।...এই এত বড় দুটো বিশ্বযুদ্ধেব মূলেও কি ঐ বিদ্বেষ ছিল না?...প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হু-হু ক'রে কাজ বাড়াতে হয়েছিল। তার পর আমেরিকার কারখানায় যখন কাজ কমে

এল—অমনি পড়ে গেল হাহাকার, কত লোক আত্মহত্যা করল না খেতে পেয়ে, তার সীমাসংখ্যা নেই। তোরা তখন ছোট ছিলি তোরা জানিস না, আমরা খবরের কাগজে পড়েছি। সেইজন্য এবারের লড়াইয়ের পর সহজে হাত গুটোতে পারছে না—নানা উপায়ে লড়াইয়ের গরম বাতাস জীইয়ে রাখছে। এই যে সোভিয়েট রাশিয়া, সর্বপ্রকার কারখানা বাড়িয়ে যাচ্ছে—শুধু মাল, শুধু মাল,—লোকগুলোকে খাটিয়ে পিষে তাদেরও যন্ত্রে পরিণত করেছে—একদিন যখন তার নিজের অভাব মিটবে, তখন এই রাক্ষুসে কলকারখানাগুলো নিয়ে কী করবে বল্ ত? এত মাল বেচবে কোথায়? লোকগুলোকে কী কাজ দেবে?…তখনই তার দরকার হবে বাইরের বাজার, সাম্রাজ্য। এখনই ত ছোটখাটো সাম্রাজ্য সে গড়ে নিয়েছে, মালও বিক্রীর চেষ্টা চলছে। এখন আছে খুব ছোট স্কেলে, তখন সেইটেই বেড়ে যাবে। আমাদের ভারতেরও এই হাল হবে একদিন। কোন দিন না কোন দিন নিজেদের দরকারকে ছাড়িয়ে যাবে মালের প্রোডাকশন! তখন? ·না বাবা বিমল, ইন্ডাস্ট্রির অগ্রগতি, বৃহৎ শিল্পপ্রচেষ্টা—অর্থাৎ এক কথায় বড় বড় কল-কারখানা স্থাপন—এটাই যে সমস্ত সমস্যার একমাত্র সমাধান তা আমি মানতে রাজী নই।'

পূর্ণবাবু কতকটা শারীরিক ক্লান্তিতেই, বোধ করি দম নেবার জন্য এইবার থামলেন একটু। পশ্চিম আকাশে অনেকক্ষণ ধরেই মেঘ জমছে, তাই হঠাৎ যেন চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে—ঘড়ির হিসেবে একটু বেশি তাড়াতাড়িই। এখন মুখ তুলে সেদিকে চেয়ে বিমল ব্যস্ত হয়ে উঠল, বললে, 'এখান থেকে উঠতে হবে মাষ্টার মশাই—ঝড় উঠবে বোধ হয়।

কথাটা পূর্ণবাবুর কানে পৌঁছল না। প্রবল উত্তেজনায় অনেকক্ষণ বকে গেছেন, তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। সমস্ত দেহ থর থর করে কাঁপছে। তবু কিন্তু তিনি তখনও তাঁর নিজের বক্তব্যেই ডুবে আছেন।

একটু পরে বেশ একটু ক্লান্তস্বরেই বললেন, 'যারা একদা লিবারেল এডুকেশন পেয়েছিল তারাই আজও ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি ক'রে চেঁচাচ্ছে। নেহেরু গান্ধীজি—এঁরা ইংরাজের খাস্ প্রডাক্ট। যে শিক্ষা এঁরা পেয়েছেন সে শিক্ষাকে বিদায় দিচ্ছি আমরা—কোন কোন দেশ আগেই দিয়েছে।

ফলে নতুন ধরণের অধীনতা, নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদকেই কি ডেকে আনছি না? আজ কেউ কারুর কথা শুনতে প্রস্তুত নয়, সবাই চায় জোর করে অপরকে নিজের মতে আনতে। যে আমার দিকে নয়—সে আমার শত্রু। এ মনোভাব ভাল নয় বাবা, মোটে ভাল নয়। মানবজাতির কোন কল্যাণ এর মধ্যে নেই। তুই কি বলতে চাস চল্লিশবছর পরেও আজ সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণ জারের আমলের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করছে?...যন্ত্র-সর্বস্ব নাগরিক সভ্যতার মধ্যে মানুষের কল্যাণ নেই, এটা সেই সত্য-দ্রষ্টা ঋষি, গান্ধীজি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই তিনি চরখা, খদ্দর, কুটির-শিল্পের ওপর অত জোর দিয়েছিলেন, সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ স্বাস্থ্যকর গ্রাম্য জীবন কল্পনা করেছিলেন—যেখানে রোগ থাকবে না, অভাব থাকবে না, অথচ কর্মহীন জীবনে বসে বসে শুধু পরের অনিষ্ট-চিন্তা এবং পরচর্চা করবে না লোকে—সবাই খেটে খাবে। অভাব যেমন থাকবে না, তেমনি সহস্রবিধ বিলাসের সরঞ্জামও থাকবে না। পরস্পরের পরিশ্রমের ফল নিজেরা ভাগ ক'রে নিয়ে সুখে থাকবে। ঐ কুটির থেকেই আবার সাহিত্য শিল্প দর্শন আসতে পারে—যা মানুষকে এতকাল ধরে অপর জন্তুর থেকে স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দলিল জুগিয়েছে। এই সব আধুনিক ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল টাউনের ধারে কাছেও তার অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। ওখানে বড় জোর সরকার বা রাজনৈতিক দলের উৎসাহ দেওয়া ফরমাসী সাহিত্য শিল্প তৈরী হ'তে পারে, কারখানার ছাঁচে ঢালা অপর কোন মালের মতই।'

ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। মেঘ ডেকেছে ইতিমধ্যে। আকাশে আসন্ন দুর্যোগের সূচনা। বিমল একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কিন্তু আর নয়, উঠুন মাষ্টার মশাই, জল এল ব'লে।'

সে সযত্নে পূর্ণবাবুর হাত ধরে ওঠাল। হাত ধরেই নিয়ে যেতে হ'ল তাঁকে। এতক্ষণের উত্তেজনা বক্তব্যের সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, অবসাদ এসে চেপে বসেছে, মনে শুধু নয়—দেহেও। পা ভারী হয়ে উঠেছে, কোন মতে টেনে নিয়ে চলতেই পারছেন না তিনি। খানিকটা গিয়েই ভাগ্যে একখানা রিক্সা পাওয়া গেল। রিক্সা করে ধর্মতলার মোড়ে পৌঁছে অতিকষ্টে একখানা বাসে উঠল ওরা। আর এক মিনিটও দেরী করলে অসুবিধার অন্ত থাকত না। কারণ বাস ছাড়ার

সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল ঝড় উঠল—একটু পরে জলও শুরু হয়ে গেল।

বাসে বসবার জায়গা পাওয়া গেল না। বিমল পাশ থেকে ওঁকে জড়িয়ে ধরে রইল। পূর্ণবাবুও তন্দ্রাতুর শিশুর মতই সমস্ত দেহের ভারটা ওর ওপর ছেড়ে দিয়ে ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

খানিকটা যাবার পরই হঠাৎ বোধহয় মনে পড়ে গেল কথাটা।

'তুই এদিকে যাচ্ছিস বাবা—তোর, তোর টিউশনী নেই ?'

'আছে—তবে আজ না গেলেও এমন কোন ক্ষতি হবে না। আপনাকে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আসি।'

পূর্ণবাবু আর কোন প্রতিবাদ করলেন না। বোধকরি করবার উপায়ও ছিল না। পা দু'খানা তখন সত্যিই ভেঙ্গে আসছে তাঁর।

২১

পূর্ণবাবু সেদিন যখন কোনমতে বাড়ীতে পৌছে এক রকম নিঃশব্দেই শয্যা গ্রহণ করলেন—তখন তাঁর এবং বিমলের দুজনেরই মনে হয়েছিল এ ক্লান্তিটা সাময়িক, একটা রাত বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে। বিশেষত অনেকদিন পশ্চিমে থেকে খানিকটা সুস্থ হয়েই এসেছেন, খুব একটা দেরি লাগবে না নিজেকে সামলে নিতে। মানসিক অবসাদেরই দৈহিক প্রতিক্রিয়া বৈ ত নয়, স্নায়ু বিশ্রাম পেলে পেশীও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

কিন্তু পূর্ণবাবু পরের দিনও উঠতে পারলেন না। তার পরের দিনও না। কে যেন তাঁর পা-দুটো থেকে সমস্ত শক্তি হরণ করেছে। শুধু পা দুটোই বা কেন—হাতও নাড়তে ইচ্ছা করে না তাঁর, বিছানায় উঠে বসতেও যেন কষ্ট হয়। এ যে কী একান্ত অবসাদ—তা তিনি বোঝাতে পারেন না স্ত্রীকে। হয়ত নিজেও বুঝতে পারেন না ভাল ক'রে। উৎকণ্ঠিতা প্রিয়ম্বদা বার বার প্রশ্ন করেন, 'কী কষ্ট হচ্ছে বলো না, ব্যথা করছে হাঁটু ? বুকে কোনও কষ্ট আছে ?' কিন্তু

পূর্ণবাবু ভাল রকম উত্তর দিতে পারেন না। কথা কইতেও ক্লান্তি বোধ হয় তাঁর, অপরিসীম ক্লান্তি। শুধু তিনি যেন ডুবে যাচ্ছেন কোন্ এক অতলে। আর এই ডুবে যেতেই যেন ভাল লাগছে। তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত বুদ্ধি, চেতনা—সব কিছুই একটা বিস্মৃতি, একটা পবিপূর্ণ সুপ্তিব মধ্যে ডুবে গেলে যেন তিনি বাঁচেন। আর পারছেন না নিজের সঙ্গে লড়াই কবতে।

কে জানে, হয় ত এই অবসন্নতা তাঁব দেহেব মধ্যে ঘনিয়ে আসছে অনুভব করেই তিনি সেদিন অমন ক'বে ছুটে গিয়েছিলেন বিমলের কাছে, কলকাতাতে পা দিয়েই হয় ত বুঝেছিলেন যে এখনই না গেলে আব তাঁব যাওয়াই হবে না। অথচ যাওয়াটাও যে সেদিন একান্ত দরকাব ছিল। তাঁব আচরণে ভুল হয় নি, তিনি ভুল কবেন নি, এটা প্রমাণ না করা পর্যন্ত যে তাঁব শান্তি নেই। জীবনেব প্রচণ্ডতম ব্যর্থতাকে স্বার্থত্যাগেব তাজমহল দিয়ে ঢেকে বেখেছিলেন এতকাল, সে তাজমহল যদি হাওয়ার প্রাসাদেব মত হাওযাতেই মিলিয়ে যায় ত তিনি বাঁচবেন কি ক'বে? এমন কি মরেও যে শান্তি হবে না তাঁর! এতবড় অনুশোচনার বোঝা নিয়ে পরলোকেব পথেই কি চলতে পাববেন?...

অথচ বিমলেব সঙ্গে সেই সংবর্ধনার দিনটিতে দেখা হওয়াব পব থেকে এই দীর্ঘকাল যে সংশয়েব ভারে নিপীড়িত হচ্ছিলেন দিনরাত—তা থেকে মুক্তি পেয়ে নিতান্ত লঘুচিত্তে নিশ্চিন্ত মনে এবং সুস্থ দেহেই ত তিনি ফিরছিলেন। এ অবসাদ ত তাঁব আসবার কথাও নয়। তবে কি মূলেই কোথাও কোন গোলমাল থেকে গিয়েছিল?

বিমলকে তার ভুল বোঝানোর মধ্যে নিজেব কৃতকর্মেব যে সাফাই নিহিত ছিল সেটার আসল জোরটা কমে এসেছিল ভেতরে ভেতবে?...

কে জানে, পূর্ণবাবু যেন আর গুছিয়ে কিছু ভাবতেও পারেন না।

শুধু কেউ যখন থাকে না, প্রিয়ম্বদাও ম্লানমুখে গৃহকর্মে কোথাও ব্যস্ত থাকেন—তখন নিজের শিথিল চিন্তাশক্তিকে গুছিয়ে নিয়ে সেই দিনকাব ইতিহাসটা ভাবতে চেষ্টা করেন, সব ঘটনাগুলোকে দুর্বল চেতনার মধ্যে আনবার চেষ্টা করেন—

—সেই রুণুদের বাড়ী থেকে আসবার দিনটি।

কী ঝোঁকের মাথায়, কী বিজয়গর্বেই না ছুটে আসছিলেন তিনি! ট্রেনের

কামরাটা খালি পেয়ে যেন বেঁচে গিয়েছিলেন। যে অকাট্য যুক্তিতে বিমলকে তিনি অভিভূত করবেন সেইগুলোই মনে মনে মহড়া দিতে দিতে আসছিলেন। আর কোন কথাই তাঁর মনে ছিল না—এমন কি এরই মধ্যে আসানসোলে কখন ট্রেন এসে থেমেছে, একটি বিধবা মহিলা কতকগুলি ছেলে-মেয়ে নিয়ে উঠেছেন, তা পূর্ণবাবু অত লক্ষ্যও করেন নি!

কিন্তু একসময়ে সচেতন হ'তেই হ'ল!

কেমন করে যেন তিনি অনুভব করলেন যে ভদ্রমহিলা তাঁর দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

নিজের অজ্ঞাতেই বোধকরি একটা অস্বস্তি বোধ করেছিলেন, আর তার কারণটা অনুসন্ধান করতে গিয়ে চোখে পড়েছিল একজোড়া অত্যন্ত শান্ত চোখের দৃষ্টি।

অস্বস্তিটা বেড়েই গিয়েছিল। মনে হয়েছিল এমনি দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর মনে যেন কার একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

তাছাড়াও কেমন যেন খারাপ লেগেছিল ব্যাপারটা—কোন মহিলা তাকিয়ে আছেন—এটা অনুভব করলে পুরুষ সব বয়সেই বুঝি অস্বস্তি বোধ করে।

নিতান্ত সাধারণ চেহারার ভদ্রমহিলা, বয়সও হয়েছে। এমন কি হয় ত আর প্রৌঢ়াও বলা চলে না। অন্তত দু'দিনবাদে চলবে না; বৃদ্ধার পর্যায়েই পড়বেন তখন। তবু—।

মহিলাটিই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন—দু'তিন-বার ওঁর চোখে চোখ পড়তে। লজ্জাই বোধ করেছিলেন একটু—সেটা তাঁর মাথা নিচু করার ভঙ্গীতে বুঝতে অসুবিধা হয়নি পূর্ণবাবুর।

পূর্ণবাবুর অস্বস্তি কিন্তু কমে নি। ঐ দৃষ্টির সঙ্গে কোন্ সুদূর অতীতে কোথায় যেন একটা যোগাযোগ ছিল, সে স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেছে, তবে তাঁর সমস্ত মন বলছিল যে সেটা সামান্য নয়। মনের মধ্যেকার খেইটা ধরতে পারছিলেন না—তবে যোগসূত্রটা সামান্য নয়, এটা অনুভব করতে পারছিলেন।···

আর দুটি সাঁওতাল যাত্রী ছিল গাড়ীতে, তারা পরের স্টেশনেই নেমে গেল। এ ধারের একজোড়া বেঞ্চিতে তিনি একা এবং ওধারের বাকী জোড়ায় সেই

মহিলা এবং তিনটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। বড়টি ছেলে, বাকী দুটি মেয়ে। ছেলেটি বছর-দশেকের হবে।

একটু পরে ছেলেটি পূর্ণবাবুর পাশে এসে বসল।

অলস কৌতূহলে, অথবা অন্যমনস্ক হবার জন্যই তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নাম কি খোকা?'

অপ্রতিভ চোখে তাকিয়ে ছেলেটি উত্তর দিলে, 'পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী!'

'তাই নাকি?' পূর্ণবাবু হেসে বললেন, 'তবে ত তুমি আমার মিতে! আমারও নাম পূর্ণ।'

অন্যমনস্ক হয়েই পূর্ণবাবু মুখটা ফিরিয়েছিলেন ওদিকে। মহিলাটি যেন প্রাণপণে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন, নিচের দিকে—দ্রুত অপস্রিয়মান খোয়া-পাথরগুলোর দিকে।

ছেলেটি উৎসাহিত হয়ে বললে, 'বা রে, বেশ ত মজা। দিদার কে গুরু ছিলেন, তাঁর নামও পূর্ণ। সেই জন্যেই নাকি আমার ঐ নাম রেখেছে।'

'দিদা? মানে তোমার দিদিমা?'

'না ঠাকুমা। এই যে, যিনি সঙ্গে যাচ্ছেন!'

আর প্রশ্ন করেন না পূর্ণবাবু। মহিলাটির ভাব দেখে মনে হয় তিনি যৎ-পরোনাস্তি লজ্জিত হয়ে পড়ছেন।...যেটুকু কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, তাই হয়ত অশোভন হয়ে পড়ছে—

আরও দুটো তিনটে ছোট ছোট স্টেশন পেরিয়ে চলে যায়। ছেলেটিই নানা-বিধ প্রশ্ন করে ওঁকে। ঐ তারের চাকার মত কী একটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ওগুলো কি হয়? এ ইস্টিশানগুলোয় দাঁড়াল না কেন? এ ইস্টিশানের লোক তবে কোন্ গাড়ীতে যাওয়া আসা করে? সবুজ নিশেন দেখায় কেন?

পূর্ণবাবুও ওদের সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। ক্লাস সিক্স্-এ পড়ে ছেলেটি। বোন দুটির একটি ক্লাস ফোর-এ, আর একটি সবে ইন্ফ্যান্টে ঢুকেছে।

কথায় কথায় ছেলেটিই বলে, ইনি ওর বাবার পিসীমা। ওদের আসল ঠাকুমা নেই, মা-ও মারা গেছেন বছর দুই আগে। এই দিদাই ওদের সব। ওরা কলকাতায় থাকে, পড়াশুনোর সুবিধের জন্যে—বাবা বার্ণপুরে চাকরী করেন।

বাবার শরীর খারাপ হয়েছে শুনে দিদা দেখতে এসেছিলেন, ওদের নিয়ে। দশদিন ছিল ওরা। বাবা এখন সেরে গেছেন বেশ, তাই ওরা ফিরে যাচ্ছে। বাবাও আসবেন সামনের মাসে ছুটি নিয়ে।

অনর্গল বকে যায় ছেলেটি। নিজে থেকে কিছু তথ্য দেয়, আবার প্রশ্নও করে নানারকম। কিছু পূর্ণবাবুর কানে যায়, কিছু যায় না। শুধু যেন তিনি বড় বেশী অস্থির হয়ে ওঠেন ভেতরে ভেতরে। কিসের এ অস্থিরতা তাও বুঝতে পারেন না। নাম-না-জানা একটা আবেগ অকারণেই অন্তরে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

পূর্ণর ছোট বোন উমা হঠাৎ বলে ওঠে, 'ক্ষিদে পেয়েছে দিদা।'

মহিলাটি যেন অনিচ্ছাতেই মুখখানা ভেতরে ফেরান। সম্ভবত বাইরের দিকে চেয়ে থাকাতেই, চোখে কয়লা পড়েছিল—দুটি চোখই অসম্ভব লাল, চোখের পাতা দুটোও ভিজে। পূর্ণবাবু তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেন কিন্তু তার ভেতরই এটুকু তাঁর নজরে পড়ে—

ভদ্রমহিলা টিফিন কেরিয়ারে হাত দিতে গিয়েও কী ভেবে থেমে যান। ডাকেন, 'খোকা, এদিকে শুনে যাও।'

পূর্ণ যাবার আগে ফিস্ ফিস্ করে বলে যায়, 'দিদা আমাকে কখনও নাম ধরে ডাকবে না। যার-তার সামনে বলবে খোকা। কী যেন দিদাটা।'

সে ওদিকে যেতে ভদ্রমহিলা পূর্ণবাবুর শ্রুতি-গোচর ভাবেই বললেন, 'খোকা তোমার ঐ দাদুকে বলো, আমি নিজে পরিষ্কার ভাবে খাবার তৈরী ক'রে এনেছি, পথেও কারুর ছোঁওয়া লাগে নি—উনি খাবেন কিছু?'

প্রস্তাবটা এতই অপ্রত্যাশিত যে পূর্ণবাবুর কথাটা বুঝতে বেশ একটু সময় লাগল। তারপর উনি অবশ্য একটা প্রতিবাদ করতে গেলেন কিন্তু খুব গুছিয়ে কিছু বলতে পারলেন না। বললেন, 'আমি ত—মানে এসময় কিছু খাওয়ার অভ্যাস নেই—শরীরও তেমন—'

'খোকা ওঁকে বলো যে যেখান থেকেই আসুন—কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছেন, এতক্ষণে নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে। বাড়ী পৌঁছতে রাতই হবে। পথের খাবারও বোধ হয় উনি খান না।...গাড়ীতে ত ভীড়ও নেই তেমন—

সামান্য কিছু খেতে দোষ কি?'

প্রস্তাবের অভাবনীয়তাতেই বোধ হয়—পূর্ণবাবু যেন কোন কথা কইতে পারলেন না। ছেলেমেয়েগুলোও কেমন একটু অবাক হয়ে গেছে। হয়ত অপরিচিত কোন লোকের সঙ্গে এতটা আত্মীয়তা ওদের দিদার স্বভাব-বিরুদ্ধ। পূর্ণবাবুও রীতিমত বিস্মিত হয়েছেন, তবে ওঁরা দুজনেই বার্ধক্যে পৌঁচেছেন—নইলে অশোভনই মনে হ'ত ওঁর আচরণ।

পূর্ণবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও চেয়ে রইলেন ঐ দিকে। টিফিন ক্যারিয়ারের সঙ্গে কয়েকটি পাতাও এনেছেন গুছিয়ে; পাতাগুলি একটি ফরসা কাপড়ে মুছে নাতি-নাতনীদের আগে খেতে দিলেন। তারপর পূর্ণবাবুর খাবার সাজালেন তিনি ক্যারিয়ারেরই একটা বাটীতে। সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের বড় জায়গাতে জল ছিল, একটা গ্লাসে তাই থেকে খানিকটা জল গড়িয়ে এনে ওঁর সামনে বেঞ্চিরই একটা খালি জায়গাতে জল ছিটিয়ে ঠাঁই ক'রে দিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, 'হাতটা ধুয়ে নিন একটু।' তারপর ওদিক থেকে খাবারের বাটিটা এনে বসিয়ে দিয়ে ফিরে গিয়ে নিজের জায়গাতে বসলেন আগের মতই স্থির ভাবে। কেবল এদিকে আসবার সময় মাথার কাপড়টা অনেকখানি মুখের ওপর টেনে দিয়েছিলেন বলে—এবার আর ওঁর চোখ দুটো দেখা গেল না।

সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মহিলার এই অকারণ আত্মীয়তায় বিরক্ত হবারই কথা—কিন্তু পূর্ণবাবু ঠিক ততটা বিরক্ত হ'তে পারলেন না। শুধু অপরিসীম বিস্ময় বোধ করতে লাগলেন। আর মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন কোথায় যেন এই ধরণের কাজকর্ম, এই ধরণের সেবা দেখেছিলেন এর আগে। যেন সবটাই একেবারে অপরিচিত নয়।

পূর্ণবাবুর ব্যাবহারিক জ্ঞান খুবই কম। এক হাতে গ্লাসটা ধরে বাইরে হাত বাড়িয়ে হাত ধুতে গিয়ে জলটা উড়ে এসে গায়ে পড়ে অনেকখানি জামাসুদ্ধ ভিজিয়ে দিয়ে গেল। অপ্রতিভ ভাবে এদিকে একবার চেয়েই তিনি তাড়াতাড়ি খাবারের বাটিটা টেনে নিলেন কিন্তু খাওয়ায় সত্যিই তাঁর তখন বিশেষ কোন রুচি ছিল না। এমনিতেই তিনি এ সময়ে কিছু খান না, তার ওপর আজকের এই মনের অস্থিরতায় আরও খেতে পারলেন না। সামান্য কিছু খেয়েই হাত গুটিয়ে

বাঁ-হাতে জলের গ্লাস মুখে তুললেন।

মহিলাটি সম্ভবত ঘোমটার মধ্যে থেকেও লক্ষ্য করছিলেন ওঁর খাওয়া। তিনি হয়ত আরও খাওয়ার জন্য অনুরোধ উপরোধ ক'রে বিরক্ত ও বিব্রত ক'রে তুলবেন —পূর্ণবাবুর ওই রকম একটা আশঙ্কা ছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলা সেদিক দিয়েই গেলেন না। জলের পাত্রটা নিয়ে এগিয়ে এসে তেমন অনুচ্চকণ্ঠেই বললেন, 'আপনি হাতটা ঐ বাটিতেই ধুয়ে নিন, আমি ফেলে দেব।'

পূর্ণবাবু এই বয়সেও লাল হয়ে উঠলেন নিজের অকর্মণ্যতার লজ্জায়। তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, না, আমি কলঘরে গিয়ে ধুয়ে আসছি। এটাও—'

এবার কণ্ঠে বেশ একটু জোর দিয়েই তিনি বললেন, 'না না। আপনি ঐতেই জল ফেলুন, তাতে কিছু দোষ হবে না।'

বিহ্বল, হতচকিত পূর্ণবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। হাত ধোওয়া শেষ হ'লে দেখা গেল মহিলাটি তার পরের পর্বটার জন্যও প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। আঁচলের মধ্য থেকে একটি পাট-করা ফর্সা গামছা বার ক'রে সন্তর্পণে ওঁর পাশে বেঞ্চির ওপরই আলগোছা রেখে দিলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে যেন এক ঝলক দমকা হাওয়ায় পূর্ণবাবুর স্মৃতির বদ্ধকপাটটা —যার কঠিন দেহলিতে এতক্ষণ বৃথাই মাথা খুঁড়ে মরছিলেন উনি—অকস্মাৎ উন্মুক্ত হয়ে গেল। যেমন মেঘঘন-রজনীতে চার পাশের অন্ধকারকে জমাট একাকার বস্তু বলে মনে হয়—অথচ বিদ্যুৎস্ফুরণ হওয়া মাত্র বহুদূর অবধি সমস্ত পরিচিত বস্তু তার বিভিন্ন চেহারা নিয়ে জেগে ওঠে—তেমনিই পূর্ণবাবুর সমস্ত মন একটা বিদ্যুৎ-চমকে জেগে উঠল। সমস্ত বিস্মৃতির অন্ধকার ডিঙ্গিয়ে বহুদিনের বহু পরিচয় একসঙ্গে মানস-চক্ষুতে উদভাসিত হয়ে—তিনি নিজেও যেন চম্‌কে কেঁপে উঠলেন—

'তরুবালা।'

বিধবা মহিলাটির মুখখানা সেই কুঞ্চিত লোল চর্মের মধ্যেও লজ্জায় আর অভূতপূর্ব এক আনন্দ-আবেগে ঝলমল করে উঠল এবং এক বিচিত্র কারণে একই সঙ্গে তার দুই চোখের কূল ছাপিয়ে নামল জল। সেই লজ্জা এবং অশ্রু ঢাকতেই তিনি গলায় আঁচল দিয়ে পূর্ণবাবুর দুই পায়ে মাথা রেখে গাড়ীর মেঝেতেই ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলেন।

'চিনতে পেরেছেন এতক্ষণে ?...আমি কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছি !'

অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে চুপি চুপি বললেন তরুবালা। তারপর তাড়াতাড়ি গামছাটাতে চোখের জল মুছে নিয়ে ছেলেমেয়েদেব বললেন, 'তোমবা কলঘব থেকে হাত ধুয়ে এসে ওঁকে প্রণাম কবো, ইনিও তোমাদেব দাদু হন।'

সেই বুঝি প্রথম অনুভব করেছিলেন পূর্ণবাবু তাঁব হাঁটু দুটো অবশ হয়ে আসছে। স্নায়ুগুলোব এমনি দুর্বলতা সেই মুহূর্তেই প্রথম বোধ হয়েছিল। কিছু যেন ধারণা কবতে পাবেন নি—বহুক্ষণ পর্যন্ত।...

তরুবালা ওঁব সামনে বসে নিঃশব্দে বহুক্ষণ ধবে কেঁদেছিলেন সেদিন। নাতিদেব সামনে লজ্জায় পডবাব ভযে প্রথমটায় অল্প কিছুক্ষণ নিজেকে সম্বরণ কবেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সম্ভব হয় নি সামলানো।

তারপব বহুকথাই জেনেছিলেন পূর্ণবাবু। বহু ইতিহাস।

পূর্ণবাবু চলে আসার ছ' মাসেব মধ্যেই বিয়ে হয়েছিল তরুবালাব। কিন্তু বেশীদিন স্বামীব ঘব কবা তাব অদৃষ্টে ঘটে নি। বিয়েব সময়ই নাকি যক্ষ্মাব লক্ষণ দেখা গিয়েছিল পাত্রেব—'পবেব মেয়েব ভাগ্যে হয়ত বাঁচবে' এই বিশ্বাসেই তাডাতাডি ছেলেব বিয়ে দিয়েছিলেন তাব মা। কিন্তু বিবাহেব অষ্টাহ কাটবাব আগেই রক্ত দেখা দিল। তখন ওকে বাপেব বাডী আসতে দিলেন না তাঁবা, তেরোবছরেব মেয়েকে দিয়ে সেই মৃত্যু-পথযাত্রীব সেবা-শুশ্রূষা কবিয়ে নিলেন। সাংঘাতিক বোগে সেবা কববাব লোকেব অভাব হবে বলেই বোধ হয় তাঁবা বিয়ে দিয়েছিলেন—কে জানে! কিন্তু সে যাই হোক—তখন বাপেব বাডী আসতে দেন নি বটে, বিধবা হবাব পব আব কাল বিলম্ব কবেন নি, শ্রাদ্ধ চুকে যাওয়া মাত্র নিজেরা গাডী কবে এনে বাপেব বাডীব সামনে ছেডে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। প্রাণগোপাল বাবুব সঙ্গে দেখাও কবেন নি একবাব। অবশ্য সে নাকি লজ্জায়—তাঁরা আব মুখ দেখাবেন কোন্ মুখে ?

তারপর থেকে এই সুদীর্ঘকাল সেই বাডীতেই কেটেছে—যে বাডীতে পূর্ণবাবু তাঁকে দেখেছিলেন সেই প্রথমদিন। বাবা থাকতে বিশেষ কোন কষ্ট হয় নি কিন্তু ছোট ভাইয়ের সংসারে এক সময় খুবই লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে তাঁকে। অত দুঃখ দিয়েছিলেন ভগবান কিন্তু মৃত্যুটা দেন নি। ছমাস ধরে ঐ সর্বনেশে রোগের

মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও সে রোগের বীজাণু তাঁর প্রাণশক্তিকে জখম করতে পারে নি। তিনি বেঁচেই রইলেন। আত্মহত্যাও করতে পারেন নি—কারণ মা তখনও বেঁচে। বৌয়ের হাতে পড়লে মা বোধ হয় খেতেই পেতেন না। আর কোথাও যেতেও পারেন নি—ঐ একই কারণে। তারপরও নড়তে পারেন নি, কারণ মা আর ভাজ প্রায় একই সঙ্গে মারা গেলেন। ভাইপো তখন বালক মাত্র। নবগোপাল আর বিয়ে করে নি, বোধ হয় দিদির মুখ চেয়েই, কিংবা ছেলের কথা ভেবে—কে জানে! সেই ভাইপোর বিয়ে দিলেন—সে বৌও বাঁচল না। এই তিনটি ছেলেমেয়ের ভারও আবার তাঁর ওপর এসে পড়ল। হতভাগী একে একে সকলকে খাচ্ছেন—কেবল নিজে আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে ঠিক বসে আছেন—মৃত্যু নেই শুধু তাঁরই।…

এই দীর্ঘ দুর্ভাগ্যের ইতিহাসের মধ্যে আরও একটি ছোট্ট কথা বলেছিলেন তরুবালা। নানা কথার ফাঁকে একসময় বলে ফেলেছিলেন—কিন্তু পূর্ণবাবুর কানে তা এড়ায় নি। বরং সেই কথাটিই সহস্র হাহাকারের মত মর্মমূলে গিয়ে বেজেছিল।

তরুবালা বলেছিলেন, 'আশা কাকে বলে তা জানি না, ভগবানের কাছে কিছু চাওয়াও ছেড়ে দিয়েছি আজকাল, জানি আমার কোন ভিক্ষে তাঁর কানে পৌঁছয় না। এদানিন্তে শুধু দিনরাত ইষ্টকে এইটুকুই জানিয়েছি—মরবার আগে যেন আপনার সঙ্গে একবার দেখা হয়। জানিয়েছি কিন্তু আশা করি নি যে সত্যিই দেখা পাবো। কী ভাগ্যি ভগবান এই শেষ প্রার্থনাটা শুনেছেন! আর আমার কোন আর্জি নেই তাঁর কাছে। যেদিন তাঁর সময় হবে—টেনে নেবেন। একদিন ত নিতেই হবে। যত দুর্ভাগাই হোক, দুঃখ দেবার জন্যও চিরকাল কাউকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পারেন না—এইটুকুই যা নিশ্চিন্তি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন কথাগুলো শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে।

দেবতারও ঈপ্সিত ধন তরুবালা।

তাঁকে পেলে পূর্ণবাবুর জীবন ধন্য, সার্থক হয়ে যেত। সেদিন প্রাণগোপাল বাবুর কথা শুনে অফিসে ঢুকলে আজ এই দারিদ্র্য, এই অশান্তিও বহন করতে হ'ত না। তবে কি বিমলের কথাই—

নতুন গড়ে ওঠা বিশ্বাসের ভিত আবার নতুন ক'রে আলগা হয়ে যায় দেখে

পূর্ণবাবু জোর ক'রে সে প্রসঙ্গ মন থেকে দূর করেছিলেন। কতকটা সেই জন্যেই, এ বিশ্বাসের প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়বার আগেই ছুটে ছিলেন বিমলের অফিসে—।

বিমল খবর পায় নি অনেকদিন পর্যন্ত। সেদিনেব পব সে যেতেও পাবে নি কয়েকদিন। প্রধান কারণ সময়াভাব। তাছাড়া সেদিন পূর্ণবাবুব ক্লান্তি নিতান্তই সাময়িক বলে বোধ হয়েছিল। দীর্ঘকাল স্বাস্থ্যকর স্থানে থেকে সেরে এসেছেন, কাজেই বড রকম কোন ভাঙ্গনের কথা কল্পনাও কবা যায় নি তাঁব সম্বন্ধে।

সুতবাং প্রিয়ম্বদাব চিঠিখানা পড়ে সে বেশ একটু অবাক হযে গেল। প্রথমটা বুঝতেই পাবে নি কাব চিঠি। একে অনভ্যস্ত হাত, তায় বয়সে ও উদ্বেগে হাত কেঁপে কেঁপে গেছে—সে লেখা পডাও দুঃসাধ্য।

প্রিয়ম্বদা লিখেছেন—

কল্যাণীয়বরেষু, বাবা বিমল, আশা কবি ভগবানের কৃপায় তোমাদেব সব কুশল। বোধ হইতেছে আমাব সর্বনাশেব আব বড বেশী বিলম্ব নাই। একেবাবে আচ্ছন্ন অবস্থা, তাহাব ভিতব শুধু দুইটি নামই মাঝে মাঝে কবেন—বিমল আব তরুবালা। তরুবালা কে তাহা জানি না। ইহাব আগেও একবাব ভাবী অসুখেব সময় বিকাবের ঘোবে ঐ নামটি করিতেন। কিন্তু পবে জিজ্ঞাসা কবিয়া কোন উত্তব পাই নাই। যাহা হউক অতিকষ্টে তোমাব ঠিকানা সংগ্রহ কবিয়া এই চিঠি দিলাম। উনিই তিন চাব দিন চেষ্টা কবিয়া এই ঠিকানা দিয়াছেন—হযত ভুল হইতে পাবে। যাহা হউক যদি চিঠি পাও এবং উঁহাকে শেষ দেখা দেখিবার ইচ্ছা থাকে ত পত্রপাঠ আসিও। আশীর্বাদ লইও।

ইতি—হতভাগিনী প্রিয়ম্বদা

ঠিকানায় অবশ্য খানিকটা ভুলই ছিল। নিতান্ত অদৃষ্টক্রমেই চিঠিটা এসেছে। কিন্তু প্রিয়ম্বদা কে? কাব কথা লিখেছেন ইনি?

অনেকক্ষণ ভাববার পর অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা—ছেলেবেলাতেই কে যেন ঠাট্টা করেছিল, 'পূর্ণমাষ্টার মশাইয়ের বোয়ের নাম জানিস? প্রিয়ম্বদা। অনসূয়া প্রিয়ম্বদা। হি, হি। সত্যি সত্যি কেউ ঐ নাম রাখে?'

প্রিয়ম্বদা তাহলে কি পূর্ণমাষ্টার মশাইয়ের কথাই লিখেছেন ?

সর্বনাশ, এরই মধ্যে কী এমন অবস্থা হ'ল ? এই ত পনেরো-কুড়ি দিন আগেই—

অফিসারকে বলে তখনই বেরিয়ে পড়েছিল বিমল। কিন্তু তখনও তার বিশ্বাস হচ্ছিল না !

অবশ্য পূর্ণবাবুকে দেখবা'র পর আর কোন সংশয় রইল না। এই পনেরো কুড়ি দিনেই যেন পাত হয়ে গিয়েছেন, বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে রয়েছেন। বুকটার কাছে একটু জায়গা নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ওঠা নামা করছে মাত্র। তা নইলে কোথাও কোন জীবনের লক্ষণ নেই। এমন কি বিমলকে দেখে প্রিয়ম্বদা প্রায় হাহাকার করেই কেঁদে উঠলেন, সে শব্দও তাঁর কানে গেল বলে মনে হ'ল না।

'এমন কী ক'রে হ'ল ? কেন হ'ল ? কী এমন অসুখ করল ওঁর ? আমাকে খবর দেন নি কেন ?' ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করতে থাকে বিমল।

'কী ক'রে হ'ল বাবা তা কি আমিই জানি ! সেদিন সেই যে তুমি শুইয়ে দিয়ে গেলে—সেই ত শেষ। আর ত ওঠেন নি। অথচ এমনি কোন রোগও নেই। ভাগ্যে ডাক্তার এনেছিল—তিনি বলে গেলেন অস্বাভাবিক ক্লান্তি, স্নায়ু সব অবশ হয়ে এসেছে নাকি। অথচ কেন যে এমন হ'ল তাও ত জানি না। বেশ সুস্থ হয়েই ফিরলেন রুণুর ওখান থেকে, দেখে আমার আনন্দ হ'ল। হতভাগী আমার চোখ-লেগেই বোধ হয় এমন হ'ল। কী কষ্ট হচ্ছে তাও যদি বলতে পারতেন। কথাই ত কইছেন না, ওদিকে তবু যা হয় একটু ছিল, এই কদিন ত আর কিছুই খাওয়ানো যাচ্ছে না। একটু গ্লুকোজের জল আর লেবুর রস—তাও জোর করে খাওয়াতে গেলে অনেক সময় গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, গিল্‌তে পারছেন না।'

'আচ্ছা উনি যেখানে গিয়েছিলেন, সেখানে কোন শক্-টক্—কি আর কোন কারণ··?'

'সেখানে কী হবে বাবা। উনি ত খুবই আনন্দে ছিলেন। নিজে এসেও সে কথা বলেছেন। রুণু ত খবর পেয়ে ছুটে এসেছে, দিনরাত কান্নাকাটি করছে। কিন্তু সেখানে কি হবে ?'

বিমল বিছানারই এক প্রান্তে বসে পড়ে আস্তে আস্তে ওঁর পায়ে হাত রাখল।

'ডাকো না বাবা—ডাকো। এ ঘুম নয়। অমনিই দিনরাত, আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন।' বলতে বলতে নিজেই ডাকলেন প্রিয়ম্বদা, 'ওগো শুনছ, তোমার বিমল এসেছে যে! একবারটি চোখ চেয়ে ছাখো—'

অনেকক্ষণ ধরে ডাকবার পর পূর্ণবাবু চোখ চাইলেন। নিষ্প্রভ, শূন্য দৃষ্টি। পায়ের দিকে চোখ পড়তে বোধ হয় কে বসে রয়েছে এটা অনুভব ক'রে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মিনিট-দুয়েক পরে বিহ্বল দৃষ্টিতে পরিচয়ের জ্যোতি ফুটে উঠল। একটু প্রসন্নতাও ফুটল মুখে। অতিকষ্টে বললেন, 'কে রে বিমল এলি?'

'হ্যা মাষ্টারমশাই। কিন্তু আপনাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে, আপনি বেশী কথা কইবেন না, আমি বরং যে ডাক্তার দেখছেন তাঁর কাছে একবার যাই!'

'না না।' প্রবল চেষ্টায় যেন ধাক্কা দিয়ে কথাগুলো বেরোয় পূর্ণবাবুর, 'আর সময় নেই। আমার কাছে আয়। খুব কাছে।'

বিমল ওপর দিকে খানিকটা সরে এসে একেবারে মুখের কাছে মাথা নামাল, কিন্তু ততক্ষণে পূর্ণবাবু আবার চোখ বুজেছেন। আবারও সেই একান্ত সুষুপ্তি।

মিনিট দুই এইভাবে কাটবার পর বিমল ভয় পেয়ে গেল। সে হয়ত উঠেই পড়ত, প্রিয়ম্বদা ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন। কারণ পূর্ণবাবুর চোখের পাতা দুটি কাঁপতে শুরু করেছে, চোখ মেলবার পূর্বলক্ষণ।

সত্যিই চোখ খুললেন আবার।

আগের কথাগুলো বলতে গিয়ে বোধ হয় আরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই আগের চেয়ে আরও ক্ষীণ শোনাচ্ছে ওঁর কণ্ঠ। একেবারে মুখের কাছে কান এনে বিমল শুনল—উনি বলছেন, 'বাবা তোকে যা বলেছি, তা বলার কোন অধিকার আমার নেই। আমার সব গুলিয়ে গেছে, কোন্‌টা সত্যি তা আর জোর ক'রে বলতে পারব না। এতদিন পরে, দীর্ঘ জীবনের শেষে পৌঁছে এইটুকুই শিখলুম যে কোন্‌টা কর্তব্য তা মানুষ বোধ হয় কখনও বোঝে না। ভগবান তাকে বুদ্ধির অহঙ্কার দিয়েছেন, বুদ্ধি দেন নি। তাই মনে হয়, হৃদয় যা বলে সেইটে শোনাই ভাল। তাতে ভুল হ'লে ডবল অনুশোচনা থাকে না।'

অনেকক্ষণ ধরে থেমে থেমে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথাগুলো বললেন পূর্ণবাবু। তার পর আবার সুগভীর শ্রান্তিতে চোখ বুজলেন। একেবারেই অবসন্ন হয়ে পড়েছেন।

বিমল তাড়াতাড়ি ওঁর বুকে হাত দিয়ে দেখল। না, এখনও নিঃশ্বাস আছে। বহুক্ষণ সেই ভাবেই কাটল। প্রিয়ম্বদা একটু জল খাওয়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পূর্ণবাবুকে হাঁ করানো গেল না।...

সন্ধ্যার একটু আগে ডাক্তার এলেন। আরও একটু পরে সোমেশ এসে পৌঁছল। কণু, সোমেশ, রুণুর বাবা—বহু লোকই এলেন। কিন্তু কারুর উপস্থিতিই তিনি অনুভব করলেন ব'লে মনে হ'ল না। পাথরের মূর্তির মতই অনড় হয়ে পড়ে রইলেন। এখন যেন বুকটাও তেমন উঠছে নামছে না, গলার কাছটা ধুক্ ধুক্ করছে মাত্র।

ডাক্তার কোন ভরসাই দিয়ে যেতে পারেন নি। কিছু একটা করবার আছে কিনা—বিমলের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'আশ্চর্য রোগী মশাই। আস্তে আস্তে সিঙ্ক্ করছেন।...কোন রোগ নেই, বিশেষ কোন কষ্টও আছে বলে মনে হয় না—আলোর তেল ফুরিয়ে আসছে, এই মাত্র।...কী আর করব। এখন এমন অবস্থা, ইঞ্জেকশনের শকটাও হয়ত সইতে পারবেন না—। খাওয়ার ওষুধ এক, তা যা দিয়েছি তা-ও ত পড়েই আছে, কিছুই ত খাওয়ানো যাচ্ছে না!'

রাত দশটা নাগাদ পূর্ণবাবু আর একবার চোখ খুললেন। বিমল, প্রিয়ম্বদা, কণু, সবাই মাথা নামিয়ে আনলে ওঁর মুখের কাছে—

অনেকক্ষণ পরে বোঝা গেল যে উনি সত্যিই কিছু বলছেন। খুব অস্পষ্ট, জড়ানো জড়ানো অসংলগ্ন কতকগুলো কথা। অন্তত ওরা কেউই বুঝতে পারলে না।

পূর্ণবাবু বলছিলেন, 'নামবার আগে তরুবালা জিজ্ঞাসা করেছিল,—দুই চোখে ওর জল—বলেছিল, ঠিক ক'রে বলে যান, আপনি কি শুধু কর্তব্যের জন্যেই আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন? সত্যিই কি ওটা আপনার তপস্যা? না কি আমাকে পছন্দ হয়নি ব'লে, আমাকে ঘেন্না করতেন ব'লে? সারা জীবন ভেবেও আসল জবাবটা পাই নি।... আমি তাকে উত্তর দিয়েছি বাবা বিমল, উত্তর দিয়েছি। সে বললে এতদিনে আমি শান্তি পেলাম। আর আমার কোন দুঃখ নেই।...

কিন্তু আমি কি ক'রে শান্তি পাবো বাবা? মলে কি মানুষ শান্তি পায়? এ জীবনের স্মৃতি কি পরজন্মে পৌঁছয় না?…'

আরও কী যেন বললেন, কিন্তু সেগুলো আর বোঝা গেল না একটুও। তারপর একটু চুপ ক'রে থেকেই আবার যেন বহু চেষ্টায় চেয়ে দেখলেন। চোখ দুটি একবার যেন বিস্ফারিত হয়ে কাকে খুঁজল।—প্রিয়ম্বদার দিকে চোখ পড়তে যেন প্রাণপণ চেষ্টায় বললেন, 'ক্ষমা, ক্ষমা—'

তারপর আবার স্তব্ধ হয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ।

অনেকক্ষণ পরে বোঝা গেল যে আর কোন দিন, আর কখনই তাঁর সে কণ্ঠে স্বর ফুটবে না। আর কোন দিন চোখ মেলে তিনি তাকাবেন না। ইতিমধ্যে কখন সকলের অজ্ঞাতে একান্ত নিঃশব্দেই তিনি বিদায় নিয়েছেন—তাঁর দীর্ঘদিনের এই বাসাটা থেকে!

২২

পূর্ণবাবুর মৃত্যুতে বিমলের মনের মধ্যে যেন মস্তবড় একটা ওলট-পালট হয়ে গেল। প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে গেল যেন তার ওপর দিয়ে। পূর্ণবাবুকে সে শ্রদ্ধা করত, ভালও বাসত—এটা ঠিক। কিন্তু মধ্যে বহুকাল তাঁর সঙ্গে দেখাশুনো ছিল না; তাছাড়া নিজের জীবনসংগ্রামে বড় বেশী ব্যস্ত ছিল সে—সে সংগ্রামের ধূলি আর ধূমে পূর্ণ মাষ্টারমশাই কোন্ আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই সংবর্ধনা সভার সেই ছ পয়েণ্ট না আট পয়েণ্ট টাইপের তিন লাইন বিজ্ঞাপন চোখে না পড়লে জীবনে কোন দিন এমন ক'রে তাঁকে মনে পড়ত কিনা সন্দেহ। আর হয়ত দেখাও হ'ত না, তাঁর মৃত্যুতে এতখানি শূন্যতা, এতখানি অভাব বোধও হ'ত না। কিন্তু এই গত বছর দুই কাল এমন ভাবেই আবার তিনি মনের এমন একটি ঘনিষ্ঠতম গণ্ডীর ভেতর এসে পড়েছিলেন যে আজ আর কিছুতেই যেন তাঁকে ভোলা—এমন কি একটু আড়ালে সরিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়।

প্রথম দুটো দিন সে অফিসেই যেতে পারে নি। ঘরে ত থাকতে পারেই নি। সকালে গিয়ে একবার ক'রে প্রিয়ম্বদার সংবাদ নিত—বাকী সময়টা একা গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু তৃতীয় দিনে এই নৈষ্কর্ম্য আরও অসহ্য বোধ হওয়াতে সে অফিসেই এসে হাজির হ'ল।

ওকে দেখে পরিচিত সবাই অবাক হয়ে গেলেন। কারণ ঝড়টা শুধু অন্তরকেই বিপর্যস্ত করে যায় নি, দেহেও ছাপ রেখে গেছে। শুক্‌নো মুখ, রুক্ষ শীর্ণ চেহারা এবং চোখের কোলে কালি—সবই একটা বিপর্যয়ের চিহ্ন বহন করছে। প্রথম দিন সে জুতোও পায়ে দেয় নি, খালি পায়েই ঘুরেছিল কিন্তু পরে ব্যাপারটা নিজের কাছেই বড় বেশী নাটকীয় মনে হ'ল। পূর্ণবাবুর সঙ্গে তার যা সম্পর্ক তা বাইরের কোন দেখানো-সম্মানের অপেক্ষা রাখে না। তবু, যথারীতি জুতো-জামা গায়ে থাকা সত্ত্বেও তাকে দেখেই মনে হ'ল যেন সে একটা অশৌচ বহন করছে।

সবাই অবিরাম প্রশ্ন-বাণে তাকে বিব্রত করে তুললেন।

'ব্যাপার কি বিমলবাবু? কেউ মারা গেছেন না কি'? কে মরেছেন—আত্মীয় কেউ?'

'এ কী চেহারা হয়েছে হে বিমল? খবর কি? বাড়ীতে কিছু বিপদ-আপদ?'

'তোমার অসুখ করেছিল না কি বিমল ভাই? ইস্—এ কী অবস্থা করেছ শরীরের?' ইত্যাদি ইত্যাদি—

কতকটা এই ভয়েই দু'দিন অফিসে আসে নি সে। কাউকে কাউকে যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে, কাউকে বা একেবারেই এড়িয়ে কোনমতে নিজের সীটে গিয়ে বসে পড়ল। আরও দিন আষ্টেক পরে আসা হয়ত ওর উচিত ছিল, নিজের মানসিক এবং দৈহিক অবস্থাটা খানিকটা প্রকৃতিস্থ হ'লে। নেহাৎ বাড়ীতে থাকাও অসম্ভব বলেই—। বাবা ত স্পষ্টই বলেন, 'আদিখ্যেতা। কবেকার বুড়ো মাষ্টারের জন্যে এত হা-হুতাশ করবার কী আছে! মা বাপ প্রত্যক্ষ গুরুজন, তাদের ত গ্রাহ্যেই আনেন না বাবু। ইস্কুলের মাষ্টার হ'ল ওঁর বেশী আপন!' মা মুখে কিছু বলেন না বটে তবে তাঁর মনোভাবও অনেকটা এই রকম তা সে জানে। আর সে জন্যে খুব বেশী দোষ দেওয়াও যায় না তাঁদের—

ওর সব চেয়ে ভয় ছিল ওর সিটের সামনের টেবিলেই যে দুজন বসে—রেখা

আর পূর্ণিমা—তাদের আত্মীয়তার আক্রমণকে। কিন্তু দেখা গেল যে অপ্রত্যাশিত ভাবেই সেদিক দিয়ে একটি প্রশ্নও এল না। পূর্ণিমা সে সব কথা উত্থাপনই করল না—বরং যেন নিরবচ্ছিন্নভাবেই ওদের প্রত্যহ দেখা হচ্ছে, এই ভাবে অফিসের প্রসঙ্গই দু' একটি তুলল। বরং আসা-মাত্র বেণ্টাই কী একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, বিমল লক্ষ্য করল, পূর্ণিমা চোখ টিপে নিষেধ করল তাকে।

পূর্ণিমার এই বিবেচনায় বিমল কৃতজ্ঞ বোধ না ক'রে পারল না। মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল সে। বাস্তবিক এতটা সহজবুদ্ধি এবং বিবেচনা পূর্ণিমার কাছ থেকে কখনও আশা করে নি। খুব কাছে যে থাকে তাকেও মানুষ কত পরে চিনতে পারে! হয়ত শেষ অবধি সম্পূর্ণ চেনা হয়ে ওঠে না- কত মহৎ পরিচয় প্রত্যহের মালিন্যে ঢাকা পড়ে থাকে চিরকাল! বিমল যেন নতুন ক'রে এই সত্যটা সম্বন্ধে অবহিত হ'ল।

সেদিন অফিসের কাজ বিশেষ কিছু হবে—এ বিশ্বাসে অফিসে আসে নি সে, কিন্তু পূর্ণিমাই সুকৌশলে তাকে দিয়ে খানিক খানিক কাজ করিয়ে নিলে,—'এইটে যদি আপনি একটু দেখে দ্যান।· এই ফাইলটা তিনদিন ধরে আটকে আছে, আর দেরী করা ঠিক নয়।···আমিই সেরে নিতুম কিন্তু কতকগুলো পয়েন্ট আমি ঠিক ধরতে পাচ্ছি না। আচ্ছা এই চিঠিটার কী জবাব দেব বলুন ত—?'—এই ভাবেই। একটু একটু ক'রে কাজের মধ্যে এসে পড়ে বিমলেরও ভাল লাগল। সে খানিক পরে বেশ সহজভাবেই কাজ-কর্ম করে যেতে লাগল।

ছুটির পর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পূর্ণিমা বললে, 'আমার একদিন খাওয়ানো পাওনা ছিল—মনে আছে আপনার? আজ সেইটে ক্লেম করছি! আজ আপনি আমার অতিথি।'

চা খাওয়া! আজ!

থমকে দাঁড়াল একটু বিমল। আজ এখন কোলাহলের মধ্যে গিয়ে বসে বসে কতকগুলো খাবার গেলবার মত মনের অবস্থা নয়। সে বরং আর একদিন হবে, আজ নয়।

কিন্তু এখন কীই বা করবে সে? বাড়ী ফেরা অসম্ভব। সত্যশরণ বাবুর কাছে আগেই চিঠি লিখে তিনদিনের ছুটি নিয়েছে সে—অবশ্য তৎসত্ত্বেও যাওয়া

যেতে পারত, তবে সেখানেও ত সেই নানা প্রশ্ন, নানা কৈফিয়ৎ। এক সেই একা একা উদ্দেশ্যহীন কর্মহীন ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো। কিন্তু একা থাকতেও আর ইচ্ছা করছে না। বরং পূর্ণিমার সাহচর্য ঢের ভাল। ওর আচরণে একটি সংবেদনশীল অন্তরেরই পরিচয় পাওয়া গেছে আজ, আর যাই হোক তা লোক-দেখানো সহানুভূতির মত পীড়া দেবে না।

সে মন স্থির করেই ফেলে।

'চলুন, কোথায় যাবেন। আমি প্রস্তুত।'

পূর্ণিমা খুশী হয়ে ওঠে। উৎসাহের আধিক্যে রীতিমত তরতরিয়ে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে, পথে নেমেও সে জোরে জোরে হেঁটে এগিয়ে যায়!

কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত পার্কষ্ট্রীটের যে রেস্তোরাঁটিতে এনে হাজির করে, তার ব্যয়বহুলতার খ্যাতি এমন কি বিমলেরও অজানা নয়। সে বিব্রত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, 'কিন্তু এ কোথায় আনলেন মিস রায়, এদের যে বড্ড দাম। এ রীতিমত বড়লোকের জায়গা!'

'কত সাধ্য-সাধনায় আপনাকে অতিথি পেয়েছি, সাধারণ কোন রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে ইচ্ছে করল না। আপনি একবার দয়া ক'রে রাজী হয়েছেন, আবার কবে এ সৌভাগ্য হবে তার ত ঠিক নেই।'

'তাই বলে অকারণ এত খরচা করবেন? আর কোন ভদ্র জায়গা কি খোঁজ করলে মিলত না?...আপনার বাজেটে ত বেশ বড় রকমের ঘাটতি পড়বে। চালাবেন কি ক'রে?'

ওর আপত্তিতে আমল না নিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে পূর্ণিমা বললে, 'নতুন টিউশনী পেয়েছি একটা, ক্লাস সিক্স্‌-এর একটি মেয়ে বাড়ীতে এসে পড়ে যায়। পনেরো টাকা দিয়েছে কালই। সেটা যে টাকার টিউশনী, এখনও বাড়ীতে জানাই নি।...কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে পড়াই—বেগার, তাই সকলে ভেবেছেন। আমি অবশ্য তিল তিল করে এই বিশেষ দিনটির জন্যে কিছু জমিয়ে রেখেছিলাম. টিউশনীর টাকা থেকেও কয়েকটা নিয়েছি—আমার অবস্থা এখন রীতিমত স্বচ্ছল!' বলতে বলতে অকারণেই রাঙা হয়ে উঠল পূর্ণিমার মুখ।

তারপর বললে, 'আর কোথাও নিরিবিলি বসা যায় না। আপনার যা মনের

অবস্থা, আপনার বেশী হট্টগোল ভাল লাগত না।'

তা ঠিক। বিমল আবারও মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করে পূর্ণিমার কাছে। এই প্রথম পূর্ণিমার কথার মধ্যে আভাস পাওয়া গেল যে বিমলের মানসিক অবস্থার খবর সে জানে। ওর মনে যে এত সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধ আছে তা কখনও কল্পনা করে নি সে।

দুজনে একটি কোণে নিরিবিলি বসে।

'কী খাবেন' অনাবশ্যক বোধে এ প্রশ্নও করে না পূর্ণিমা। 'বয়'কে ডেকে দু-একটা সাধারণ খাবারের ফরমাস করে। অর্থাৎ দামী কোন খাবার বললে বিমল প্রতিবাদ করবে—ততটুকুও ব্যস্ত করতে চায় না সে ওকে।

বিমল ক্লান্ত ভাবে তার চেয়ারটায় যেন এলিয়ে পড়েছিল। সেদিকে চেয়ে চকিতের মধ্যে পূর্ণিমার চোখ ছলছলিয়ে এল কিন্তু সে প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু দমন ক'রে বললে, 'আচ্ছা, একটা কথা বলব? অনুরোধের সাহস নেই—কিন্তু বিবেচনা ক'রে দেখবেন?'

'কী বলুন ত?' বিমল অবাক্ হয়ে তাকায়।

'আচ্ছা, নাম ধরে ডাকলেই কি খুব একটা ঘনিষ্ঠতা হয়? মানে অপ্রীতিকর কোন ঘনিষ্ঠতা? ছোট বোনদেরও ত নাম ধরে ডাকে মানুষ।...আপনি ঐ মিস্ রায় বলাটা বন্ধ করবেন? আমার কানে যেন ওটা আঘাত করে। নাম ধরেই না হয় আপনি আজ্ঞে করবেন।'

যেন মরীয়া হয়েই বলে ফেলে সে—চরম সাহসে ভর ক'রে। সঙ্গে সঙ্গেই অপমানের আশঙ্কায় তার কানের ডগা থেকে ঘাড় পর্যন্ত অরুণবর্ণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু আজ আর কোন রূঢ় কথা বিমলের মুখ দিয়ে বেরুল না, বরং একটা ম্লান অথচ সস্নেহ হাসিই দেখা দিল। সে কোমলকণ্ঠে উত্তর দিল, 'কেন, তুমি বলতে দোষ কি?'

'সে সৌভাগ্য আমি কল্পনা করতেও সাহস পাই না যে।' পূর্ণিমার গলাটা কেঁপে যায় অনিচ্ছাতেও।

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। হঠাৎ হয় ত একদিনেই হয়ে উঠবে না। এত-দিনের অভ্যাস বদলাতে সময় লাগবে—'

'দেখুন যেদিনই আরম্ভ করবেন সেদিনই বাধো বাধো ঠেকবে। যা করবার এখনই করে ফেলা ভাল। প্লীজ। প্রসন্ন হয়েছেন ত আর মত ফিরিয়ে নেবেন না!'

কতকটা অনুনয়ের ভঙ্গীতেই হাত দুটো যেন টেবিলের ওপর জড়ো করে পূর্ণিমা। সেই সময় তার মুখের ভাবে যে এক রকমের সশঙ্ক আশা প্রকাশ পায়, সমস্ত দেহের ভঙ্গীতে যে দৈন্য ও অনুনয় ফুটে ওঠে—তা দেখে আবারও আজ বিমলের মনে ক্ষণকালের জন্য মোহের সঞ্চার হয়। সে টেবিলের ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে ওর হাত-দুটোর ওপর সস্নেহে গোটা-দুই চাপড় মেরে বলে, 'হবে বলছি ত। অপ্রয়োজনে শুধু শুধু ডাকি কি করে!'

আনন্দে পূর্ণিমা যেন ঝলমলিয়ে উঠল। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্যই, পরমুহূর্তেই মুখটা ম্লান ক'রে বললে, 'এ সময়ে এসব কথা তোলা হয়ত আমার পক্ষে উচিত হয় নি। মাপ করবেন।'

বিমলের মুখ থেকে সে ম্লান হাসিটুকুও মিলিয়ে গেল। কিন্তু পূর্ণিমার হাতের ওপর থেকে হাত সরাল না, বরং ঈষৎ একটু মুঠি-করার ভঙ্গীতেই ধরে রইল।

পূর্ণিমা একটু পরে আবার আস্তে আস্তে বললে, 'মাষ্টার মশাইকে আপনি বড্ড ভালবাসতেন, না? সাধারণত আজকাল এরকম গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক দেখাই যায় না। আপনার এতখানি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যিনি পেয়েছিলেন তিনি না জানি কী আশ্চর্য মানুষ ছিলেন! ·

এর উত্তরে কথা বলতে গিয়ে বিমল সামলে নিলে নিজেকে। অভ্যস্ত 'আপনি' শব্দই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। সে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সহজ ক'রে নিয়ে বললে, 'কিন্তু মাষ্টার মশাইয়ের মৃত্যুর খবর তুমি শুনলে কী ক'রে?'

একটা অবর্ণনীয় আনন্দে পূর্ণিমার সমস্ত দেহটা শিউরে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এ তার জীবনে অভাবনীয় এক বিজয়গর্ব। কিন্তু সে সহজভাবেই উত্তর দিল, 'আমাদের অফিসের বাদল বলছিল। ও যেন কার কাছ থেকে শুনেছে। আপনি দু'দিন অফিসে না আসাতে আমি—আমরা সকলেই একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলুম। বলাবলি করছি শুনতে পেয়ে বাদল বললে, কে এক ওর ছেলেবেলার মাষ্টার বুঝি মারা গেছে—সেই শোকে ও একেবারে নাকি মুষড়ে পড়েছে।...বাদলের যা অভিজ্ঞতা, নিজের চোখ দিয়েই দুনিয়ার সব কিছু দেখতে অভ্যস্ত ওরা—খবরটা

দিয়ে অনায়াসে বলে বসল, ছোকরার সব তাইতেই যেন বাড়াবাড়ি।'

ইতিমধ্যে 'বয়' চা ও খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। প্লেটে খান-দুই প্যাস্ট্রি তুলে ওর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে পূর্ণিমা আস্তে বললে, 'আপনার বোধ হয় এ ক-দিন খাওয়াও হয় নি।'

'না না খেয়েছি বৈকি। আমাকে ভুল বুঝো না তোমরা। ঠিক সবটাই হয়ত আমার শোক নয়।...একটা ঝড় বয়ে গেছে আমার মনের ওপর দিয়ে ঠিকই—কিন্তু সেটা শুধু এই মৃত্যুই নয়।...এতদিনের অভিজ্ঞতায় যে মতটাকে সত্য বলে ভেবে আঁকড়ে ধরে ছিলুম হঠাৎ একদিন, মাত্র কুড়ি বাইশ দিন আগে মাষ্টার মশাই এসে সব উল্‌টে দিয়ে গেলেন। তিনি সাধারণ মানুষ নন, আমার কাছে নন অন্তত—তিনি দীর্ঘ দিন ধরে ভেবে যা সত্য বলে স্থির করেছেন তাই আমাকে বলেছেন! এ সব ব্যাপারে কিছুই সামান্য ছিল না তাঁর কাছে, তা আমি জানি—। কাজেই তাঁর সেই কথাগুলোই যথেষ্ট বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে আমার মনে। নতুন ক'রে সব কিছুর মূল্য-মান নির্ণয় করা, জীবনের পরিচিত মূল্যবোধের ধারণা পাল্‌টে ফেলা ত সহজ কথা নয়! তার জন্যও প্রস্তুত হচ্ছিলাম—কিন্তু মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে আবার সব উলটে দিয়ে গেলেন মাষ্টার মশাই, আমার ওপরই বিবেচনার ভার দিয়ে গেলেন! এ যে আমার কাছে কতখানি গুরুতর ব্যাপার, তা কেউ বুঝবে না পূর্ণিমা!'

আবারও একটা প্রচণ্ড খুশীর ঢেউ বয়ে গেল পূর্ণিমার ওপর দিয়ে, একটা অসহ পুলকের আঘাতে হৃদয়ের সব ক-টা তন্ত্রী বিন্ বিন্ করে উঠল কিন্তু সে প্রাণ-পণ চেষ্টায় স্থির হয়েই বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, 'আপনি খাবার কিছু মুখে তুলুন, চা একেবারে জুড়িয়ে যাবে নইলে—'

'হ্যা—এই যে!' তাড়াতাড়ি চামচে দিয়ে খানিকটা ওমলেট তুলে মুখে দেয় বিমল। পূর্ণিমাও একটুখানি প্যাস্ট্রি ভেঙ্গে মুখে দিয়ে বললে, 'দেখুন অনেকদিন আমার একটা কথা মনে হয়েছে আপনার সম্বন্ধে—সাহস ক'রে বলতে পারি নি। বলব?'

'বলো না—'কৌতূহলী হয়ে ওঠে বিমল।

'আমার কেমন মনে হয়, চাকরী করাটা আপনার একেবারেই বেমানান।...

আপনার উচিত ছিল মাষ্টারী করতে যাওয়া। আপনার মত চিন্তাশীল এবং সিরিয়াস টাইপের লোক শিক্ষকতা করতে গেলে সত্যি-সত্যিই দেশের ছেলেমেয়ে-গুলো মানুষ হ'ত!'

বিমল যেন অকস্মাৎ ছেলেমানুষের মত হয়ে ওঠে ; সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, 'তুমি সত্যি বলছ! মাষ্টারী করতে গেলে ভাল হ'ত? তাই যাবো?... এখনও ত সময় আছে!'

পূর্ণিমার মুখ নিমেষে ম্লান হয়ে ওঠে, 'ওমা। তাই ব'লে এখন যেন যাবেন না। দোহাই আপনার।'

'কেন?'

'তাহলে আপনার সঙ্গে আর দেখাটুকুও যে হবে না। ঐ অফিসে আমি একা —আপনি নেই, সে আমি ভাবতেও পারি না।'

'ও, এই কথা!' বিমল হেসে ফেলে, 'আমি বলি না জানি কি! তুমিই কি চিরকাল এই অফিসে চাকরী করবে! বিয়ে-থা ক'রে কোথায় চলে যাবে—আমরা আর পাত্তাই পাবো না।'

জোর ক'রে যেন হালকা হয় সে!

কিন্তু পূর্ণিমার মুখখানা যেন নিমেষে বিবর্ণ, রক্তহীন হয়ে যায় কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গেই। সে অন্যমনস্ক ভাবে ওমলেটের ওপর ছুরি চালিয়ে সেটাকে অকারণেই টুক্‌রো টুক্‌রো করে—কোন কথা বলে না।

অত্যন্ত কোন ব্যথার স্থানে ঘা দিয়েছে বুঝতে পেরে বিমল অনুতপ্ত হয়ে ওঠে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সাড়ে-সাতটা নাগাদ পূর্ণিমাকে যখন তার বাড়ীর বাস্-এ তুলে দিল বিমল, তখন কে জানে কেন, নিজেকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ বোধ হ'ল ওর। কিন্তু তবু তখনই বাড়ী ফিরতে ইচ্ছা হ'ল না। সংকীর্ণ দুটি ঘরে অতগুলি প্রাণী। ভাই-বোনেরা আজকাল সকলেই অল্পবিস্তর পড়ায় মন দিলেও—সে যেন

বড় বেশী জনতা, বড় বেশী কোলাহল। তার চেয়ে এমনি উদ্দেশ্যহীন, কর্মহীন ভাবে খানিকটা পথে-পথে ঘুরে বেড়ানো ঢের ভাল!…

সে পায়ে পায়ে দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ তার বাড়ীর উল্‌টো দিকেই এগিয়ে চলল। কিন্তু খানিকটা চলার পরই দেখা হয়ে গেল—প্রায় ধাক্কা লেগে গেল—ওর বন্ধু কুমুদীশের সঙ্গে।

'আরে, এই যে বিমল! ভালই হয়েছে, তোর বরাত ভাল! আয় আমার সঙ্গে—'

সে একরকম ওকে টানতে টানতেই নিয়ে চলল আবাব পার্ক স্ট্রীটেব দিকে।

'আবে থাম্ থাম্—ব্যাপাব কি? চললি কোথায়?' বিস্মিত বিমল প্রশ্ন কববাব চেষ্টা কবে।

'এই যে পার্ক স্ট্রীটেব মোড়ে। একটা ট্যাক্সি নিতে হবে। নইলে সাড়ে আটটার মধ্যে বালিগঞ্জে পৌছনো যাবে না। সেই তে-কোণা পার্কেব কাছে জায়গাটা। একটু আগেই যাওয়া ভাল।'

'তুই যা ভাই। আমাব আজ আব ভাল লাগছে না।'

'আগেই ভাল লাগছে না? কোথায় যাচ্ছি বল্ দিকি?'

'কী জানি, কোন মিটিং হবে আব কি। কিংবা জলসা।'

'না হে বাপু না। তুই বুঝি আজকাল খববেব কাগজও পড়িস না? খাস একজন ইংবেজ কবি ভাবতে এসেছেন সে খববটা বাখো? জলজ্যান্ত, living কবি। ইংবেজীতে কবিতা লিখে যিনি জীবিকা চালান! তাঁকে আমরা কজন মীট্ করব আজ এক জায়গায়। চল্—দেখে আসবি। মন খাবাপ থাকে—মন ভাল হয়ে যাবে, চল্।'

বিমল আর বাধা দিলে না। শিক্ষা ও সাহিত্যেব ব্যাপাবে আজও তাব যথেষ্ট অনুবাগ আছে। মন যদি ভাল হয় ত—ববং এইতেই হবে।

ট্যাক্সিতে উঠে কুমুদীশ ব্যাপাবটা বুঝিয়ে বললে, ভদ্রলোক এসে অবধি সভা-সমিতি যথেষ্ট কবেছেন। এখন তিনি চান এদেশের ক'জন সাহিত্যিককে মীট করতে। সাহিত্য-পবিষদেও গিয়েছিলেন কিন্তু সে ফর্ম্যাল সভা, উনি চান নিভৃত 'ত্যেতাত্যেৎ' গোছের কিছু! সেই জন্যেই বালিগঞ্জে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে

একটু বসবার আয়োজন করা হয়েছে।

'বড় জোর শ'খানেক লোক হবে। আমাদের এক অধ্যাপক বন্ধু উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন, তাই আমি খবব পেয়েছি।'

বিমল একটু সঙ্কোচেব সঙ্গে বললে, 'তা এত প্রাইভেট ব্যাপারে অনিমন্ত্রিত আমাব যাওয়া কি ঠিক হবে ?'

'ওহে সদ্বিবেচক মশাই, নাহ'লে আমি নিয়ে যাবো কেন ? ব্যাপাবটা এত তাড়াতাড়ি ঠিক কবা হযেছে যে সাহিত্যিকদেব বেশীব ভাগকেই কোন খবর দেওযা যায় নি। যাব সঙ্গে যাব অর্থাৎ ইণ্টাবেস্টেড্ কোন লোকেব দেখা হবে, সে ই তাকে ধবে নিয়ে যাবে, এছাড়া ত কোন উপায় নেই! কিছুই যদি লোক না থাকে ত তিনিই বা কি ভাববেন!'

বিমল আব কিছু বললে না।

ক-দিন সে খববেব কাগজ পডে নি সত্যিই। পৃথিবীব কোন খববই সে বাখে না। কেন যে তাব এত দুশ্চিন্তা, মনেব মধ্যে এ অস্থিবতা তাও ত বোঝে না। জগতেব সকলেব ভাব কিছু ভগবান তাব ওপব দিয়ে এখানে পাঠান নি। যে ক-জনেব সম্বন্ধে তাব প্রাথমিক দাযিত্ব—তাদেব ভাবই কি সে সুষ্ঠুভাবে বইতে পাবছে ? মিছিমিছি তাব এত আকুলতা এবং ব্যাকুলতা সত্যিই হাস্যকব।···

বালিগঞ্জে যেখানে কবিব সংবর্ধনাব আযোজন হযেছিল, সেটা নিতান্তই মাঝারী গোছেব বাড়ী। বাড়ীব পেছনে সামান্য একটু 'লন'—যে-কোনদিকে তাকালেই রং-কবা বড বড নর্দমাব নল চোখে পড়ে, কাবণ সব বাড়ীবই পিছন দিক এটা—এমন কি এই বাড়ীবও। হযত ওদেব দেশেও সহবে এমনি ব্যবস্থা ছাড়া উপায় থাকে না—কিন্তু বিমলেব একটু লজ্জাই কবতে লাগল। লনেব মধ্যে শ' দেড়েক ভাঁজ-কবা চেযাব পাতা কিন্তু লোক এসেছে এখনও অবধি জনা-কুড়ি। চায়ের ব্যবস্থাও কবা হযেছে ছোট বকম।

এই কবিব নাম বিমল জানে, ওঁব দু-একটি কবিতা পড়াবও সুযোগ হয়েছে তাব। এমন খুব বড দবেব কবি নন, ওদেশ ব'লেই কবিতা লিখে খেতে পাচ্ছেন, এখানে হ'লে খববের কাগজেব অফিসে চাকবী খুঁজতে হ'ত। ভদ্রলোক আগে

ঘোর কম্যুনিস্ট ছিলেন—এখন নাকি একেবারে উলটো। বর্তমানে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছেন—কী উদ্দেশ্য কে জানে। কিংবা শুধু ভ্রমণই উদ্দেশ্য।

ঠিক সময়েরও দশ মিনিট পরে কবি এলেন। সন্ধ্যায় একটা প্রেস কন্‌ফারেন্স ছিল, সেরে আসতে দেরি হয়ে গেছে। সেজন্য আগেই সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। হাত জোড় করতে শিখেছেন ইতিমধ্যেই, নমস্তে শব্দটাও আয়ত্ত ক'রে নিয়েছেন।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। সৌম্য মুখকান্তি। ভালই লাগল বিমলের। চা-পান শেষ হ'লে তিনি কিছু বলবেন, নিজের কবিতা থেকেও আবৃত্তি করবেন শোনা গেল। বিমল একটু সামনের দিকে এগিয়ে এসে বসল।

এখানকার দু-একটি বাঙ্গালী কবি কবিতা পাঠ করলেন। একজন নিজেরই তর্জমা করা পঙ্গু ইংরেজী অনুবাদও শোনালেন। তারপর কবি স্বয়ং উঠলেন। অনেক কথা বললেন তিনি। কথায় কথায় গান্ধীবাদের প্রসঙ্গ উঠল। তিনি বললেন, 'গান্ধীবাদ সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা ছিল, নিন্দা প্রশংসা দুই-ই। এখানে এসে ওঁর কতকগুলি বই উপহার পেয়ে পড়ে দেখেছি। ওঁর লেখা পড়তে পড়তে আমার আদিম ক্রীশ্চানিটী বা খৃষ্টধর্মের কথা মনে পড়ে যায়। তেমনি সহজ সরল, তেমনি স্বীয় বিশ্বাসে অটল। অনেকে দোষ দেন যে বড় বেশী উনি ঈশ্বর ঈশ্বর করেছেন—কিন্তু তাতে দোষ কি? What's wrong with God? প্রথম যুগে সরল, প্রায়-মূর্খ যে সব বিশ্বাসী খ্রীষ্টানের কথা পড়ি তাঁদের দ্বারা মানুষের বহু উপকার হয়েছে—এখনকার সংশয়বাদী পণ্ডিতরা তার শতাংশও কাজে লাগছেন না মানুষের!'

আরও অনেক কথা বললেন কবি। যা বললেন তার সারাংশ এই: যা কিছু একালের তা যেমন খারাপ হ'তে পারে না, তেমনি তার সবটাই ভাল, তা-ও মনে করার কোন কারণ নেই। আমরা হয়ত একদিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তেমনি আর একদিকে পিছিয়ে পড়ছি। গান্ধীজি যদি ইন্‌ড্রাস্ট্রিয়ালিজেশনকে সমর্থন না ক'রে থাকেন ত বিস্মিত হবার কিছুই নেই। যন্ত্রবিস্তারই মানবসভ্যতার স্বাভাবিক প্রগতি তা কে বললে? বিলাত শেক্‌স্‌পীয়ার, শেলী, কীটস্‌, ওআর্ডসওয়ার্থের দেশ—কিন্তু সেখানে কাব্য আজ মাত্র জনাকতকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

কাব্যের পাঠক নেই। এ হ'ল ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালিজেশনের প্রত্যক্ষ ফল। আমরা হয়ত যন্ত্রশিল্পে এগোচ্ছি—তেমনি কারু-শিল্পে পিছিয়ে যাচ্ছি। কেউ কেউ তাঁকে উপদেশ দেয়, তোমরা 'পিপ্‌ল্‌'-এর জন্য লেখো না কেন ? গণসাহিত্য রচনা করো, পাঠক পাবে। কিন্তু তাঁদের উপদেশমত লিখলে—কবির মতে—একজন পাঠকও পাওয়া যাবে না। যাদের 'পীপ্‌ল্‌' বলা হয়,—তিনি ইংলণ্ডের কথা অন্তত জানেন—তাদের কাছে আজও শেলীর কবিতাই সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু শেলী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পিপ্‌ল্‌-এর একজন ছিলেন না।

আরও অনেক কথাই বললেন তিনি। সব কথা বিমল শোনেও নি ভাল ক'রে। সে ভাবছিল পূর্ণমাষ্টার মশাইয়ের কথা। তিনিও ইনডাস্ট্রিয়ালিজেশন সম্বন্ধে এই আশঙ্কাই প্রকাশ ক'রে গেছেন। গান্ধীবাদ সম্বন্ধেও সেই অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত অর্ধাশনী সামান্য ইস্কুলমাষ্টার যা বলে গেছেন এতবড় পণ্ডিত ইংরেজ কবি—রাজনীতি যার কারুর চেয়েই কম জানা নেই—তাঁর মতের সঙ্গে আশ্চর্য রকম ভাবে মিলে যায় না কি ?

তবে কি সেই বৃদ্ধের কথাই ঠিক।···

'কী ভাবছিস্‌ ? তন্ময় হয়ে ?' কনুয়ের গুঁতো মেরে কুমুদীশ বলে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে, 'লোকটা ধরেছে কিন্তু ঠিক। এদেশেও একদল লোক গণ-সাহিত্য বলে চেঁচায়। তাদের কান ধরে এনে শোনাতে ইচ্ছে করে। এই নিয়ে আমার বন্ধুদের সঙ্গে প্রায়ই তর্ক হয়। আমি ত তা-ই বলি। রামায়ণ মহাভারতের চেয়ে গণসাহিত্য আমাদের দেশে তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। যেমন ওদেশে বাইবেল।··· যে গরীব, যে শ্রমজীবী, যে দারিদ্র্যে দুঃখে নিষ্পেষিত সে রাজা রাজকন্যার কাহিনী শুনতে চাইবে—এইটেই ত স্বাভাবিক। মজুরদের কথা মজুরদের কি চাষীদের কাছে ভাল লাগবার কথা নয়। তথাকথিত গণসাহিত্য পড়ে বাহবা দিই আমরা —মধ্যবিত্ত ও ধনী পাঠকরা। আমাদের কাছে ওটা বিস্ময়। সমাজের যারা অবহেলিত বলে পরিচিত, ব্যাকওয়ার্ড মাস, তাদের নিয়ে গল্প লিখলে সবচেয়ে বেশী বাহবা পাওয়া যায়—কিন্তু তারা সে বাহবা দেয়, না তারা সে-বই পড়ে ? তাদের কাছে ঐ রাজারাজড়া বা দেবদেবীর কাহিনীই সব চেয়ে ভাল লাগার কথা !'

কুমুদীশের বক্তৃতা দীর্ঘ হয়ে যেত হয়ত—কে একজন ওদিক থেকে চাপা ধমক

দিলেন। কারণ কবি তখন স্বরচিত কবিতা শোনাতে শুরু করেছেন।

কিছুক্ষণ পরেই বৈঠক শেষ হ'ল। কুমুদীশ এগিয়ে গেল কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত কিছু আলোচনাব স্থবিধা পাওয়া যায় কিনা দেখতে। বিমল সেই ফাঁকে বেরিয়ে পড়ল সেখান থেকে। সে চায় কিছুক্ষণ নির্জনে কথাগুলো ভেবে দেখতে। লোকজনেব ভীড বা উত্তেজিত আলোচনা, কোনটাই তাব সহ্য হবে না।

রাত প্রায় দশটা বাজে। ট্র্যাম বাস প্রচুব। একটু ইতস্তত করলে সে। পথ দীর্ঘ, বেশীবাত হ'লে বাডীব সবাই ভাববে। কিন্তু দু'একখানা বাস্-এব অবস্থা দেখে তাব আর উঠতে ইচ্ছা হ'ল না। এখনও সমান ভীড়। কোন বকম ভীডই ভাল লাগছে না।···সে সোজা হাঁটতেই শুরু করলে।

তাহ'লে সেদিন সেই মাঠেব মধ্যে বসে পূর্ণ মাষ্টাবমশাই যে কথাগুলো তাকে বলে গেছেন—সেই কথাই ঠিক! গান্ধীজিই ঠিক বুঝেছিলেন? সারা পৃথিবী যে উন্মত্ত আবেগে এগিয়ে যাচ্ছে যান্ত্রিক-শিল্প-প্রসাবে—সেটা কি আগাগোডা একটা বিরাট ভুল হচ্ছে? কাব্য সাহিত্য শিল্প এবং সেই সঙ্গে চিরকালীন মানবের যা সর্ব-প্রধান আশ্রয় ও সান্ত্বনা, সহজ সরল ঈশ্বর-বিশ্বাস সব কিছু ধুয়ে মুছে দেবে এই যন্ত্রদানব—তার জায়গায় ডেকে আনবে স্বার্থ-সংঘাত আর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র!···

কে জানে!····

What's wrong with God?···

এলোমেলো অসম্বন্ধ কথা সব মনে হচ্ছে কেন?

কিসের কথা ভাবছিল সে? পূর্ণবাবুব কথা? দেশ এবং জাতিব উন্নতির ফলে যদি পূর্ণবাবুব মত লোক দু'চার-জনও না তৈবী হয়, তাহলে দেশের সেইটেই হবে দুর্ভাগ্য!···

না। এসব কথা ভাববার সময় তার নেই, সে মাথাটা নাডা দিয়ে যেন নিজেকে চিন্তামুক্ত করতে চায়।···অতবড় চিন্তায় তার কি দরকার। কীই বা কবতে পারে সে? কতটুকু পারে? তিনটে বোনের বিয়ে দিতে হবে তাকে। অন্ধ বাবা, রুগ্ন মা। ছোট ভাইটাকে জোর ক'রে লেখাপড়া ছাড়িয়েছে।·· যদি এখনও সম্ভব হয় ত তাকে পড়াবে। তার ঘাড়ে কারখানার কাজ চাপিয়ে দেবার

হয়ত বিমলের সত্যিই কোন অধিকাব ছিল না। ওব মতই যে অভ্রান্ত, এমন অহঙ্কারেব ভূত কেন তাব মাথায় চেপেছিল কে জানে !

পথ ক্রমশ জনহীন হয়ে আসছে। ক্বচিৎ দু একটা গাড়ী এবং ট্র্যাম বাস।··· উত্তব-পশ্চিম দিকে মেঘ জমেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুবণে তাব ঘনকৃষ্ণ আড়ম্বরটা চোখে পড়ে।···এখনও দীর্ঘ পথ তাকে চলতে হবে। শেষ অবধি বাস্-এই চাপতে হবে নাকি ?

সে আবও জোবে হাঁটতে শুরু কবল।

২৩

ঝড়টা ওঠবাব আগেই বিমল কোনমতে বাড়ী এসে পৌছল। একেবাবে এড়াতে পাবে নি অবশ্য, গলিব মোড়ে পড়বাব সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম ঝাপ্টাটা উঠে পড়েছিল, তাব ফলে ধূলো আব জঞ্জালে মাথা-মুখ ভবে গেছে। মুখেব মধ্যেও ঢুকেছে ধূলো।·· শেষ-এটুকু ছুটেই এসেছে তবু। আব এক মিনিট দেরি হ'লেই জলও এসে পড়ত—চৌকাঠ ডিঙ্গোবাব সঙ্গে সঙ্গেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল।

দীর্ঘ পথ জোবে হেঁটে আসতে হযেছে, তাব ওপব শেষটা ত ছোটাই—সদবেব ভেতবে পড়ে নিঃশ্বাস নেবাব জন্যই থামতে হ'ল তাকে। রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে তখন—কোনদিকে তাকিয়ে দেখবাব মত অবস্থা তাব নয়। প্রথম নিঃশ্বাসটা ফেলে সে সবে পকেট থেকে রুমালটা বাব কবে কপাল ও ঘাড়েব ঘাম এবং ধূলো মুছতে শুরু কবেছে—কে একজন সেই অন্ধকাবেব মধ্যেই পায়েব ওপব লমড়ী খেয়ে পড়ে প্রণাম কবলে এবং ব্যাপাবটা কী ঘটে গেল ভাল ক'রে বোঝবার আগেই উঠে ওকে সজোবে জড়িয়ে ধবল।

'দাদা এতক্ষণে ফেরবার সময় হ'ল আপনাব! আমি সেই সন্ধ্যে থেকে এখানে বসে আছি খবরটা আপনাকে দেব বলে। এখনও বাড়ীতে কাউকে বলি নি। আপনাকেই আগে দেব বলে চেপে রেখেছি !'

অন্ধকারেও না চেনবার কোন কারণ নেই। এমনি ক'রে জড়িয়ে ধরা পুলকের এক বদভ্যাস।

বিমল হেসে বললে, 'ব্যাপাব কি বে পুলক, ছাড ছাড। প্রাণ গেল যে! একটু দম নিতে দে। অনেকটা ছুটে এসেছি।…এত উচ্ছ্বাস কিসেব? মাইনে বেড়েছে?'

পুলক আলিঙ্গনটা একটু শিথিল কবলেও একেবাবে ছাডলে না। বললে, 'একটু আধটু নয় দাদা। একেবাবে ছ'শ' কুডি টাকা হয়ে গেল। আমি য্যাসিস্ট্যাণ্ট ফোবম্যান হযেছি!'

'সে কি? কবে পবীক্ষা দিলি, আমাকে ত বলিস নি।'

'পরীক্ষা দিতেই হয নি। শুনুন না কী ব্যাপাব। পবশু শুনলুম আমাদেব ফোবম্যান হঠাৎ মারা গিযেছেন। তিন চাব দিন আগেই একটা স্ট্রোক্ হযেছিল, তাইতেই মাবা গেছেন। কাল শুনলুম সে জাযগায—তাঁব যিনি য্যাসিস্ট্যাণ্ট তাঁকেই প্রমোশন দেওযা হবে, আব য্যাসিস্ট্যাণ্টের জন্য বিজ্ঞাপন কবা হবে কাগজে।… অনেকক্ষণ ভাবলুম কথাটা শুনে। ছ'পা এগুই—তিন পা পিছুই। শেষে চবম সাহসে ভব ক'বে ছুটিব পব দেখা কবলুম ইঞ্জিনিয়াব বড সাহেবেব সঙ্গে। একবকম মরীয়া হযেই চলে গেলুম, কী আব কববেন, বড জোব তাডিয়ে দেবেন, এইত।… তিনি আমাব কথা শুনে প্রথমটা বিরক্ত ভাবেই ভুরু কুঁচকে ছিলেন, তাবপব কী ভেবে বললেন, "তুমি জানো যে য্যাসিস্ট্যাণ্ট ফোবম্যানেব কতকগুলো কোযালি-ফিকেশন, খানিকটা লেখাপডা দবকার। আমবা এসব কাজে পবীক্ষা ক'বে লোক নিই!" আমি বললুম, "জানি স্যাব। আমাব কলেজেব ডিগ্রী সার্টিফিকেট নেই কিন্তু পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি। আমাকে আপনি দয়া কবে প্রশ্ন করুন।" একটা কথা দাদা, আপনাব আশীর্বাদে ইংবেজীতেই কথা বলছিলুম। বোধ হয় তাইতেই সাহেব একটু অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন, একজন মজুবেব মুখে ইংবেজী কথা আশা করেন নি।…তিনি তখন ছ' একটা এমনি খুচবো প্রশ্ন কবলেন।…ববাতটাই ভাল ছিল, ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে ফেললুম। তখন তিনি আবও কয়েকটা কঠিন প্রশ্ন করলেন। ছুটোব উত্তব দিলুম, একটা পাবলুম না।…ওঃ, তখন যা মনেব অবস্থা দাদা, ঘেমে গিয়েছিলুম, ভয়ে লজ্জায়।…সাহেব কিন্তু রাগ কবলেন না, বরং কাছে এসে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "সাবাস্। তোমাব লজ্জার কোন কারণ নেই, এ

প্রশ্নের উত্তর অনেক পাস-করা ইঞ্জিনিয়ারও দিতে পারত না। তুমি এত লেখাপড়া করলে কোথায়? এসব ত কলেজে পড়তে হয়।…আর তাহ'লে মজুরের কাজই বা করছ কেন?" তখন ভরসা পেয়ে সব খুলে বললুম ওঁকে। উনি শুনে বললেন, "অল রাইট, তুমি এখন বাড়ী যাও। আমি এখনই ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের কাছে যাবো, তোমার কেস্ তাঁকে জানাব—তারপর তাঁর ইচ্ছা"।'

এক নিঃশ্বাসে এই দীর্ঘ কাহিনী বলে বোধ করি দম নেবার জন্যেই থামল পুলক।

বিমল বললে, 'তারপর?'

'আমি কোন আশা রাখি নি দাদা। তাই কাউকে বলিও নি, আজ অফিসে গিয়েই শুনলুম ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ডেকেছেন। বুক দুর দুর করতে লাগল, ঘেমে নেয়ে উঠলুম। সাহেবের ঘরে যেতেই সাহেব হাসিমুখে উঠে এসে আমার সঙ্গে শেক্-হ্যাণ্ড করলেন, বললেন, "যাও—তোমার চার্জ বুঝে নাও। আশা করি তুমি আরও উন্নতি করবে। তোমার কেস শুনে ডিরেক্টাররা সকলেই অবাক হয়ে গেছেন। তাঁরা তোমাকে দেখতে চান। এর পরের মীটিং-এর দিন তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো।"…ব্যস। আজ কাজ ক'রে আসছি একেবারে।'

পুলক আবার হেঁট ওকে প্রণাম ক'রে বললে, 'এ শুধু আপনার দয়াতেই সম্ভব হ'ল দাদা।'

এবার বিমলই ওকে বুকে চেপে ধরে বললে, 'আমার দয়ায় নয়, তোমার চেষ্টাতেই হয়েছে। এ তোমার পুরুষকার!'

সে ভেতরের দিকে এগোচ্ছিল—পুলক বাধা দিলে। বললে, 'আরও একটা কথা সেরে নিই দাদা।…আমি যে এই অসাধ্য সাধন করলুম, আমাকে কী দেবেন? বখশীষ?'

বিমল হেসে ফেলে বললে, 'বা রে, উল্‌টো চাপ! তুই কোথায় আমাদের খাওয়াবি—না আমি দেব বখশীষ!'

'ছোট় কেউ পরীক্ষায় পাশ করলে গুরুজনরা তাকে নানারকম উপহার দেন—এ ত বহুকালের রেওয়াজ দাদা!'

'কী উপহার চাস বল!'

'দেবেন—যা চাইব ?'

'সাধ্যে কুলোলে দেব !'

'প্রতিজ্ঞা করছেন ত ?'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ—ব্যাপাব কি বল্ তাডাতাডি। বাত হয়ে যাচ্ছে।'

'অমলের এ কাজ একদম ভাল লাগছে না। সে চায় পডতে, পাস করতে। হয়ত সে সময় চলে যায় নি। তাকে পড়তে দিন, যতদিন না সে লেখাপড়া শেষ ক'রে রোজগার কবতে শেখে—তাব ভার আমাকে বইতে দিন দাদা।···দোহাই আপনার, না বলবেন না !

অনেকক্ষণ চুপ ক'বে দাঁড়িয়ে বইল বিমল। ওবই ছোট ভাই অমল, তাব কথাই আজ সে বেশী কবে ভাবছিল না ? ··বাইরে ভীষণ দুর্যোগ চলেছে, প্রকৃতির উন্মত্ত উদ্দাম মাতামাতি। কিন্তু তাব চেয়েও তাব অন্তবেব দুর্যোগ বুঝি বেশী।

খানিক পরে প্রায় ভগ্নকণ্ঠে পুলক বললে, 'এটা কি আমার খুবই ধৃষ্টতা হচ্ছে ? এটুকু ভিক্ষে আমাকে দিতে পাবেন না ?'

আস্তে আস্তে বিমল উত্তব দিলে, 'কিন্তু এটা ত দেওয়া নয় ভাই, এ যে নেওয়া ! যত ক'বেই ঘুরিয়ে বল্ না কেন—সত্যি যা তা হচ্ছে এই যে, তুই আমাদের সাহায্য করতে চাস্।'

'আপনিই ঘুবিয়ে ধরছেন দাদা। এত দুঃসাহস আমার জীবনে হবে না।··· আপনি এইটুকু শুধু নিন—আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ থাকব আপনাব কাছে !'

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিমল বললে, 'পুলক, আমি তোকে সত্যি কথাই বলছি, অমলকে আবাব পডাব—অবশ্য যদি সে বাজী থাকে—আজই একটু আগে মন স্থিব কবেছি। টাকাকডিব কথাটা আমি এগনও ভাবি নি।···আচ্ছা, যদি দরকার হয় তোর কাছ থেকেই নেব !'

পূর্ণিমার সেই দিন থেকে কেমন যেন একটা আতঙ্ক হয়ে গেছে। সে রোজই এসে একবার ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখে বিমলের চেয়ারটার দিকে। রোজই একটা যেন আশঙ্কা থাকে যে হয়ত এর মধ্যেই বিমল অফিস ছেড়ে কোথাও চলে গেছে —গিয়ে দেখবে সে চেয়ার খালি কিংবা অন্য কেউ বসেছে।

বিমল তার সে দৃষ্টির অর্থ বোঝে কিন্তু বিরক্ত হয় না। বরং একটা কৌতুক অনুভব করে। পূর্ণিমা সম্বন্ধে তার মত অনেকটাই বদলে গেছে, আজকাল ওকে দেখলে সে খুশীই হয়, একটা সস্নেহ প্রশ্রয় ফুটে ওঠে তার দৃষ্টিতে।

শুধু তাই নয়, পূর্ণিমারই অনুরোধে এস-এ-এস পরীক্ষাতেও বসতে হয়েছে তাকে। পূর্ণিমাই প্রত্যহ খোঁচাত। বিমলের সাহায্যে অরুণ গত বছর পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে—বিমলের পরীক্ষায় বসতে ভয় কি? এটা দিয়ে ফেলুক সে, যেমন করে হোক—না হয় প্রথম বছর না-ই পারল পাশ করতে।

বিমল স্নিগ্ধ সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে বলত, 'তুমি আমাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে এই অফিসের সঙ্গে বেঁধে ফেলতে চাও, না? এই পরীক্ষাটায় পাশ করলেই কি আমি বাঁধা পড়ব।'

'না, আয় ত বাড়বে কিছু। ভবিষ্যতেও একটা উন্নতির আশা থাকবে—'

'উন্নতির জন্যেই কি আমি আর কোথাও যাবো—এই তোমার বিশ্বাস?'

'জানি না। আমি আপনার সঙ্গে তর্কে পারব না। আপনি পরীক্ষাটাই দিন না। আপনি পরীক্ষা দিতে পারেন নি, এটা ত কেউ বলবে না।'

'কিন্তু আমার যদি উন্নতি হয়ে যায়—আমি হয়ত অন্য কোথাও চলে যাবো পূর্ণিমা, সে ও ত সেই একই কথা হবে। তোমার পাশের এই সীটটি জুড়ে চিরকাল বসে থাকব, এমনই বা ভাবছ কেন?'

হেসে বলত বিমল। পূর্ণিমার দু' চোখ ঝাপ্সা হয়ে আসত, সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলত, 'তা বলে আমি আপনার উন্নতি কামনা করব না, এমন কথাই বা আপনি ভাবছেন কেন?'···

ওর কণ্ঠস্বরেই ওর অবস্থাটা টের পেত বিমল, কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলত, 'তুমিও প্রাইভেটে বি. এ-টা দিয়ে ফ্যালো পূর্ণিমা। এসো একসঙ্গেই পরীক্ষার জন্য তৈরী হই।'

মুহূর্তের জন্য আশাতে আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত পূর্ণিমার, তারপরেই আবার ম্লান হয়ে গিয়ে বলত, 'সে কী আর হবে। মালুটা মানুষ হয়ে না উঠলে—। দিনরাতে বাড়তি পাঁচটা মিনিটও সময় পাই না যে!'

আর কথা বাড়াত না বিমল।

সেদিন ছুটির পর বিমলই প্রস্তাব করলে, 'চলো মাঠে গিয়ে একটু বসা যাক—আজ বেশ খানিকটা সময় আছে হাতে!'

প্রস্তাবটা শুনে খুশীতে রাঙা হয়ে উঠল পূর্ণিমা। আজও সে ঠিক ছেলেমানুষের মত খুশী হয়। যদিও ওরা ছুটির পর আজকাল মাঝে-মাঝেই মাঠে গিয়ে বসে। টিউশনীর আগে একঘণ্টা কেন—আধঘণ্টা সময় পেলেও। এইটুকুই—পূর্ণিমার মনে হয় ওর জীবনে ওয়েসিস্। সে সারাদিনের নিশ্ছিদ্র নিরবসরের মধ্যে সমস্ত সময়ই যেন মনের অবচেতনে এই সময়টুকুর অপেক্ষা করে। অবশ্য প্রায়ই ওদের অফিসের কাজ সেরে বেরোতে দেরী হয়ে যায়—দুজনের একজনের দেরী হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, আর তাহ'লেই আড্ডার সুযোগ যায় নষ্ট হয়ে। সে সব দিনগুলো ফাঁকা ফাঁকা লাগে পূর্ণিমার। বিমলের বাহ্য কাঠিন্যের আবরণটা ভেঙ্গে যাবার পর ওর মিষ্ট, ভদ্র, সহানুভূতিশীল আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছিল। তাই পূর্ণিমার মনে হয়, ওর সামান্য মাত্র সাহচর্যেই মনের ক্লান্তি অনেকখানি দূর হয়ে গিয়ে একটা নবীনতার আস্তরণ পড়ে সেখানে।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে আজও ছোলাভাজা কিনলে। চা-ওলা একটি প্রায় চেনাই হয়ে গেছে, সে ঠিক আসবে চা দিতে। সে আজকাল চা দিয়ে দু একটা সুখ-দুঃখের গল্পও ক'রে যায়। লেখাপড়া শিখতে পারে নি বলে তার ভারি আফশোষ। তবে সে ছেলেকে প্রাণপণে 'লিখাপড়ি' শেখাচ্ছে। ছেলে পাটনা কলেজে পড়ে—যদি ভাল ভাবে পাশ করে ত ডাক্তারি পড়াবে। ওদের গাঁয়ে

একদম 'ডাগ্দার' নেই—কারুব অসুখবিসুখ হলে সাত 'কোশ' পথ ভেঙ্গে সরকারী দাওয়া-খানায় যেতে হয়, তাও সেখানে অর্ধেক ওষুধ মেলে না। ডাগ্দারও দেখেন না ভাল ক'রে। যাবা কিছু দিতে পারে তাদেবই দেখেন। যদি বৈজরঙ্গজী 'কিবপা' করেন ত সেই দুঃখ সে ঘোচাবে—

এখানে এসেই চা-ওয়ালাব কথা মনে পড়ল। আলোচনাটাও চলল সেই পথ ধবে।

কথাব পৃষ্ঠে কথা ঃ বিমল বললে, 'ত্থাখো—লোকটি অশিক্ষিত সামান্য লোক। কিন্তু সে চাইছে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে গাঁয়েই বসাতে, নিজেব দেশেব, গ্রামের উন্নতি। আমাদেব মত কেবলই শহবেব মুখ চেয়ে নেই। বাঙ্গালীব পেটে কালিব আঁচড পডলেই সে চায় শহরে এসে চাকরী কবতে। শিক্ষিত লোক যদি গ্রামে না থাকে ত গ্রামের উন্নতি হবে কেমন ক'বে?'

পূর্ণিমা বললে, 'আপনি ত কখনই গ্রামে যান নি। কিন্তু আমি গিয়েছি। একবাব—দিদিমার অসুখেব সময দু' মাস গিযে ছিলুম মামাব বাডী। সে কী পবিবেশ—প্রাণ যেন হাঁফিয়ে ওঠে।'

'সেই পরিবেশটাই বদলাতে হবে। আর শিক্ষিত লোকেবা যদি না থাকে ত কোনদিনই সে কাজটা হযে উঠবে না যে।'

ততক্ষণে ওবা মাঠে নিবিবিলি একটু বসবাব জাযগা পেয়েছে। অভ্যাস-মত রুমাল পেতে ছোলাভাজাগুলো ঢেলে দিযে নিজেই সর্বাগ্রে কযেকটা দানা মুখে পুরে বিমল বললে, 'তোমাব সঙ্গে এই ব্যাপাবেই একটু পবামর্শ কবতে চাই পূর্ণিমা—'

পূর্ণিমা কযেকটা ছোলাভাজা মুখে তুলতে যাচ্ছিল। কথাটা কানে যেতেই যেন কেমন আড়ষ্ট, কাঠ হযে ওব মুখেব দিকে তাকিয়ে বইল।

ওব সেই আড়ষ্টতা এবং আতঙ্ক বিমলেব চোখ এড়াল না। সে হেসে বললে, 'ভয নেই—এখনই কিছু কবছি না। কথাগুলো মন দিযে শোন আগে, তাবপব অমন কবে তাকিও।'

পূর্ণিমা চোখ নামিয়ে নিয়ে ধীবে ধীবে ছোলাভাজাগুলো মুখে তুললে বটে কিন্তু কোন উত্তর দিলে না।

বিমল বললে, 'একটা সুযোগ পাচ্ছি। নিখিল বলে আমার যে ছাত্রটি আছে, তার বাবা সত্যশরণ বাবু ওঁদের দেশের ইস্কুলের সেক্রেটারী। ওঁর কাছে একদিন কথায় কথায় বলে ফেলেছিলুম যে যদি মাথার ওপর এতগুলো দায়িত্ব না থাকৃত, তাহলে আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কোন পাড়াগাঁয়ে গিয়ে মাষ্টারী করতুম।··· উনি হঠাৎ পরশু দিন একটা অফার দিয়েছেন। ওঁদের ইস্কুলে এখন যিনি হেড্‌মাষ্টার আছেন--আর বছর খানেকের মধ্যেই তিনি রিটায়ার করবেন। সে চাকরীটা উনি আমাকে দিতে চান। বলেন, আমরা ত দেশের কোন কাজেই লাগলুম না—আপনি যদি যান তবু হয়ত কয়েকটা ছেলে মানুষ হতে পারবে!'

পূর্ণিমা অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বললে, 'শুনেছি আজকাল নাকি বি-টি ছাড়া হেড্‌মাষ্টার করার নিয়ম নেই!'

'একেবারেই যে নেই তা নয়। সেটা সত্যশরণ বাবুই ঠিক ক'রে দেবেন বলেছেন। ওঁরাই ওয়ার্ধা ট্রেনিংটা নেবার ব্যবস্থা করবেন।'

আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল পূর্ণিমা। তারপর বললে, 'কিন্তু আপনার ফ্যামিলি?'

'সেদিকটায় একটু সুরাহা হয়েছে বলেই ত এ সব কথা ভাবতে পারছি। কনু এবারই পরীক্ষা দেবে, আর আমার বিশ্বাস ভাল ভাবেই পাস করবে। মণি ওর জন্যে কাজ ঠিক ক'রে রেখেছে। আষাঢ়েই ওদের বিয়ে হয়ে যাবে। ওধারে মণির লায়াবিলিটিও কমে আসছে। ওর বড় ভাগ্‌নেটি একটা অফিসে ঢুকেছে, বছর-খানেক পরেই সে আলাদা বাসা করতে পারবে। মণি বলেছে যে ঐ বাসাটাই ওদের ছেড়ে দিয়ে মণি সহরতলীতে কোথাও গিয়ে থাকবে। তা হলে অন্তত অশান্তির ভয় থাকবে না। কনুর মাইনেটা ভাগ্নের সংসারে কন্‌ট্রিবিউট্ করলেই ওরা মণির মা-বাবার ভারও নিতে পারবে। · মনু বিয়ে করবে না—তবে সে-ও আস্‌ছে বছর পরীক্ষা দিতে পারবে বলে মনে হচ্ছে। লতুকে পুলক পড়াচ্ছে, মনে হয় লতুও অন্তত স্কুল-ফাইন্যালটা দিতে পারবে।'···

মজ্জমান ব্যক্তি তৃণখণ্ড দেখলে আঁকড়ে ধরে—পূর্ণিমা ক্ষীণকণ্ঠে বললে, 'লতুর বিয়েও ত দিতে হবে!'

এবার বিমলের চুপ করে থাকার পালা। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বসে বসে কয়েকটা

ছোলাভাজা নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললে, 'আমরা সবাই স্বার্থপব—সুযোগ সুবিধা পেলেই আমাদেব আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে। মুখে যতই পুলককে বলি যে আমাব কাছে তাব কৃতজ্ঞ থাকার কোন কাবণ নেই—কিন্তু এব ভেতবই একদিন তাব কৃতজ্ঞতার মূল্য চেয়ে বসেছি।··· সমস্ত লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে সেদিন তাকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা ক'বে বসলাম, যদি তাব বাবাব কাছে তাব সঙ্গে নতুব বিয়েব কথা পাড়ি ত তার আপত্তি আছে কিনা?···অভিলাষ বাবু পুলকেব জন্য মেয়ে খুঁজছেন সেটা শুনেই অবশ্য—। ওঁবা, ঠিক যাকে আমাদেব পাল্‌টি ঘব'বলে, তা নন। তবে অভিলাষবাবু মানুষটা মোটেব ওপব ভালই—আধুনিক দৃষ্টিও আছে অনেকটা, হয ত রাজীও কবাতে পাবব। পুলকেব ওপব খুব অবিচাব না হয়—মনে একথাটাও ছিল বৈকি। কাবণ পুলক সত্যিই রূপবান, আব নতু—খুব বেশি হয ত চলনসই। ওব মনটা জেনেই কথা পাড়ব ভেবেছিলাম—কিন্তু সে দায় থেকেও পুলক আমাকে অব্যাহতি দিলে। প্রণাম কবে বললে, দাদা আপনি চিবদিনেব মত সত্যিকাবেব দাদা হবেন আমার, এব চেযে আনন্দেব কথা আমাব কাছে কিছুই নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে বাবাব কাছে কথা পাড়ুন, তাঁকে বাজী কবানোব চেযে মাকে বাজী করানোই কঠিন কাজ—সে ভাবটা আমি নিজেই বব নিচ্ছি!'

আবাবও একটু অপ্রস্তুত ভাবে হাসল বিমল। তাবপব বললে, 'অমলের ভাবও পুলক নিতে চেয়েছিল, তবে তাব দবকাব হয় নি।···এখন দেখছি আমিই ঋণী হয়ে পড়লাম ওব কাছে।'

কোন্ দূব থেকে যেন পূর্ণিমা বলে, 'আপনি অভিলাষবাবুব কাছে কথাটা পেড়েছিলেন?'

'না। এখনও ঠিক পাড়া হয নি। তবে সেটা খুব কঠিন হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। এব ভেতবই পুলক তাব মাকে অনেকটা বাজী ক'বে এনেছে।·· তাই মনে হচ্ছে যে বছবখানেকের ভেতব আমি অনেকটা হাল্কা হ'তে পাবব—অতটা দাযিত্ব আর থাকবে না। এদেব ব্যবস্থা হয়ে গেলে—মা-বাবা আমার কাছে গিয়েই থাকতে পাববেন। আব যদি মনু পাস কবে এবং কাজ-কর্ম একটা পায়—ত সেও থাকতে পারে ওঁদের নিয়ে।'

ইতিমধ্যে ওদের পরিচিত চা-ওয়ালা এসে গিয়েছিল। সে দু' ভাঁড় চা দিয়ে একটু গল্প করে চলে গেল। আবারও এদেব মধ্যে নামল একটা কষ্টকর নীরবতা।

দূবে দুটি-তিনটি ছোকরা বসে ছিল। তাদের মধ্যে একজন একটা আধুনিক গান ধরেছে। বড় রাস্তা থেকে ভেসে আসছে বহু মোটবের হর্ন আর চলতি বাসের আওয়াজ। কোলাহলেব শেষ নেই—তবু এই দুটি প্রাণীব কাছে ওদের এই বাক্যহীন নিস্তব্ধতা যেন দুঃসহ হয়ে উঠছে।

একটু পরে, নিজেব অসাড মনটাকে যেন চাবুক মেরেই সক্রিয় ক'রে তুলল পূর্ণিমা। সে ঘাসেব ওপব থেকে বিমলের রুমালখানা তুলে নিয়ে ঝেড়ে পাট করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'নিন এটা পকেটে পুরুন। এবার উঠতে হবে!'

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই, অকস্মাৎ বিমল এক কাণ্ড ক'রে বসল।

হয়ত সে এতক্ষণ ধবে এই কাণ্ডটাই করতে চাইছিল, মনে মনে এই কথা-গুলোরই রিহারস্থাল দিচ্ছিল—ভরসা বা সাহসের অভাবেই এতক্ষণ তাব এই নিরবতা; হয়ত পূর্ণিমাব শেষেব কথাগুলোতে—আজকেব এই নির্জন অবসবেব এখনই পরিসমাপ্তি ঘটবে, এমন সুযোগ আব হয়ত মিলবে না—এই সচেতনতাই তাকে মরীয়া ক'বে তুলল শেষ পর্যন্ত—

রুমালসুদ্ধ পূর্ণিমাব ডান হাতখানা নিজের দু' হাতের মধ্যে ধবে ফেলে, মাথাটা একটু নামিয়ে কেমন একরকম চুপি চুপি বললে, 'একা একা এ জীবনে দাঁড়িয়ে লড়াই কবা বা এগিয়ে যাওয়া—দুই-ই বড কষ্টকব পূর্ণিমা। জীবনে সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা ভাগ ক'বে নেওয়ার একটা সাথী দরকার—পুরুষেরও, মেয়েবও।... তুমি, তুমি আমাকে বিয়ে কববে?'

সন্ধ্যা নেমে এসেছে মাঠে। একটু একটু ক'রে সেই অবারিত মাঠেও ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার। তবু পশ্চিম আকাশেব রক্তাভা একেবারে বিদায় নেয় নি তখনও—কাছের জিনিস তখনও নজবে পড়ে।

বিমল কথাগুলো বলবার সময় পূর্ণিমাব মুখের দিকে তাকাতে পারে নি, মাটিব দিকে চোখ রেখেই বলেছিল। এখন—কথা শেষ হ'তে ওর হাতখানায় অস্বাভাবিক একটা কম্পন অনুভব ক'রেই চোখ তুলে তাকাতে নজরে পড়ল—পূর্ণিমার সমস্ত

মুখ যেন এই এক নিমেষেই রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ; তার দৃষ্টিতেও কেমন একরকম প্রাণহীন বিহ্বলতা। সে চেয়ে আছে বিমলের মুখের দিকেই—কিন্তু তাতে না আছে পরিচয়ের নিশ্চয়তা আর না আছে এতটুকু অনুভূতির চিহ্ন!

অনেকক্ষণ—বোধ হয় এক মিনিটকাল বিমল বিস্মিত, কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে চেয়ে রইল ওর সেই প্রায়-মৃত্যুপাণ্ডুর মুখের দিকে—তারপর তখনও-মুঠোর-মধ্যে-ধরা হাতখানায় একটু চাপ দিয়ে মৃদুকণ্ঠে ডাকল, 'পূর্ণিমা।'

আহ্বানের যেন এক মর্মান্তিক আঘাতেই চমকে কেঁপে জেগে উঠল পূর্ণিমা। তারপর অকস্মাৎ—ব্যাপারটা কী ঘটে গেল বিমল তা বোঝবার আগেই—প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে।···সামান্য নয়—আকুল, বুক ফাটা কান্না। যেন বহু দিনের বহু হতাশা একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর অন্তর ভেঙ্গে, বুকের প্রাচীর বিদীর্ণ ক'রে। কান্নার আবেগে সে এক সময় সেই মাঠের ওপরই লুটিয়ে পড়ল।··

আর যাই হোক্—এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না বিমল। সে ঠিক বুঝতেও পারল না এর কারণ।·· বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। ভাগ্যে আশে-পাশে তেমন লোকজন নেই। কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নি—বহু লোকই মাঠে বেড়াচ্ছে, কেউ এদিকে এসে পড়তে কতক্ষণ ?

সে ওকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্য বার বার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাকতে লাগল, 'পূর্ণিমা, পূর্ণিমা—ওঠো। লক্ষ্মীটি, অমন ক'রো না।···কেউ এসে পড়লে—লক্ষ্মীটি—পূর্ণিমা—'

সম্ভবত সে ডাক তার কানে পৌঁছল না--নিজের আবেগ তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই তখন অবশ করে দিয়েছে—অথবা কানে পৌঁছলেও নিজেকে সামলে নেবার শক্তি ছিল না, সে তেমনিই আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। যতটা সম্ভব নিঃশব্দেই কাঁদছিল সে—কিন্তু তার আবেগের বিপুলতা বোঝা যাচ্ছিল বিমলের সামনে উপুড় হয়ে পড়া পিঠটা এবং কাঁধ দুটোর ফুলে-ফুলে ওঠা থেকেই—

আরও একটু ইতস্তত ক'রে বিমল তার মাথাটায় হাত দিয়ে একরকম জোর ক'রেই তুলে ধরল। ধুলো, ঘাসের কুঁচি, শুক্‌নো কুটো চোখের জলের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে মুখখানার অবস্থা যৎপরোনাস্তি করুণ হয়ে উঠেছে, সেদিকে চেয়ে

ক্ষণকালের জন্যে বিমলেরও চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে এল অকারণেই। কিন্তু সেও জোর ক'রে নিজেকে শাসন করলে। তার রুমালখানা তখনও পূর্ণিমার হাতেই ধরা ছিল, সেইটেই টেনে নিয়ে অপটু হাতে ওর মুখটা মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, 'পূর্ণিমা, শান্ত হও, এমন হবে জানলে—। ছি ছি, কী হয়েছে বলো ত! কেউ দেখলে কী মনে করবে। একটু সামলে নাও নিজেকে।'

বহিঃপ্রকাশেই বেদনার প্রচণ্ডতা কমে। হয় ত সব হৃদয়াবেগেরই এই নিয়ম। এতক্ষণের এই বিপুল অশ্রুবিসর্জনে পূর্ণিমারও বেদনা অনেকটা কমে এসেছিল। এইবার সে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে একটু সামলে নিলে। যদিও কান্নার বেগ একেবারে দমন করা সম্ভব হ'ল না, বরং নিরুদ্ধ রোদনে তার সমস্ত দেহটা আরও বেশী করে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল—কিন্তু তবু সে মুখ থেকে কাদাধুলোর দাগ ভাল ক'রে মুছে ফেলে খানিকটা ভদ্র হ'ল। আন্দাজে আন্দাজে চুলগুলোও যথা-সম্ভব ঠিক ক'রে নিলে।

বিমল তাকে একটু অবসর দিয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'আমাকে মাপ করো। আমি এতখানি কোন বেদনার জায়গায় আঘাত দিয়ে ফেলব বুঝলে কখনই কথাটা তুলতুম না। আমারই অন্যায় হয়েছে। হয়ত একটু বেশী স্বাধীনতা নিয়ে ফেলেছি, কেবলই নিজের দিক থেকে সবটা ভেবেছি। নিজের মূল্যও বেশি ক'রে ধরেছি হয় ত। যাই হোক্—তুমি শান্ত হও পূর্ণিমা। এমন ধৃষ্টতা আর কখনও হবে না—'

অসহায়, ব্যাকুলভাবে ওর দিকে একবার তাকাল পূর্ণিমা। ঝাপ্‌সা আলোতে সেটা ঠিক নজরে না এলেও সে ওর হাত-দুটো নিজের থর-থর-কম্পিত হাতে চেপে ধরতে ভুল বোঝার আর কোন সম্ভাবনাই রইল না। আকুল, অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে পূর্ণিমা বললে, 'কেন মিছিমিছি এ সব কথা ব'লে আমাকে আরও দুঃখ দিচ্ছেন। ···আপনি কি কিছুই বুঝতে পারেন না?· আমি যে—আমি যে আপনার বদলে ঈশ্বরকেও পেতে রাজি নই।· আপনি আমাকে যে অনুগ্রহ করেছেন—তাতে আমি এই মুহূর্তে মরে গেলেও সুখে মরতে পারতুম।·· কিন্তু আমি যে কী অসহায় তা আপনি জানেন না!···বৃদ্ধ রুগ্ন বাপ-মা, নাবালক ছোট বোন—আমার যে হাত-পা আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। সৌভাগ্য যেচে এলেও যে নিতে পারে না—তার মত দুর্ভাগা আর কেউ নেই! কেউ নেই!'

আবারও উচ্ছ্বসিত কান্নায় কণ্ঠ বুজে এল পূর্ণিমার, সারা দেহ কান্না চাপবার প্রাণপণ চেষ্টায় কেমন একরকম বেঁকে বেঁকে উঠতে লাগল কিন্তু এবার আর সে ভেঙ্গে পড়ল না। বরং কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে, কোন রকম বিদায় সম্ভাষণ মাত্র না ক'রে, অভিভূত স্তম্ভিত বিমলকে একটিও কথা কইবার অবকাশ না দিয়েই—একরকম ছুটে চলে গেল সে। মাঠ পেরিয়ে জনবহুল রাজপথের দিকে, সেই জমাট-হয়ে-আসা অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল আলোকসজ্জার দিকে, যেন প্রাণপণেই ছুটতে লাগল সে। শুধু বহুলোকের মধ্যে এসে প্রকৃতিস্থ হওয়ার জন্যই নয়—দুর্ভাগ্যকে পেছনে ফেলে আসার একটা আশ্বাসও যেন তাকে এই দুর্নিবার আকর্ষণে ছুটিয়ে নিয়ে গেল!

২৫

পূর্ণিমা চলে যাওয়ার পরও বিমল বহুক্ষণ ওখানেই অনড় হয়ে বসে রইল। ওর সমস্ত মনের বল—এবং খানিকটা দেহের শক্তিও—যেন হরণ ক'রে নিয়ে গেছে ঐ মেয়েটি—যাকে কিছুদিন আগেও করুণার চোখে দেখত সে।

বাস্তবিক সে যে ঠিক এতটা ভরসা করেছিল পূর্ণিমার ওপর, তা এই প্রস্তাবটা করার কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত কল্পনাও করে নি। অথচ এই মুহূর্তে নিজেকে একেবারেই অসহায় রিক্ত মনে হচ্ছে। যতখানি উদ্যম, যতখানি উৎসাহ নিয়ে এই ক-দিন ভবিষ্যতের কর্মজীবন সে কল্পনা করেছিল—তার যেন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। এই বিপুল ভার কি সে পারবে একেবারে একাকী বহন করতে?···

অবশ্য ঠিক নিজের কথাই সে ভাবছিল এটা বললেও বিমলের ওপর একটু অবিচার করাই হয়।·· পূর্ণিমার অসহায় অবস্থাটাও একটা যন্ত্রণাদায়ক কাঁটার মত তার বুকের মধ্যে বিঁধে খচ-খচ করছে। রূপকথার রাজকন্যার মতই পূর্ণিমা যেন কোন দৈত্য অথবা রক্ষপুরীতে বন্দিনী—সাহায্যের জন্য তারই মুখ চেয়ে আছে। ···অথচ তারও যে কিছুই করবার নেই এক্ষেত্রে। সেও একান্ত অসমর্থ—নিম্ন মধ্য-

বিত্তের সংসারে বাঁধা, নিজের দুর্ভাগ্যের বাইরে আর কোন দিকে তাকাবার তার অধিকার কোথায়? অপর কারুর দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাবতে যাওয়াই যে তার পক্ষে হাস্যকর বাতুলতা।...না কোথাও কোন উপায় নেই। শুধু শুধু প্রতিকার-হীন ক্ষোভে ক্ষত-বিক্ষত হওয়াই সার!...

অনেকক্ষণ সেইভাবে কাটল বিমলের—এলোমেলো চিন্তার গহন গভীরে ডুব দিয়ে। নির্জন অন্ধকার মাঠ, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও এখানে পূর্ণিমা ছিল—তার উপস্থিতি যেন এখনও একটা মৃদুগন্ধে তাকে ঘিরে আছে, হাত বাড়ালেই তার স্পর্শও সে অনুভব করতে পারবে সামনের ঘাসে। এখনও ওধারের খানিকটা অংশ হয়ত তার অশ্রুতে ভিজে। তাই এই চিন্তাগুলো বেদনাদায়ক হলেও সে-চিন্তাবিলাস ছেড়ে ওখান থেকে তার উঠতেও ঠিক ইচ্ছে করছিল না।

কিন্তু উঠতেই হ'ল শেষ পর্যন্ত। একটা লোক কোথা থেকে এসে ধপাস্ ক'রে বসে পড়ল পাশে।

'দেশলাই আছে দাদা—একটা জ্বালুন ত, কী একটা কুড়িয়ে পেলুম—দেখি!'

অন্ধকার মাঠের অন্ধকার কাহিনী, অনেক শুনেছে বিমল। সে একটু ত্রস্ত হয়েই উঠে দাঁড়াল। সংক্ষেপে 'না' ব'লে দ্রুত এগিয়ে চলল এস্প্লানেডের দিকে।

তাকেও ঠকাতে আসে লোক, আশ্চর্য!

অথবা তাদের মত লোককে ঠকানোই সহজ। যে ডুবছে সে-ই নাকি কুটো আঁকড়ে ধরে, বিচার-বিবেচনার সময় পায় না।

পড়াতে যাওয়ার মত তখন মনের অবস্থা নয় বিমলের, রাতও অনেক হয়ে গেছে। সুতরাং সে-চেষ্টাও সে করলে না। লক্ষ্যহীন ভাবে চৌরঙ্গীর ফুটপাথটা ধরে হাঁটতে লাগল, হাঁটতেও যে খুব ভাল লাগছে তা নয়—কিন্তু বাড়ী ফেরাও এখন অসম্ভব!

'বিমলবাবু!'

হঠাৎ পরিচিত-কণ্ঠের ডাকে তার চমক ভাঙ্গল একসময়। বহুদূর এসে পড়েছে সে, পার্ক স্ট্রীটের মধ্যে এসে ঢুকেছে কখন।

একটু বিস্মিত হয়ে চারিদিকে তাকাতে নজরে পড়ল—পিছনে নয়, বহুদূরেও নয়, ঠিক তার সামনেই দাঁড়িয়ে হাসছে জয়ন্তী।

হাসছে, তবে বড় ম্লান সে হাসি।

'আবে, আপনি! নমস্কার, নমস্কাব!'

'তবু ভাল, আমাকে চিনতে পাবলেন শেষ পর্যন্ত। কখন্ থেকে ত চেয়ে আছেন—আমাকে কি দেখতে পান নি?'

'সত্যিই পাই নি। মাফ্ কববেন।'

'আপনাকে এমন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে কেন বলুন ত? খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে। চলুন ঐ বেস্তোবাঁটাতে বসে একটু কফি খাওয়া যাক্।'

'চলুন।' বিমল খানিকটা অনিচ্ছাতেও বাজী হয়ে গেল। সত্যিই তখন বড় ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল তাব।

বেস্তোবাঁতে ঢুকে একটা কোণ বেছে নিয়ে বসল জয়ন্তী।

এই বেস্তোবাঁতেই আবও একদিন এসেছিল বিমল। সে আব পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা—

বিমল জোব ক'বে জয়ন্তীব দিকে মনটা ফিবিয়ে আনল।

লক্ষ্ণৌযেব চিকন-কাজ-কবা সাদা সাডী এবং বহুমূল্য প্রসাধনে আজও তাকে দেখাচ্ছে ফুলেব মতই। কিন্তু ঠিক সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুল নয। অনেকদিন আগে পুলক কোথা থেকে একটা বড় ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুল এনে দিযেছিল, সেটা একটা ফুলদানীতে রাখা ছিল তার ঘবে—কযেকদিনই। অনেকদিন ছিল সেটা, কিন্তু একদিন পবেই ওপবেব পাপডিটা একটু খসখসে হযে গিযে ফুলটা কেমন যেন মুষড়ে পডেছিল। আজ জযন্তীকে দেখে বিমলেব সেই ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুলটাব কথাই মনে পড়ল।

'তাবপব, আপনাব বিজনেস কতদূব? কী যেন ছবি তুলছিলেন—বেবিয়েছে সে ছবি? কেমন চলল?'

কফিব পেযালাটাতে চামচ নাড়তে নাডতে মাথা নত ক'বে জয়ন্তী বললে, 'ঠাট্টা কবছেন বুঝি?'

'ঠাট্টা!' অপ্রতিভ হয়ে উঠল বিমল, 'সত্যিই, বিশ্বাস করুন, আমি খুব সহজ-ভাবে প্রশ্নটা করেছি। আমি ও জগতের কোন খবরই রাখি না জানেন ত—

নিজের সংসার এবং জীবন নিয়েই বিব্রত !···কেন, সে ছবিতে লাভ হয় নি ?'

'সে ছবি শেষ হ'ল কোথায় ?···ব্যাপারটা ভাল ক'রে না বুঝেই ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলুম, সামান্য পুঁজি তলিয়ে গেল, কিছুই হ'ল না। যে লোকটি নামিয়েছিল —সে বহু ভরসা দিয়েছিল আগে, শেষ অবধি তার টিকিও দেখতে পেলুম না। মিছিমিছি ওঁর অনেক কষ্টের টাকা সবটাই নষ্ট হয়ে গেল।·· অনেক ঘোরাঘুরি করলুম, তাতে শুধু—। এ লাইনটাই বড় খারাপ বিমলবাবু।···আমি আর ওঁর কাছে মুখ দেখাতে পারি না।···উনি অবশ্য কিছু বলেন না—কিন্তু ওঁর খুব কষ্ট হয় তা বুঝি। আরও যেন তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেলেন এই ক-মাসে।···কী যে করব।···আমি অবশ্য হাল ছাড়ি নি, প্রাণপণে যুঝছি।···কিন্তু এখনও হাজার-বিশেক টাকার দরকার।···ডিস্ট্রিবিউটারদের ভরসা করেছিলুম, তারা এখন নানা সর্ত দিচ্ছে, অমুককে নামাতে হবে, অমুককে চাই। অথচ আমাদের ছবি বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, এখন আর কাস্ট বদলানো কি সম্ভব ?'···

আরও বহু কথা বলে গেল জয়ন্তী। কতক বিমলের কানে গেল কতক গেল না। ফিল্ম জগতের অধিকাংশ কথাই তার কাছে দুর্বোধ্য।··কফি শেষ হ'তে জয়ন্তীই দাম চুকিয়ে দিয়ে বাইরে আসতে আসতে বললে, 'এখন এমন মনের অবস্থা, একটা ভাল চাকরী-বাকরী পেলেও করতুম।···আমার ভবিষ্যৎ ভেবেই আরও যেন ওঁর পরমায়ু ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। আমার একটা ব্যবস্থা হয়েছে জানলে উনি অন্তত নিশ্চিন্ত হতেন।···ওঁর জন্যেই এখন আমার বেশি ভাবনা।'

বলতে বলতে জয়ন্তীর দুই চোখ জলে ভরে এল।

এই প্রথম ওর সম্বন্ধে খানিকটা শ্রদ্ধা বোধ করল বিমল। সহানুভূতির সুরে বললে, 'কোন ভাল মার্চেন্ট অফিসে চেষ্টা করে দেখুন না। আপনার ত বহুলোকের সঙ্গে জানাশুনো হয়ে গেছে ইতিমধ্যে—। সরকারী চাকরীর চেয়ে মার্চেন্ট অফিসের কাজেই আজকাল সুবিধে বেশী।'

'তাই দেখি।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে জয়ন্তী, 'আসবেন না একদিন আমাদের ওখানে। একটা রবিবার দেখেও ত এলে পারেন ! আসবেন একদিন ?'

কেমন যেন অনুনয়ের ভাব ওর সমস্ত ভঙ্গীতে।

'দেখি—।' বিমল সংক্ষেপে উত্তর দেয়।

এর পর কয়েকটা দিন বিমলের কাটল যেন একটা দুঃসহ বুকচাপা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। ঐ একান্ত যন্ত্রণাদায়ক চিন্তাটা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মন ছটফট করে —অথচ কোথাও পথ দেখতে পায় না মুক্তির। উপায়হীনতার পাষাণ-প্রাচীরে মাথা খুঁড়ে ভেতরে ভেতরে শুধু রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়!

বিস্মিত হয় বিমল নিজের মনোভাবেও।

পূর্ণিমা যে করে এমন ভাবে তার কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল তা সে একটুও টের পায় নি। অথচ আজ জীবন-পথে তারই অভাবের সম্ভাবনায় নিজেকে একান্ত অসহায় ও নিঃস্ব মনে হচ্ছে।

বিশেষ ক'রে সে দিন—ওদের সেই স্মরণীয় সন্ধ্যার পরের দিনে যে কাঁটা বিমলের বুকে বিঁধেছিল—তাকে অস্বীকার করার মত একটুকু ছলনার আশ্রয়ও সে খুঁজে পায় নি।

পূর্ণিমা এসেছিল দেরী ক'রে। ট্রাম বাসের বিভ্রাটে সেদিনও তাকে হেঁটে আসতে হয়েছিল—সে কথাটা বেখার সঙ্গে পূর্ণিমার প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়েছিল, পরে। বিমল প্রশ্ন করে নি—কোনদিনই করে না আজকাল—পূর্ণিমাই অন্যদিন নিজে থেকে এসে বলে কিন্তু সেদিন বোধ হয় তার সঙ্গে কথা কইবার মত মানসিক শক্তি ছিল না ওর। বহুক্ষণ সময় লেগেছিল পূর্ণিমার—সহজ হয়ে কথাবার্তা বলতে। এমন কি অফিসের কাজের প্রসঙ্গ তুলে সহজ হবার সুযোগটাও সে নিতে পারে নি অনেকক্ষণ।

হ্যাঁ—এড়িয়েই গেছে সে বিমলকে। আর সেইটেই হয়ত স্বাভাবিক।

কিন্তু সে মুখ তুলে না চাইলেও বিমল ওর দিকে চেয়ে দেখেছিল বৈকি।

এমন বিবর্ণ যে মানুষের মুখ হয়—তা বিমল আজ ওকে না দেখলে কোনদিন কল্পনাও করতে পারত না। এতদূর হেঁটে আসার পরিশ্রম তাকে ক্লান্ত ও স্বেদসিক্ত করলেও এতটুকু আরক্ত করতে পারে নি! তার মুখের সেই একান্ত রক্ত-শূন্যতা—তার বসে পড়বার অবসন্ন ভঙ্গী এবং সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে একটা বিষণ্ণ

হতাশার স্বর—এক কথায় ওর উপস্থিতিটাই যেন চাবুকের মত তার মনে গিয়ে লেগেছিল। সেদিনকার সেই অব্যক্ত প্রতিকারহীন যন্ত্রণা সহজে ভোলবার নয়।

তারপর এই ক-দিন অহরহ ভেবেছে সে। পথ দেখতে পায় নি এটা ঠিকই কিন্তু হারও মানে নি। একটা কথা মনে মনে এই কদিনে নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিল—পূর্ণিমাকে এতখানি আঘাত দিয়ে সে চলে যেতে পারবে না। কোন আদর্শের জন্যই নয়। কারণ তাহ'লে যে শূন্য অন্তর নিয়ে তাকে যেতে হবে, আর যাই হোক্ তা দিয়ে তার সংকল্পিত কাজ সুসম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা থাকবে না কোনদিনই—

বিমল পৌছবার অনেক আগেই খবরটা পৌছে গিয়েছিল। সাধারণত অফিসে আসবার সময় সে ট্রামে-বাসে চড়ে না—সেদিন দেরি হয়ে গেছে বলেই বাস্ ধরবার চেষ্টা করতে গিয়ে আরও খানিকটা দেরি হয়ে গেল—অফিসে পৌছল অফিস বসবার ছাঁকা কুড়িটি মিনিট পরে।

অফিস—বিশেষ ক'রে তার সেক্শনটি তখন তারই আলোচনায় মুখর—সে ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল, বাদল এগিয়ে এসে তার পিঠে প্রচণ্ড একটা চাপড় মেরে বললে, 'ওসব শুনছি না দাদা—মোটামুটি ছাড়তে হবে। বেশী নয়, গোটা পঞ্চাশ হ'লেই এই ক-টা লোকের একরকম চলে যাবে ?'

সুখবর ত বটেই—এবং কী সুখবর তাও আন্দাজ করতে অসুবিধে হ'ল না। তবু বিমল মুখে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললে, 'কিন্তু হয়েছে-টা কি ? তোমাদের এই ক'টা লোকের জন্যে সামান্য পঞ্চাশটি টাকা জোগাড় করার কী এমন অকেসন ঘটল ?'

'আহা। কিছুই যেন জানেন না।' সুশান্ত বলে উঠল ওদিক থেকে।

বাদল বললে, 'তা নাও জানতে পারে অবশ্য। এই ত এল। পাসের খবর এসেছে—পাস করেছ বুঝলে ?'

'ও, এই !' তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে বিমল।

'এই মানে কি ? ক-টা লোক এক চান্স্-এ এ পরীক্ষায় পাস করতে পারে তাই শুনি ? এখনই ত একটা ইন্‌ক্রিমেণ্ট্ বাঁধা—তারপর অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বড় সাহেব।...সরকার সালাম !'

আভূমিনত হয়ে সেলাম করবার একটা ভঙ্গী করে বাদল।

'থাম্—থাম্। বথামি করিস নি!' হাসি হাসি মুখে উত্তর দেয় বিমল।

'না না। উড়িয়ে দিলে চলবে না। সামনেব শনিবারেই ভোজটা লাগানো হবে। মেনুও তৈবী। এখন টাকাটা কবে ছাড়বে বলো—'

'হচ্ছে হচ্ছে।' বিমল এগিয়ে যায় তাব সীটেব দিকে। আসলে তাব দৃষ্টি তখন খুঁজছিল একটি বিশেষ লোককে।...এ সংবাদে যাব সবচেয়ে উল্লসিত হবার কথা—সে কৈ?

পূর্ণিমাব সীট খালি।

এখনও আসে নি পূর্ণিমা! পঁচিশ মিনিট হযে গেছে!

অস্বাভাবিক দেবি এটা—ওব পক্ষে।

সে সাধাবণত যা কবে না তা-ই কবে বসল। বেখাকে প্রশ্ন কবল, 'পূর্ণিমা এখনও আসেনি আজ? কী হ'ল তাব?'

'কে জানে।' কুট ক'বে কামড দেয় বেখা, 'আপনাব সঙ্গেই ত তাব মেলামেশা বেশি। তাব লেটেস্ট খবব আপনাবই ত জানবাব কথা!'

মুখ টিপে হাসে একটু সে—কথাটা শেষ ক'বে।

যতই সতর্ক থাক ওবা—ওদেব ঘনিষ্ঠতাটা সহকর্মীদেব চোখ এড়ানোব কথা নয়। নিজেব নির্বুদ্ধিতায নিজেই বিবক্ত হযে ওঠে বিমল। তবে আব কথাও বাড়ায না। গম্ভীব মুখে একটা ফাইল টেনে নেয়।...

খববটা পাওযা গেল দুটোবও পব। কে একজন অন্য সেকশন থেকে এসে খবরটা দিলে, 'শুনেছেন বিমল বাবু, আপনাদেব সেকশনেব পূর্ণিমা বায়েব খবব?'

'না ত।...কী খবব?'

বুকেব মধ্যে ধ্বক্ ক'বে উঠল বিমলেব! মুখটা নিমেযে বিবর্ণ হয়ে গেল।

'কৈ না ত। কী খবব?' কোনমতে ঢোঁক গিলে প্রশ্ন কবে সে।

'ভয নেই—এমন কিছু নয়। জ্বব। তাই নিযেই নাকি অফিসে আসছিল, পথেব ধারে মাথা ঘুবে বসে পডে। দৈবক্রমে সেটা ওদেব পাড়াব মধ্যেই—আর ওদের যিনি দেখেন সেই ডাক্তারও সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনিই ওকে বাড়ীতে পৌছে দিয়েছেন।'

'কে—কে বললে ?—মানে খবর দিলে ?' অতিকষ্টে কণ্ঠস্বর এবং ঠোঁট দুটোকে আয়ত্তে এনে প্রশ্ন করলে বিমল।

'সেই ডাক্তার বাবুটিই এইমাত্র ফোন করেছিলেন।...'

খুবই সাধারণ ঘটনা। এমন কোন ভাবী অসুখ কিছু নয়। সামান্য জ্বর—তার জন্যই একটু দুর্বলতা। কিন্তু তবু বিমল সারাক্ষণই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বার বার জোর ক'রে কাজে মন বসাতে গেল—বার বারই মন সেখান থেকে সরে এল। টাকা-আনা-পাইয়ের শুষ্ক নীরস হিসেব এবং হিসেব-পরীক্ষকের কঠিন বস্তু-তান্ত্রিক নোট-এর মধ্যে বার-বারই জেগে উঠতে লাগল নিরতিশয় ক্লান্ত এবং রক্তহীন একখানা মুখ! কাজে ভুল হয়ে যেতে লাগল বার বার, ফাইলগুলো কাটাকুটিতে অপরিষ্কার হয়ে উঠল।

শেষে বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে বিমল মাথায় মুখে-জল দিয়ে এল।

রেখা আবারও একটা কামড় দিলে, মুচকী হেসে বললে, 'বিমলবাবুর আজ হ'ল কি, কাজে যে মনই বসছে না।··আপনারও কি শরীর খারাপ হ'ল না কি ?··· বরং সকাল ক'রে বাড়ী চলে যান!'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। আগে হ'লে বিমলও কড়া জবাব দিত। হয়ত সত্যিই উঠে চলে যেত। কিন্তু মনের মধ্যে সত্যি-সত্যিই কোথায় একটা অপরাধীর ভাব, একটা সঙ্কোচ অনুভব করছিল—সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সে বিরক্ত-ভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করলে একবার—কিন্তু কোন জবাবই দিতে পারলে না।...আর কতকটা সেই জন্যেই—পাঁচটার পরও আধ ঘণ্টা পর্যন্ত বসে ফাইলগুলো নিয়ে অকারণেই নাড়াচাড়া করলে। এটা রেখার কাছে একটা শোচনীয় পরাজয়ই বলতে হবে—তার পক্ষে অন্তত—কিন্তু, সেই একান্ত-রক্তহীন, ক্লান্ত, স্বেদসিক্ত একটি মুখের সকরুণ অবসন্নতার জন্য মনে মনে নিজেকে সত্যিই অপরাধী বোধ করছিল। রেখার বিদ্রূপকে অবহেলা করবার মত মনের জোর ওর আর ছিল না।

অফিস থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ পথে পথে ঘুরল বিমল। পূর্ণিমার কাছে এখনই ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে, এটা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই।

একটা খবর নেওয়া অবশ্যই উচিত ওর। এটা সাধারণ ভদ্রতা। কর্তব্যও বটে। কিন্তু কোথা থেকে যেন রাজ্যের দ্বিধা এবং সঙ্কোচ এসে জড়ো হচ্ছে। পূর্ণিমার বাবা-মা কিছু ভাববেন না ত? যদি তাকে আবার এর জন্য কোন বক্রোক্তি শুনতে হয়?...অফিসে জানাজানি হ'লেও একটা ঠাট্টা তামাসার ঝড় উঠবে নিশ্চয়। নিজের জন্য কিছু ভাবে না সে—কিন্তু বেচারী পূর্ণিমা—মিছিমিছি সে হয়ত কতকগুলো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়ে উঠবে।...

এমনি কত কি মনে হয়। তবে খানিকটা পরেই একটা আত্মধিক্কার জাগে মনের মধ্যে। সে এত দুর্বল হয়ে গেছে? লোকের বিদ্রূপের ভয়ে বিবেককে বিসর্জন দিতে বসেছে। ছি।

সে অকস্মাৎ সমস্ত জড়তা ও সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে এক সময় পূর্ণিমার বাড়ীর দিককার ট্রামে চেপে বসল।

এর আগে কখনও যায় নি বটে--কিন্তু ঠিকানাটা বহুবার শুনেছে ওর মুখে। একদিন ওদের রাস্তার মুখ অবধিও পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং বাড়ীটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হ'ল না একটুও।...

কড়া নাড়তেই একটি কিশোরী মেয়ে এসে দোর খুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ভেতর থেকে—সম্ভবত পূর্ণিমার বাবাই প্রশ্ন করলেন, 'কে রে? কে ডাকে?'

বিমল সরাসরি প্রশ্ন করলে, 'তোমার নাম মালু ত?'

মালু ঘাড় নাড়ল।

'তোমার দিদি কেমন আছেন? তাঁর খবর নিতে এসেছি। তাঁর অফিসেই কাজ করি আমি।...আমার নাম বিমল।'

মালুর মুখে পরিচয়ের আভাস ফুটে উঠল। বোঝা গেল যে ওর নামটা একেবারে অপরিচিত নয়।

'আসুন। আসুন।...আচ্ছা একটু দাঁড়ান। বাবাকে বলছি।'

ভেতরে গিয়ে মালু ফিস্ ফিস্ ক'রে কী বললে। পূর্ণিমার বাবা হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এলেন, 'আসুন আসুন।...আর আমাদের যা অবস্থা—এই দু'খানা ঘরের ভেতরই সব।...ঐ যে পূর্ণিমা ও ঘরে। আসুন!'

বড় ঘরটাতেই বাবা ও মা'র দু'খানা চৌকি এবং হরেক রকমের আসবাব। পাশের ছোট ঘরটাতে একটা বড তক্তাপোশে এবা দুই বোন শোয়। সেটাতেও রাজ্যের ডেয়ো-ঢাকনা। তারই মধ্যে থেকে একটা চেয়ার উদ্ধার ক'রে ঝেড়ে মুছে বিছানার পাশে টেনে দিয়ে মালু বললে, 'বসুন।'

বিছানার ওপব অবসন্ন ভাবে চোখ বুজে পডেছিল পূর্ণিমা। তাব সেই নেতিয়ে পড়ে থাকার ভঙ্গীতে বিমলের বুকেব মধ্যেটা আবারও ধ্বক্ ক'রে উঠল···এই ভঙ্গীটি তার বিশেষ পবিচিত।

বেশী দিনেব কথা নয়, কয়েকমাস আগেই সে দেখেছে।

পূর্ণমাষ্টাব মশাই। তিনিও ঠিক এমনি ভাবে পডে ছিলেন।···

পূর্ণিমাব বাবাও ওর সঙ্গে সঙ্গে এঘবে এসে বিছানারই একপাশে বসে পড়েছিলেন। হযত বা উদ্বেগেই, তাঁব হাঁপানিটা আজ খুব বেড়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'বলবেন না মশাই।···এই মেয়ের জন্যেই আমাদের আবও অশান্তি। বড্ড অবাধ্য। একশ বার বলেছি যে শবীবটা আগে। অত ছুটোছুটি পবিশ্রম কবিসনি। কী দবকাব—যা আছে তাইতেই চালাব। না হয একবেলা খাবো। কিছুতেই মশাই কোন কথা শুনবে না।···জ্বব হযেছে তাব ওপব বাহাদুরী ক'বে অফিসে যাবাব কী দবকাব? এমনি ত শবীব তেমন মজবুত নয়।··· আর ওর মা-টিও হযেছে তেমনি। কত কবে বললুম যে মেয়েকে অফিসে পাঠিও না। আমাদেব বংশে কেউ কখনও মেযে পাঠায় নি বোজগাব করতে।···তা নয— করুক চাকবী। চাব হাতে খাবেন মেযেব বোজগাবে।··খাও এখন কত খাবে।··· মেযেকে না খেলে ওঁব শান্তি হবে না!'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলে সাঁই-সাঁই কবে হাঁপাতে লাগলেন।

এই ফাঁকে মালুব দিকে চেয়ে বিমল অনেকগুলি প্রশ্ন কবল, 'এখন কেমন আছে? অমন ভাবে মাথা ঘুরে উঠল কেন? ডাক্তাব কী বললেন?'

এই পরিবেশেব মধ্যে বাইরের লোককে এনে বসানোর লজ্জাতেই মালু রাঙা হয়ে উঠেছিল, বাপের কাণ্ডকারখানায় সে রীতিমত ঘেমে উঠল। ঘাড় হেঁট ক'রে পূর্ণিমাব শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, এখনও মুখ না তুলেই জবাব দিলে, 'ডাক্তারবাবু বলেছেন অতিরিক্ত exhaustion-এই নাকি এমনটা হয়েছে।

জ্বরটা কোন চিন্তার কারণ নয়। শরীরটাই নাকি অতিরিক্ত দুর্বল। রক্তশূন্য হয়ে পড়েছে খুব।···ইদানীং মাসকতক ধরেই দিদিভাই বড্ড অবহেলা করছিল শরীরের ওপর—কিছুই প্রায় খেতো না। দুধটুধ ত নয়ই, মাছ পর্যন্ত অর্ধেকদিন আমার পাতে তুলে দিত।···আবার গত পনেরো ষোল দিন যে কী হ'ল—ভাত খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিল বলতে গেলে!'

কথা শেষ ক'রে মালু এবার মাথা তুলল এবং বেশ স্থির দৃষ্টিতেই বিমলের দিকে তাকিয়ে রইল।

অর্থাৎ বয়সে ছোট হলেও মালু বুদ্ধিতে খুব ছোট নয়। দিদিভাইয়ের ভাবান্তরের সঙ্গে আগন্তুক কুশলপ্রার্থীর একটা যোগাযোগ কল্পনা ক'রে নেবার মত বুদ্ধি তার যথেষ্ট আছে।

পূর্ণিমার বাবা এতক্ষণে খানিকটা দম নিতে পেরেছেন—হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি আবারও বললেন, 'ভাল নয় বুঝলেন, একদম ভাল নয়—এইসব সোমত্থ মেয়েদের কাজ করতে পাঠানো।···কী বলব বলুন, নিজে পড়ে আছি রোগে—স্ত্রী-বুদ্ধিতে সংসার চলছে। এক কর্তা মেয়ে আর এক কর্তা তার মা। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী জানেন ত! ভগবান মেরেছেন আমাকে কিনা—নইলে অতবড় উপযুক্ত ছেলে থাকতে—'

কথা শেষ করতে পারলেন না—দু'হাতে বুক চেপে ধরে হাঁপাতে লাগলেন ভদ্রলোক।

পূর্ণিমা এতক্ষণ চোখ বুজে তেমনি স্থির ভাবে পড়েছিল—যে ভাবে ঘরে ঢুকেই দেখেছিল বিমল। জেগে আছে, কি ঘুমিয়ে আছে বোঝাই যাচ্ছিল না। এইবার সে চোখ খুললে, ক্লান্ত মৃদুকণ্ঠে বললে, 'মালু, বাবাকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে বুকে একটু মালিশ ক'রে দে—কী করছিস দাঁড়িয়ে। দেখতে পাচ্ছিস না!'

মালু অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি বাবার পাশে এসে দাঁড়াল। তিনি ইঙ্গিতে ওকে অপেক্ষা করতে বলে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একটু নিঃশ্বাসটা সহজ ক'রে নিয়ে মালুর হাত ধরে বিনা প্রতিবাদে ওঘরে চলে গেলেন।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আবার চোখ বুজেছিল পূর্ণিমা। তেমনি স্থির—অবসন্নভাব।

বিমল বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে ডাকলে, 'পূর্ণিমা।'

পূর্ণিমা আবার চোখ খুলল। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক্—বিমলের চোখে চোখ রাখতে পারলে না। ওর হাতটার দিকে চেয়ে বললে, 'বলুন।'

'এখন কেমন বোধ করছ?'

'ভালই। কাল অফিস যেতে পারব।'

'না—এখন তোমাকে অফিস যেতে হবে না। লক্ষ্মী মেয়ের মত দু'চার দিন শুয়ে থাকো দিকি!' বেশ একটু আদেশের সুরেই বলে বিমল।

ওপক্ষ থেকে হয়ত একটা প্রতিবাদ আসা করেছিল বিমল কিন্তু পূর্ণিমা কোন উত্তর দিলে না। শুধু অবসন্ন ভাবে আবার চোখ বুজল!

একটু পরে বিমল আবারও আস্তে আস্তে ডাকল, 'পূর্ণিমা।'

পূর্ণিমার সমস্ত দেহটা একবার শিউরে উঠল কি?

উঠলেও তার কণ্ঠস্বরে অন্তত কোন চাঞ্চল্য ধরা পড়ল না। আগের মতই বললে, 'বলুন।'

'এমন করছ কেন?'

'কী করছি?' বিস্মিত হয়ে দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে তার দিকে তাকায় পূর্ণিমা।

'না খেয়ে খেয়ে এমন ভাবে শরীর পাত ক'রে ফেলছ কেন? আমাকে শাস্তি দেবে বলে?'

উত্তর দিতে গিয়ে হয়ত পূর্ণিমার দুই ঠোঁট কেঁপে উঠতে লাগল। সে প্রাণপণ চেষ্টায় খানিকক্ষণ দাঁত দিয়ে ওষ্ঠাধর চেপে নিজেকে সম্বরণ করলে, তারপর শান্ত কণ্ঠেই বললে, 'আপনার সম্বন্ধে ও শব্দটা পর্যন্ত কল্পনা করাও আমার কাছে চরম ধৃষ্টতা—তা ত আপনি জানেনই। অত দুঃসাহস আমার নেই।'

বিমল এর উত্তরে ঈষৎ উত্তেজিত ভাবেই কী একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মালু এসে পড়ায় থেমে গেল। মালু সরাসরি বিমলকে প্রশ্ন না করে পূর্ণিমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, 'মা বলছেন একটু চা ক'রে দিতে। দেব দিদিভাই?'

'দিবি?' উৎসুক ব্যগ্রভাবে পূর্ণিমা তাকায় মালুর দিকে, 'পারবি?'

'কেন পারব না। বা রে!'

বিমল কী একটা বাধা দিতে গিয়েও চুপ ক'রে গেল।

মালু চলে গেল—সম্ভবত চা করতেই। দুজনেই চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ। তার পর পূর্ণিমা আস্তে আস্তে—তেমনি বিমলের জামার হাতটার দিকে চেয়েই বললে, 'আপনি যে আমার বাড়ীতে আসবেন—আমি কিন্তু আশা করি নি!'

'কেন?' বিমল আস্তে আস্তে পাশে-পড়ে-থাকা ওর বাঁ হাতটার ওপর নিজের একটা হাত রাখে। সামান্য একটু কেঁপে ওঠে পূর্ণিমা—কিন্তু আর কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না ওর নিথর হয়ে পড়ে থাকার ভঙ্গীতে।

একটু পরে বিমল বলে, 'জানো—আমি পাশ করেছি। আজই খবরটা এল—অথচ তুমি নেই।'

এই প্রথম একটা রক্তাভা খেলে গেল পূর্ণিমার বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে। খুশী হয়ে চোখ তুলে বললে, 'এ আমি জানতুম। আমি ঠিক জানতুম।'

'তুমি খুশী হয়েছ পূর্ণিমা?' হাতটার ওপর একটু চাপ দিয়ে প্রশ্ন করে বিমল।

'আমি?' আবার স্তিমিত হয়ে যায় ওর মুখ ভাব। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'হয়েছি বৈকি! আমার অনুমান ঠিক হয়েছে—এ আত্মপ্রসাদ কি কম!'

মালু এসে ঢুকল চা নিয়ে। চা আর একটি রেকাবীতে খান-দুই বিস্কুট। টেবিলের অভাবে আর একটা চেয়ারের ওপরই নামিয়ে— চেয়ারখানা টেনে দিতে দিতে সে বললে, 'আনাড়ির হাতের চা, খেতে পারলে হয়!'

বিমল হেসে বললে, 'আমরা পেতলের কলসীর চা খাই। অত খারাপ চা তুমি নিশ্চয়ই করো না।'

পূর্ণিমা ওর চায়ের কাপটার দিকে তাকিয়ে কেমন একরকম করুণভাবে বললে, 'আপনি আজ প্রথম আমার বাড়ী চা খাচ্ছেন—অথচ আমি নিজে ক'রে দিতে পারলুম না!···সত্যি, এত বিশ্রী লাগছে!'

'তাতে খুব ঠকলুম ব'লে ত মনে হচ্ছে না। মালু ভালই চা করেছে।' জোর ক'রে হাল্কা হয় বিমল। তারপর বলে, 'তুমি ভাল হও, তোমার হাতেও খাবো। ভয় কি!'

'হ্যাঁ, আপনি আবার এসেছেন!'

পূর্ণিমা আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে।

'তাব মানে! এখন ত রোজই আসতে হবে। তোমাব ডাক্তার ওষুধ, এদের বাজাব হাট—আমি না এলে এসব কববে কে?'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস কবতে পাবে না পূর্ণিমা। খানিকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলে, 'না না, মিছিমিছি আপনি এত ব্যস্ত হবেন না। এ আমাব কিছুই নয়। অফিস না যাই—ডাক্তাবখানায় অন্তত যেতে পাবব। ওপরেব ভাড়াটেরা দেখাশুনো কবেন—বাজাব হাটেব জন্যও ভাবনা নেই—'

মালু মৃদু ঝঙ্কাব দিয়ে ওঠে, 'খুব হয়েছে দিদিভাই, তোমাব আব বাহাদুরীতে কাজ নেই। জানেন ডাক্তাব কি বলেছে? পনেবো দিন এখন বিছানা ছেড়ে ওঠাই বারণ ওব। এমন কী বেশী কথাবার্তা কইতেও বারণ ক'রে গেছেন!'

বিমল কথাটা শুনেই সোজা উঠে দাঁড়াল।

'ইস্। আমারই বড অন্যায় হয়ে গেছে মালু, মিছিমিছি তোমাব দিদিভাইকে কতখানি বকালুম!'

পূর্ণিমা ব্যাকুল হয়ে বললে—'না-না—তেমন কিছু নয়। কী পাগলামি কবছিস মালু।···আব একটু বসুন না। আমি ত বেশী কথা কইছি না—'

বিমল ঘাড় নেড়ে বললে, 'তুমি চুপটি ক'বে শুয়ে থাকো। আমি আবাব কাল ঠিক আসব!'

পূর্ণিমা আর কিছু বলবাব আগেই বিমল একেবাবে ঘরের বাইবে গিয়ে দাঁড়াল।

আসবার আগে বিমল ওদের ডাক্তাবেব নাম-ঠিকানা জেনে এসেছিল। অবশ্য তখন আর সময় ছিল না। কারণ নিখিলদের বাড়ী যেতেই হবে সেদিন—পবের দিন ওর কী একটা পরীক্ষা।

কোন মতে বাতটা কাটিয়ে পরের দিন সকাল বেলাই সে এ পাড়ায় এসে ডাক্তার বাবুটির সঙ্গে দেখা করলে।

ডাক্তারবাবু একটু বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিস পূর্ণিমা রায়?

ও আমাদের বিপিনবাবুর মেয়ে।...হ্যাঁ।...তা আপনি ওর কে হন?'

অকারণেই বিব্রত হয়ে ওঠে বিমল। বার-দুই ঢোঁক গিলে বলে, 'আমি ওর এক-অফিসে কাজ করি। বন্ধু!'

'অ।...বড় স্ট্রেঞ্জ কেস্ মেয়েটির। জ্বরটা কিছু নয়। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ইচ্ছে ক'রে নিজেকে ক্ষয় ক'রে এনেছে। Case of extreme exhaustion. কত দিন ধরে যে ভূতের মত খেটেছে অথচ শরীরের কোন যত্ন নেয় নি, তার ঠিক নেই। এনিমিকও খুব। হার্টটার সাউণ্ডও মোটে ভাল নয়। ভাল নারিশমেণ্ট দরকার। আমি যাবো একবার। একটা ইঞ্জেকশন দিতে হবে।...'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কাল ওকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল মেয়েটি বোধ হয় কোন মেণ্টাল শক্ পেয়েছে, খুব প্রচণ্ড। ওর যেন বাঁচবার ইচ্ছেও নেই তেমন!'

বিমল উঠে দাঁড়াল।

'তাহ'লে ওর পথ্য-টথ্য?'

'ফলের রস, গ্লুকোজ, দুধ—অল্প অল্প, এই-ই চলুক আপাতত। জ্বর না থাকলে ভাতও দিতে পারেন। তারপর—আমি ত যাচ্ছি, দেখে ব্যবস্থা করব।'

ওখান থেকে বেরিয়ে বিমল বাজারে গেল। কাল সত্যশরণ বাবুর কাছ থেকে কয়েকটা টাকা চেয়ে এনেছে সে—আজকের প্রয়োজন বুঝেই। ঘুরে ঘুরে একরাশ ফল কিনলে—সেই সঙ্গে একটা ভাল ফুড। এদের জন্য কিছু বাজার করলে।... বাস্তবিক নিজের আচরণে নিজেই যৎপরোনাস্তি বিস্ময় বোধ করছিল বিমল। কোনদিন যে কোন একটি অনাত্মীয় মেয়ের সংসারের জন্য সে বাজার করবে—মাত্র কয়েকমাস আগেও এটা ছিল ওর স্বপ্নের অগোচর!

মালু ওকে দোর খুলে দিয়ে পেছনে মুটে দেখেই চেঁচামেচি ক'রে উঠল।

'এ কি! এ সব কী কাণ্ড করেছেন আপনি—না...না, এসব কিন্তু আপনার ভারি অন্যায়।'

'কে রে মালু।' হাঁপাতে হাঁপাতে বিপিনবাবুও বেরিয়ে এলেন।

'সত্যিই ত। না না—এসব কী দরকার।...দেখুন—'

আরও কী বলতে গিয়ে কাশির ধমকে চুপ ক'রে গেলেন তিনি।

বিমল হাত জোড় ক'রে বললে, 'আমিও আপনার সন্তানের মতই। কেন মিছিমিছি সঙ্কোচ করছেন। পূর্ণিমা আমার বন্ধু—ও ভাল হয়ে উঠুক, না হয় আমাকে দামই বুঝিয়ে দেবে। তাছাড়া ধরুন, যে-কোন পরকেই ধরে ত বাজারে পাঠাতে হ'ত আপনাদের—আমি করলেই বা আপত্তি কি?'

ওর বিনীত ভঙ্গীতে বিপিনবাবু আর কিছুই বলতে পারলেন না। পূর্ণিমার মাও এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সেকেলে মানুষ, সোজাসুজি একজন পরের ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইতে তাঁর সঙ্কোচে বাধে। তিনি স্বামীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'শোনদিকি কেমন মিষ্টি কথা, কান জুড়িয়ে যায়। ঐ জন্যেই বলে আপনার চেয়ে পর ভাল। পেটের ছেলেও ত রয়েছে—কাল থেকে একবার খবর নিতেও এল না!'

মুটে রান্নাঘরের রোয়াকে জিনিসগুলো নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার পয়সা চুকিয়ে দিয়ে বিমল আগের দিনের মতই পূর্ণিমার বিছানার পাশে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসল।

পূর্ণিমা এতক্ষণ একান্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত দৃষ্টি মেলে দোরের দিকেই তাকিয়ে ছিল। বিমল এসে বসতেই যেন ফেটে পড়ল সে। চাপা কঠিন কণ্ঠে বললে, 'এসব কি করছেন বলুন ত? কেন বরছেন? আমাকে বাঁচিয়ে আপনার লাভ কি?...এসব সামান্য কথা নিয়ে—সামান্য জীবন নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। আপনার বিরাট কর্মক্ষেত্র সামনে পড়ে আছে—বিপুল দায়িত্ব।...আমাদেব জীবন ঠিকই কাটবে—সহস্র মেয়ের জীবন যেমন এই শহরে কাটছে।...আপনি চাকরি ছেড়ে দিন, চলে যান আপনার কর্মক্ষেত্রে। দোহাই আপনার! আপনি আর পিছন ফিরে তাকাবেন না কোন দিকে, কারুর দিকে।'

বহু দিনের সঞ্চিত ক্ষোভ ওর, বহুদিনের ব্যথা। কঠিন কণ্ঠও তাই একসময় অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, দুই চোখের কূল প্লাবিত ক'রে নামে অশ্রুর বন্যা।

স্থির হয়ে বসে থাকে বিমল। তারপর আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠেই উত্তর দেয়, 'হ্যা তাই যাবো। কোনদিকেই তাকাব না। কিন্তু তার আগে তোমার অন্তত ভাল হয়ে ওঠা দরকার পূর্ণিমা!'

'আমি? আমার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক! আপনার মহৎ জীবনে আমার মত মেয়েব স্থান কোথায়?'

অশ্রুবিকৃত কণ্ঠেও ব্যঙ্গের সুব ফোটে।

'সম্পর্ক এখন নেই, কিন্তু সেই জন্যেই ত এত ব্যস্ত হচ্ছি। তোমার ওপর একটা অধিকার, তোমার সঙ্গে চিবকালের একটা সম্পর্কই যে দবকাব। না—না, বাধা দিও না, বলতে দাও। সেদিনই ত তোমাকে বলেছি, একা কোন ভাল কাজই কবা যায় না। মানুষ একা বড় অসহায়, বড দুর্বল। সেই জন্যেই আমাদের শাস্ত্রে সস্ত্রীক ধর্ম-আচবণের ব্যবস্থা—। তান্ত্রিক সাধকবা সাধনা-সঙ্গিনীকে বলেন শক্তি, জানো ত। উপযুক্ত শক্তি না পেলে সিদ্ধিব আশা যে দুবাশা!'

পূর্ণিমা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রায় ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, 'কেন আপনি সেদিন থেকে আমাকে এমন ভাবে দগ্ধাচ্ছেন বলুন ত! ওসব স্বপ্ন-কল্পনা আমাব জন্য নয়…এ কী আপনি কিছুতেই বুঝবেন না? আপনাব কর্তব্য আপনাব কর্মক্ষেত্র বৃহৎ, বিপুল। ওসব আমি বুঝি না। আমি বুঝি আমার এই ছোট্ট পরিসবে ছোট কর্তব্য। আপনার কাছে হয়ত এসবেব মূল্য নেই—কিন্তু আমার কাছে আমারই মুখ-চাওয়া বৃদ্ধ অশক্ত মা-বাবার প্রতি কর্তব্য আগে।'

'কে বলেছে সে কর্তব্যে আমি বাধা দিতে যাচ্ছি।…তুমি উত্তেজিত হয়ো না পূর্ণিমা, তোমাব শরীব খাবাপ। এসব কথা বলা হয়ত তোমার এ অবস্থায় উচিত হচ্ছে না—কিন্তু না বললেও নয। তুমি অকারণে মন খাবাপ কবো না। তুমি আমার কাছে সব কর্তব্যেব চেয়েও বেশী মূল্যবান। এই কথাটি আজ শেষবারের মত জেনে বাখো—বৃথা বাজে কথা নিয়ে মন খাবাপ কবো না।'

আব একটু কাছে সবে আসে বিমল। পূর্ণিমার একটি শিথিল হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে আবও আস্তে, প্রায় চুপি চুপি বলে, 'আমাদের বিয়ে হ'লেই যে তোমাকে এই কর্তব্য থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবো—এমন কথা ভাবছ কেন? বিয়ে হবে আমাদের কিন্তু যতদিন না তোমার এই দায়িত্ব শেষ হচ্ছে ততদিন তোমাকে আমি দাবী করব না, কথা দিচ্ছি। তুমি যেমন চাকরী কবছ, এখানে আছ, তেমনিই থাকবে। তোমার এখানকাব কাজ শেষ হবার আগেই

যদি আমার বিদেশ-যাত্রার ডাক আসে, আমার কর্মক্ষেত্রে আমি চলে যাবো কিন্তু তখন আমার সান্ত্বনা থাকবে—যেখানেই থাকো তুমি—তুমি আমারই আছ, তোমার শুভ কামনা, তোমার ভালবাসা এখান থেকেই আমাকে শক্তি জোগাবে, কর্ম-প্রেরণা জোগাবে।'

অবিশ্বাস্য—অবিশ্বাস্য। বার বার মনে মনে উচ্চারণ করতে থাকে পূর্ণিমা। কল্পনাতীত সৌভাগ্য এমন ক'রে মানুষের জীবনে আপনা থেকে আসে নাকি কখনও? এ নিশ্চয়ই ও ভুল শুনছে। এ ওর ব্যাধিরই একটা প্রকাশ—বিকারের ঘোর।

'অবশ্য আমি চেষ্টা করব তোমাকে সেখানেই কোন কাজ দিয়ে নিয়ে যেতে। যদি সত্যশরণ বাবুদের ইস্কুলেই যাই—ওখানে একটা মেয়ে ইস্কুল খোলবারও কথা আছে—সে সময় হয়ত তোমাকেও নিয়ে যেতে পারব। তোমার বাবা-মা না হয় সেখানে তোমার কাছে গিয়েই থাকবেন। এ বাড়ীর বাকীটুকু ভাড়া দিলে মালু বোর্ডিং-এ থেকেই পড়তে পারবে।'

পূর্ণিমার বিহ্বল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বিমল বলে, 'অবাক হয়ে যাচ্ছ, না? ভাবছ এত কথা কবে ভাবলুম?…এই কদিন যে দিনরাত শুধু এই সব কথাই ভেবেছি পূর্ণিমা। তুমি আমাকে যতটা হৃদয়হীন ভেবে মনে মনে আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করছিলে, সত্যিই আমি ততটা নই।… তোমাকে এই ভাবে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়ে আমি কোন কাজই যে করতে পারতুম না। …না, তোমাকে আমার চাই।…অনেক কাজ পূর্ণিমা, অনেক স্বপ্ন আমার। যে দিকে তাকাই দেখি অকারণ ঔদ্ধত্য, পরমত-অসহিষ্ণুতা—আর জ্ঞান ত দূরের কথা, জ্ঞানের আগ্রহেরও অভাব! আমরা দুজনে মিলে সারা জীবনে যদি দুটো চারটে ছেলেমেয়ের মনেও যথার্থ শিক্ষার আগ্রহ জাগাতে পারি—যে শিক্ষা দল মত স্বার্থ সকলের ওপরে মনুষ্যত্বে পৌঁছে দেয় মানুষকে, যদি পারি দুচার-জনকেও সেই মনুষ্যত্বের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে—তবেই আমাদের স্বপ্ন সফল হবে, আমাদের জীবন সার্থক হবে পূর্ণিমা।'

পূর্ণিমার চোখ দুটি এইসব কথা শুনতে শুনতে কখন আবার নিমীলিত হয়ে গেছে; সে সমস্ত সত্তা দিয়ে, বাকী সবকটি ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন অনুভব করছে এই

অচিন্তিত-পূর্ব সৌভাগ্যের সুখছবি। তার দুই চোখের কোল বেয়ে এখনও জল নাম্‌ছে তবে তা যে আনন্দেরই অশ্রু—একথা মুখের দিকে চাইলে বুঝতে ভুল হয় না।

মালু ঢুকল ডিম ভাজা ও চা নিয়ে।

বিমলের বসে থাকার ভঙ্গী, তার চোখে সুদূরের স্বপ্ন এবং পূর্ণিমার নিমীলিত চোখে অশ্রুর ঝরণা দেখে কী বুঝল সে তা সে-ই জানে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না, সামান্য একটু হাসির আভাস মাত্র ঠোঁটের কোণে লুকিয়ে নিয়ে আবার বেরিয়ে গেল সে।

পূর্ণিমা চোখ খুলল এবার। আঁচলে দুই চোখ মুছে চুপিচুপি বললে, 'একটু চা খাও। আমার জন্য অনর্থক সকাল থেকে অনেক ছুটোছুটি করেছ!'

বিমল তখনও বোধকরি তার নিজের আঁকা ভবিষ্যতের ছবিতেই তন্ময় হয়েছিল, এবার যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল।

'হ্যাঁ, এই যে নিই।' তাড়াতাড়ি মুখ তুলে মালুকে না দেখতে পেয়ে অপ্রতিভ ভাবে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে বললে, 'ইস, মালু কি মনে করলে!'

পূর্ণিমা সে কথার জবাব দিলে না। বিমলের জামার প্রান্তটা নিয়ে দুটো আঙ্গুলে নাড়া চাড়া করতে করতে বললে, 'জানো, এই কদিন অহোরাত্র ভেবেছি কী ক'রে তাড়াতাড়ি মরতে পারি।···আজ এখন মনে হচ্ছে যেমন ক'রেই হোক বাঁচা দরকার। অন্তত তোমার স্বপ্ন সফল করতেও।'

স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বিমল বললে, 'এইত লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা।··· এখন একটু ভাল করে বিশ্রাম নিয়ে আর ভাল ক'রে খেয়ে চট্‌পট সেরে ওঠো দিকি।'

মালু বোধকরি বাইরেই ছিল কোথাও। ঘরে ঢুকে বললে, 'আপনি একটু ভাল ক'রে বলে যান। কিচ্ছু খেতে চায় না।··আপনি ত একরাশ ফল কিনে এনেছেন—খাবে কে?'

'আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে। তোকে আর বেশী গিন্নিপনা করতে হবে না। যা!'···মৃদু ধমক্ দেয় পূর্ণিমা।

বিমল চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে একেবারে উঠে দাঁড়ায়। হাতের ঘড়িটার দিকে তার নজর পড়ে গেছে।

'চলি এখন। অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।'

বহুপথ ফিরে গিয়ে আবার বেরোতে হবে। সে রাস্তায় পড়ে সেই খর রৌদ্রের মধ্যেই দ্রুত হাঁটতে শুরু করে।

সমাপ্ত